তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ত্রয়োদশ কল্প।

চতুর্থ ভাগ।

১৮১৬ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫১। কলিগতাব্দ ৪৯৯৫। ১ চৈত্র।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ত্রয়োদশ কল্পের চতুর্থ ভাগের সূচীপত্র ।/০

অকারাদি বর্ণক্রমে ত্রয়োদশ কল্পের চতুর্থ ভাগের সূচীপত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মুল্য ও মাশুল হিঃ যাঁহাদিগের নিকট দীর্ঘকাল টাকা অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা শীঘ্র টাকা দিয়া সমাজকে উপকৃত ও বাধিত করিবেন। সকলেই জানেন যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মুল্য অগ্রিম দেয়। তাহাতে এত দীর্ঘকাল টাকা অনাদায় থাকিলে সমাজকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সত্যযুগে মানবায়ুঃ।

২।

এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মনুসংহিতানুসারে সত্যযুগে মনুষ্যের পরমায়ু শতবর্ষই ছিল। মনু প্রোক্ত "চতুর্বর্ষ শতায়ুষঃ" অর্থে মেধাতিথি, সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ, ও রাঘবানন্দ প্রভৃতি টীকাকারগণ "শতবর্ষই" বুঝিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের ভাষ্যেও সত্যযুগের মানবগণের আয়ুঃ সম্বন্ধে মেধাতিথি বলিতেছেন, "শতবর্ষং পুরুষাণাং আয়ুঃ।" কিন্তু টীকাকার কল্লুকভট্ট "চতুর্ব্বর্ষ-শতায়ুষঃ" অর্থে ৪ শত বৎসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে। শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিরোধ ঘটিলে শ্রুতিই গ্রাহ্য। সুতরাং স্মৃতির অর্থ শ্রুতির অনুকূল করিবার জন্য প্রাচীনেরা উপদেশ দিয়াছেন।

বেদে আছে,—"শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ।" কল্লুক বলেন, এখানে "শত শব্দো বহুত্বপরঃ।" তাৎপর্য্য এই যে, বেদে যখন শত শব্দ বহুত্ব সূচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন "চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ" এই পদের "চারি শত বর্ষ" এইরূপ অর্থ করিলে শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে না। কল্লুকভট্টের এই যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, বেদে আয়ুঃসংখ্যা নির্দ্দেশক "শত" শব্দ বহুত্ববোধক নহে।

"মনুষ্যের পরমায়ু শত বৎসর"

ও

"মনুষ্যের পরমায়ু বহু বৎসর"

এই দুই অর্থের মধ্যে কোন্‌টি সুসঙ্গত? প্রথম অর্থটি অধিকতর সুসঙ্গত নয় কি?

বেদের অনেক স্থলে মনুষ্যের "শতবর্ষ" পরমায়ুর উল্লেখ আছে। ভারতের অদ্বিতীয় বেদবিৎ ও বেদ ব্যাখ্যাতা মহামহোপাধ্যায় সায়ণাচার্য্য উক্ত স্থল সমূহে "শত" শব্দের "একশত" অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, বহু অর্থ গ্রহণ করেন নাই। আবশ্যক বোধে, এস্থলে কয়েকটি বেদমন্ত্র ও তাহার সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্য উদ্ধৃত করিলাম।

১। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি মরুৎ-

গণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, (১।৬৪।১৪)—

"তোকং পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ।"

সায়ণভাষ্য,—"'তোকং' পুত্রং 'তনয়ং' পৌত্রঞ্চ "শতং হিমাঃ" হেমন্তর্ত্তূপলক্ষিতান্ শতং সংবৎসরান্ জীবন্তঃ সন্তঃ 'পুষ্যেম' পোষয়েম।"

অনুবাদ—আমরা যেন শত হেমন্ত (বৎসর) জীবিত থাকিয়া আমাদের পুত্র পৌত্রগণকে পোষণ করি।

পূর্ব্বকালে শরৎ ঋতুতে বর্ষ সমাপ্ত ও হেমন্ত ঋতুতে নব বর্ষারম্ভ হইত বলিয়া শত শরৎ বা শত হেমন্ত বলিলে শত বৎসর বুঝায়।

২। শক্তি-পুত্র পরাশর অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, (১।৭৩।৯)

"ঈশানাসঃ পিতৃবিত্তস্য রায়ো বি সূরয়ঃ শতংহিমা নো অশ্যুঃ।"

অর্থাৎ আমাদের বিদ্বান্ পুত্রগণ পিতৃধনের অধিকারী হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকুক্। এখানে সায়ণ "শতং হিমাঃ" অর্থে "শতং সংবৎসরান্" কথাটী ব্যবহার করিয়াছেন।

৩। স্থলান্তরে "শতংজীব শরদঃ" (ঋগ্বেদ) অর্থে সায়াণাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

'শতং শরদঃ' শতসংখ্যকান্ শরদৃতূন্ 'জীব' প্রাণান্ ধারয়।"

আবার ঐ মন্ত্রেই "শতায়ুষঃ" অর্থে "শত সংবৎসর পরিমিতস্যায়ুষঃ" করিয়াছেন।

এই মন্ত্রের নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক (১) কৃত ব্যাখ্যার অনেক পাঠ ভেদ দৃষ্ট হয়,—

"শতমনন্তং ভবতি, শতমৈশ্বর্য্যং ভবতি শতাত্মানং ভবতি।"

এই অংশটুকু সকল পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী বলেন, বারাণসীতে তিনি তাঁহার গুরুর নিকট যে পুস্তকের সাহায্যে নিরুক্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন; সেই পুস্তকে এই অংশটি নাই। তাঁহার বিবেচনায় ঐ পুস্তকখানি "প্রাচীনং শুদ্ধঞ্চ"। এতদ্ব্যতীত আরও একখানি পুস্তকে সামশ্রমী মহাশয় উক্ত পাঠ দেখিতে পান নাই।

৪। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৬১ সূক্তের যক্ষ্মানাশন মন্ত্রে "শতায়ুষা" অর্থে সায়ণাচার্য্য

"শত-সংবৎসর-পরিমিতং আয়ুর্জীবনং ফলভূতং যস্য তাদৃশেন।"

লিখিয়াছেন। সুতরাং সায়ণাচার্য্যের মতে বেদোক্ত আয়ুঃসংখ্যা নির্দ্দেশক 'শত' শব্দ "বহুত্বপর" নহে—এক শত বৎসরেরই পরিজ্ঞাপক।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের

"শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব"।

এই অংশের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—(১ বল্লী ২৩ শ্লো)

"শতায়ুষঃ, শতং বর্ষাণি আয়ুংষি যেষাং তান্।"

সুতরাং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতেও বেদোক্ত আয়ুঃ নির্দ্দেশক শত শব্দ বহুত্ব বোধক নহে।

যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়ের অন্তর্গত "মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুংষি" ইত্যাদি মন্ত্রের "আয়ুংষি" শব্দের ভাষ্যে মহামতি ভট্ট ভাস্কর (২) বলেন,—

"আয়ুঃ শোড়ষবর্ষশতং প্রহ ষোড়শং বর্ষ শতং অজীবৎ"। ইতি ছান্দোগ্যে শ্রবণাৎ।

"বিংশতি বর্ষ শতং" ইতি সাংবৎসরিকাঃ।

"সপ্তবিংশত্যধিকানি শতং বর্ষাণি" ইত্যেকে। "শতমেব" ইত্যন্যে। তস্মিন্নায়ুষি ইত্যাদি।"

(১) সামশ্রমী মহাশয়ের মতে যাস্কের আবির্ভাব কাল খৃষ্ট পূর্ব্ব উনবিংশ শতাব্দীতে।

(২) পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয় বলেন, ভট্ট ভাস্কর সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্বেষী কুমারিল্ল ভট্টের পুত্র।

ইহাতে জানা গেল, প্রাচীন বৈদিকাচার্য্যগণের কাহারও মতে মানবায়ুর পরিমাণ ১১৬ বৎসর ; কাহারো মতে ১২০ বৎসর ; অপরের মতে ১২৭ বৎসর, আবার কাহারও মতে ১ শত বৎসর মাত্র। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, এক শত বৎসর পরমায়ুই শ্রুতিসিদ্ধ।

বেদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া কল্লুক ভট্ট প্রথমতঃ বলিয়াছেন,—

"শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ ইত্যাদি শ্রুতৌতু শতশব্দো বহুত্বপরঃ।".

এইটুকু বলিয়াই যদি তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে বিশেষ কোনও গোল ঘটিত না। কিন্তু তার পরই যখন বলিতেছেন,

"কলিপরো বা"

অর্থাৎ 'অথবা উক্ত শ্রুতির এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, কলিযুগের মনুষ্যগণের পরমায়ু শত বর্ষ,' তখন বোধ হইতেছে, আয়ুর্নির্দ্দেশক বেদোক্ত 'শত' শব্দ বহুত্ব বাচক কি না, সে বিষয়ে কল্লুক ভট্টেরও বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তাই তিনি—

"শতশব্দো বহুত্বপরঃ।"

এই টুকু বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, বেদোক্ত আয়ুঃ নির্দ্দেশক "শত" শব্দ বহুত্বপর নহে। কল্লুকের—

"কলিপরো বা"

এই উক্তিও সমীচীন নহে। মনু টীকাকার রাঘবানন্দ এই কল্লুকোক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"নতু কলিযুগমধিকৃত্য শ্রুতেঃ প্রবৃত্তিঃ ;
তস্যাঃ সাধারণ্যাৎ।"

অর্থাৎ শ্রুতির সাধারণ্য বশতঃ উহাকে কেবল কলিযুগ বিষয়ক বলা অসঙ্গত।' রাঘবানন্দের অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি যখন ঈশ্বরের বাক্য, তখন তাহা দেশ বা কাল বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। উহা সাধারণের জন্য ও সর্ব্বকালের জন্য উক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত কল্লুকের অনুমান গ্রাহ্য নহে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই যুগ চতুষ্টয়ের মধ্যে কলিই সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পকাল স্থায়ী। দ্বাদশ সহস্রের মধ্যে কেবল দ্বাদশ শত বৎসর কলি যুগের পরিমাণ। শ্রুত্যুক্তি এই দ্বাদশ সহস্রের ১০৮০০ বৎসর ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র ১২ শত বৎসরকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা অল্প সাহসের কার্য্য নহে। আর এক কথা, যে ঋষি—

"তোকং পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ।"

এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, যিনি শত বৎসর জীবিত থাকিয়া আপনার পুত্র পৌত্রগণকে পালন করিবার জন্য মরুদ্গণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি কি কলিযুগের লোক ছিলেন ? যে ঋষি সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃশতং।"

তিনি কি সত্যযুগের লোক নহেন। যদি হন তবে তাহা দ্বারা সত্যযুগের নরনারীগণের পরমায়ুর শেষ সীমা যে শতবর্ষ ছিল, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" এই শ্রুতি কেবলমাত্র কলিযুগ বিষয়ক নহে—সর্ব্বযুগ বিষয়ক। বিশেষতঃ বেদে যখন সত্যাদি যুগ চতুষ্টয়ের কোন ও উল্লেখ দেখা যায় না, বৈদিক কালে যখন চতুর্যুগ বিষয়ক বিশ্বাসের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না, তখন, উক্ত শ্রুতি বাক্যকে যুগবিশেষ বিধায়ক মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। উক্ত শ্রুতিতে "শত" শব্দ যে বহুত্ব বোধক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা উক্ত বচনের অর্থের

প্রতি মনোযোগ প্রদান করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। "শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ" মনুষ্যের "পরমায়ু বহুবর্ষ" এই অর্থ অপেক্ষা "মনুষ্যের পরমায়ু শতবর্ষ" এই অর্থই আমাদিগের নিকট অধিকতর সুসঙ্গত বোধ হইতেছে *। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ" এই "মনূক্তির "চারি শতবর্ষ" অর্থ করিলে শ্রুতির সহিত, মনুসংহিতার ৩।৪০ ও ৪।১৫৮ শ্লোকের বিরোধ ঘটে। এই বিরোধ পরিহারের জন্য ভাষ্যকার মেধাতিথি, টীকাকার রাঘবানন্দ ও সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ উক্ত শ্লোকের "শতবর্ষ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

কল্লুক ভট্ট তাহা বলেন না। তিনি শ্রুতি বচনের অর্থ বৈচিত্র্য সাধনে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথমতঃ 'শত' অর্থে 'বহু' ধরিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ 'শত' অর্থে "এক শত" ধরিয়া, উহাকে কলিযুগ বিষয়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আবার স্থলান্তরে বেদোক্ত পরমায়ুকে সত্য-যুগ বিষয়ক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই মহর্ষিগণ মনুপুত্র ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—

"এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাম্।
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাং প্রভো॥"

অর্থাৎ—হে প্রভো! বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা সকলেই ত আপন আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তবে ইঁহারা বেদোদিত পরমায়ু পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছেন কেন? অধর্ম্মাচরণই ত আয়ু হ্রাসের কারণ; কিন্তু অধর্ম্মাচরণের অভাবেও বেদবিহিত পরমায়ুর পূর্ব্বে ইঁহাদের মৃত্যু হইতেছে কেন? [এই অনুবাদ কল্লুকের টীকা সম্মত]।

সত্যযুগেই ঋষিগণ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহা হইতে নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইতেছে যে, সত্যযুগেও অকাল মৃত্যু ছিল। যাহা হউক, টীকাকার কল্লুকভট্ট এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণানাং শ্রুতিশাস্ত্রজ্ঞানাং বেদোদিতায়ুষঃ পূর্ব্বং কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি আয়ুরল্পত্বহেতোরধর্ম্মাচরণস্যাভাবাৎ।"

এখানে দেখিতেছি "বেদোদিত পরমায়ুর পূর্ব্বে মৃত্যু কেন ব্রাহ্মণগণকে হিংসা করিতেছে?" এই কথা বলিয়া কল্লুকভট্ট প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন যে, সত্য যুগের নরগণ বেদবিহিত পরমায়ু বিশিষ্ট ছিলেন। কিন্তু "চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ" এই বাক্যাংশের টীকায় বেদবিহিত পরমায়ুকে "কলিপরো বা" বলিয়া সত্যযুগীয় মানবগণের অস্বাভাবিক দীর্ঘ পরমায়ু সংক্রান্ত কুসংস্কারের সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ফল কথা, তিনি মেধাতিথির মতানুসরণ না করিয়া, বড় গোলমাল ঘটাইয়াছেন।

উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিতেছেন—

"পরিপূর্ণায়ুভিঃ ত্রৈবিদ্যবিভুঃ যুক্তং পুরুষায়ুষজীবিভিঃ শতবর্ষং পুরুষাণাং আয়ুঃ ততঃপুরা মৃত্যুর্ম্মরণমেষাং ন যুক্তম্।"

সুতরাং মেধাতিথির মতে সত্যযুগের

* মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ চতুর্ধর এই শ্রুতির অন্যপ্রকার অর্থগ্রহণ করিয়াছেন। শান্তিপর্ব্বের ৩১২ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি এই,—

অব্যক্তস্য নরশ্রেষ্ঠ কালসংখ্যাং নিবোধ মে।
পঞ্চকল্পসহস্রাণি দ্বিগুণান্যহরুচ্যতে॥
রাত্রিরেতাবতীচাস্য প্রতিবুদ্ধো নরাধিপ।

অনুবাদ।—সেই অব্যক্ত পুরুষের কালসংখ্যা কহি শ্রবণ কর। দশসহস্র কল্পে তাঁহার একদিন ও তৎপরিমিতকালে তাঁহার রাত্রি হইয়া থাকে।" ইহার টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন,—

"অনয়ৈব সংখ্যয়া শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষ ইতি
শ্রুতে রস্য শতং বর্ষাণ্যায়ুরিতি জ্ঞেয়ং"॥

অর্থাৎ উক্ত সংখ্যানুসারে সেই অব্যক্ত পুরুষের পরমায়ু শত বৎসর, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ।

নরগণ শতবর্ষ পরমায়ু বিশিষ্ট ছিলেন। রাঘবানন্দও "চতুর্ব্বর্ষ শতায়ুষঃ" এর টীকায় বলিয়াছেন,—"শতপরিমিতং পুরুষায়ুরেব।" ইতি পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বেদবক্তা ঋষিগণ (যাঁহারা সত্য যুগের লোক) বৈদিক মন্ত্র সমূহের দ্বারা তাঁহাদের উপাস্য দেবতার নিকট শতবর্ষ পরমায়ু পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব সত্যযুগীয় নরগণের শতবর্ষ পরমায়ু শ্রুতি স্মৃতিসিদ্ধ।

গিরিগুহা।

অনন্ত কৌশলময় জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমা সকল দিকেই সমভাবে প্রকাশিত। সামান্য বালুকা কণা হইতে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর না কেন দেখিতে পাইবে তাহার সূক্ষ্ম হস্ত সমস্ত দ্রব্যেই সমান ব্যাপৃত। এই প্রবন্ধে তাহার এক অত্যদ্ভুত মহিমার কথা বলিব।

অনেকেরই জানা আছে যে পর্ব্বতের দেহে মধ্যে মধ্যে গহ্বর হইয়া থাকে। ঐ সকল গহ্বরকে গিরিগুহা কহে। গিরিগুহা আবার দুই প্রকার। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। যে সমস্ত গুহা মনুষ্য-হস্তখোদিত তাহা অস্বাভাবিক এবং যাহা প্রকৃতি হস্তে স্বতই উৎপন্ন হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক নামে অভিহিত। অদ্য স্বাভাবিক গুহার বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিব।

ভূগর্ভ মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ায় কখন কখন বাষ্প সঞ্চিত হইতে থাকে। বহু কাল গত হইলে ভূগর্ভস্থ উত্তাপের সাহায্যে সেই বাষ্প ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া সতেজে উৎক্ষিপ্ত হয়। সেই বাষ্প উদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ গর্ভস্থ তরল দ্রব্যাদিও সবেগে মহা শব্দ সহকারে বহির্গত হয়। ইহাকেই আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গম কহে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে পূর্ব্বে পৃথিবী তরল অবস্থায় ছিল। সেই সময় পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই ঐ প্রকার অসংখ্য অসংখ্য আগ্নেয় গিরি উদ্ভূত হইত। কাল ক্রমে ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে একে একে প্রায় সকল আগ্নেয় গিরিই নির্ব্বাপিত হইয়া গেল; এখন যাহা দুই চারিটি দেখিতে পাওয়া যায় ভবিষ্যতে তাহাও আর থাকিবে না। পর্ব্বত মাত্রই এই অসামান্য বলশালী বাষ্পশক্তির প্রভাবে উৎপন্ন। সুতরাং পর্ব্বত মাত্রেরই অভ্যন্তরে ঐ প্রকার বাষ্পভাণ্ডার থাকিবার সম্ভাবনা। কতকগুলি বাষ্পভাণ্ডার ভূপৃষ্ঠ হইতে এত নিম্নে অবস্থিত যে বোধ হয় কখনই কেহ তাহাদিগকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে না; আবার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত উপরে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী থাকাতে দৈব ঘটনার বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গিরিগুহা বলিলেই আমরা প্রায় দুই চারিজন মনুষ্য বাস করিতে পারে বা, পাঁচ সাতটা ব্যাঘ্র কি সিংহ থাকিতে পারে এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর মনে করি। কিন্তু এক একটা গহ্বর এত বৃহৎ যে শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

য়ুরোপে অষ্ট্রিয়া দেশের অন্তর্গত কার্ণিগুলা প্রদেশে আডেল্‌বার্গ নামক গিরিগুহা গুহামুখ হইতে প্রায় পাঁচ হাজার হাত পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভিতরে আরও কত দূর আছে কে বলিতে পারে? কেণ্টকি প্রদেশে মামথ গুহার প্রধান দালান (মধ্য ভাগের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ) হইতে প্রায় ২২৬টি গহ্বরশাখা ইতস্ততঃ পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ সমস্ত গুহা

পর্ব্বতটিকে এক প্রকার শূন্যগর্ভ করিয়াছে বলিলেই হয়। সমস্ত গুহার দৈর্ঘ্য সমষ্টি ধরিলে ১৬৩ মাইলেরও অধিক হয়।

এরূপ অনেক গুহা আছে যে যদিও সেই সমস্ত প্রায়ই ভ্রমণকারী দ্বারা পরিদৃষ্ট হয় তথাপি তাহার অভ্যন্তরের অনেক স্থল আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃতই আছে। ১৮৪৮ খৃঃ অঃ জনৈক আমেরিক পর্য্যটক হার্জ্জ পর্ব্বতে বোমান গহ্বর দর্শন করিতে যাত্রা করেন; তিনি সহচরগণে পরিবৃত হইয়া উক্ত গহ্বরে প্রবেশ করিয়া অতি কায়ক্লেশে এক গুহা হইতে অপর গুহায় যাইতে লাগিলেন। তিনি যে সমস্ত স্থান দর্শন করেন বোধ হয় ঐ সকল স্থান সৃষ্টির আদি হইতে মনুষ্য-পদ-স্পৃষ্ট হয় নাই। বহুক্ষণ ভ্রমণ করিতে করিতে তাহাদের হস্তস্থিত আলোক গুলি নির্ব্বাণ-প্রায় হইল। ঘটনাক্রমে তাঁহাদের দিক-দর্শন যন্ত্রটিও ভগ্ন হওয়ায় তাঁহারা প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তাঁহারা পর্ব্বতগহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আবার ঐ গহ্বরের আবিষ্কর্ত্তা ফ্রাঙ্ক বোমান ইহাদিগের অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি তিন দিন অতি গাঢ় অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে অতি নির্জীব ও মৃতবৎ হইয়া দৈবাৎ গহ্বরের মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তিনি বাহিরে আসিলেন বটে কিন্তু অচিরেই এই ভয়ানক পরিশ্রম জনিত কষ্টে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে অতি ক্লেশে সংক্ষেপে তাঁহার বিপদের কথা পুত্রদিগের নিকট বর্ণনা করেন। তাঁহার বংশীয়েরা আজ পর্য্যন্ত ঐ গহ্বরে ভ্রমণকারিদিগের পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিয়া থাকেন।

অনেক অনেক গহ্বরের ছাদে ভিত্তিপ্রাচীরে ও অঙ্গনে শুভ্রহিমানীবৎ একপ্রকার পদার্থ জন্মিয়া থাকে। কার্বনেট অব লাইম নামক পদার্থ বায়ুর জলীয় ভাগের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই পদার্থ উৎপাদন করে। ইহা ছাদে জমিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিচে ঝুলিয়া পড়ে এবং তলদেশ হইতে জমিতে জমিতে ঊর্দ্ধদিকে উঠে। কখন বা উপর হইতে একটি নামিতে থাকে ও কখন নীচে হইতে একটি উঠিতে থাকে ও অবশেষে উভয়ে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব স্ফটিক স্তম্ভরূপে পরিণত হয়!

সমুদ্রগর্ভে যেমন প্রবাল বা স্পঞ্জ নানা প্রকার আকারের দৃষ্ট হয় এবং উহাদের মধ্যে আবার বর্ণ বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ এই সকল স্তম্ভ ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অধিকাংশ তুষারনিভ ধবল হইলেও তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটা বা পীত পিঙ্গল হরিৎ রক্তাভ বা আরক্ত হরিদ্রা বর্ণের হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত উজ্জ্বল চাকৃচিক্যশালী স্তম্ভের উপর দর্শকের হস্তস্থিত আলোকের রশ্মি পতিত হইয়া যে কি মনোরম শোভা উৎপাদন করে তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না।

কত লক্ষ লক্ষ বৎসরে যে এই সমস্ত স্তম্ভ জমিয়া থাকে তাহা ভাবিলে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। সত্তর কি আশি বৎসর পূর্ব্বে ইহার অভ্যন্তরে পরিত্যক্ত উপলখণ্ড আঁইস অপেক্ষা সূক্ষ্মতর শুভ্রবর্ণের পদার্থে আবৃত বোধ হয়। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ভিত্তি গাত্রে দর্শকেরা যে সমস্ত নাম বা চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত তাহা অবাধে

পড়িতে পারা যায়। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখদেখি কত শত যুগে এই গিরিগহ্বরস্থ বৃহদাকার স্তম্ভ সকল গঠিত হইয়াছে। করনিল বা অষ্ট্রেলিয়া গহ্বরে এক একটা স্তম্ভ ৩০ হস্ত উচ্চ ও ৪০ হস্ত পরিধিবিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়!!

এক্ষণে আর একটি অতি মনোহর গুহার কথা বলিয়া আমরা আমাদের এই প্রবন্ধ শেষ করিব। ভূমধ্যসাগরে "নীল গহ্বর" নামে এক গহ্বর আছে, তাহার শোভা অতুলনীয়। ঐ গহ্বরটির চতুর্দ্দিক আবৃত, কেবল একদিকে সমুদ্রজলের উপর ২। ৩ ফিট মাত্র প্রবেশ দ্বার আছে। এতকাল পর্য্যন্ত ঐ গহ্বর অনাবিষ্কৃত ছিল। ১৮২৬ খৃঃ দুই জন জার্ম্মান চিত্রকর সমুদ্রজলে সন্তরণ করিতে করিতে ঐ গহ্বরমুখে প্রবেশ করেন। গহ্বরদ্বার পার হইয়াই তাঁহারা পর্ব্বতের অভ্যন্তরে এক অতি বিস্তীর্ণ গুহায় উপস্থিত হইলেন। গহ্বরটি প্রায় ১২৫ ফিট দীর্ঘ ও ১৪৫ ফিট প্রস্থ। গহ্বরদ্বারের বিপরীত দিকে একটি মাত্র কেবল উঠিবার স্থান আছে। অপর দিকের প্রাচীর সমুদ্রজল হইতে একেবারে লম্বভাবে উঠিয়াছে। সমুদ্রজল এত নির্ম্মল যে তলদেশের শম্বুকাদি অতি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এমন সুন্দর স্নানাগার বোধ হয় প্রকৃতি দেবী পৃথিবীর আর কোথাও সৃষ্টি করেন নাই। গহ্বরের ভিতর যে আলোক আসিতেছিল তাহা প্রথমে সমুদ্রের সুনীল জলে পড়িয়া গহ্বর মধ্যে প্রতিভাত হওয়াতে সমস্ত গহ্বরটি পরিষ্কৃত উজ্জ্বল নীল আলোকে আলোকিত হইতেছে। দর্শকেরা বলেন যে এমন মনোহর স্থল বুঝি ধরাতলে আর দ্বিতীয় নাই।

করুণাময় পরমেশ্বর কোথায় কি ভাবে যে নিজ মহিমা প্রকাশ করিতেছেন তাহার কে ইয়ত্তা করিবে?

মৎস্যরহস্য।

ঐ বিশাল গগন মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন নানাজাতীয় বিহঙ্গকুল নয়নের শোভা সম্পাদন করে তেমনি এই পৃথিবীর জলরাশি পর্য্যবেক্ষণ করিলে অশেষবিধ জলচর পরমেশ্বরের রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় দান করে। যাবতীয় জলচরের মধ্যে মৎস্যের সংখ্যাই অধিক। মৎস্য জাতির বাসস্থান আমাদের দৃষ্টির ও গমনের বহির্ভূত। সুতরাং ঈশ্বর ইহাদিগকে কি পরিমাণ বুদ্ধি দান করিয়াছেন তাহা আমরা অল্পায়াসে জানিতে পারি না। হয়ত গভীর সমুদ্রের তলদেশে অথবা খরবাহিনী স্রোতস্বতীর বঙ্কিম স্রোতে ইহাদিগের বুদ্ধি ও শিল্পনৈপুণ্যের কত অসাধারণ নিদর্শন লুক্কায়িত আছে—বহুকালব্যাপী পরীক্ষা দ্বারা ও বহু পরিশ্রম স্বীকার করিলে সেই সকল কৌতূহলোদ্দীপক রহস্য প্রকাশিত হয়। সাধারণের নিকট মৎস্যজাতির বুদ্ধির অধিক প্রশংসাবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। মৎস্যের দুরদৃষ্ট ও আমাদের অদূরদর্শিতাই তাহার কারণ। যে সকল পণ্ডিত প্রাণিবিদ্যালোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া সুবৃহৎ জন্তু হইতে সামান্য পরমাণুতুল্য প্রাণীদিগেরও কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণে যত্নবান হইয়াছেন, তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাবলী মৎস্য রহস্যের প্রকাশক। তৎপাঠে আমরা আমাদিগের নিত্যব্যবহার্য্য, পরিচিত প্রাণী সংক্রান্ত অনেক নূতন তত্ত্ব জানিতে সক্ষম হই।

যে সকল প্রাণী জলে বাস করে, জল মধ্যস্থ বায়ুর মধ্য দিয়া কানকোর সাহায্যে যাহারা বায়ু গ্রহণ ও বায়ু পরিত্যাগ করে, যাহারা পাখ্‌নার সাহায্যে অক্লেশে সন্তরণ করিতে ও ভারের সমত্ব রাখিতে সমর্থ হয়, যাহাদিগের গাত্র কোমল শল্ক বা কোন না কোনরূপ কোমল আবরণে আবৃত, সেই সকল প্রাণিগণের সাধারণ নাম মৎস্য। জলে ইচ্ছামত গমনাগমনের জন্য মৎস্যের কতকগুলি বিশেযত্ব লক্ষিত হয়। আর ও পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা দিগের ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য বুদ্ধিচাতুর্য্যের অনুকূল প্রমাণ প্রদান করে।

কয়েকখানি পক্ষই মৎস্যের জলে সন্তরণের প্রধান সহায়। তদ্ব্যতীত ইহাদিগের পক্ষে জলে বাস করা অসম্ভব হইত। এই সকল পক্ষ, সকল মৎস্যের সমান নহে। ভিন্ন ভিন্ন পক্ষিজাতির মধ্যে যেমন পক্ষের বিভিন্নতা আছে, মৎস্য সম্বন্ধে ও সেইরূপ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কানকো হইতে পুচ্ছদেশের মধ্যে পাঁচ প্রকার পক্ষ উৎপন্ন হয়। এই পক্ষগুলি স্বস্ব কার্য্যানুসারে বিভিন্ন নামে অভিহিত। পক্ষ সকলের কার্য্যবন্ধ হইয়া গেলে ভারের সমত্ব রক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় মৎস্যের পেট উল্টাইয়া যায়। বোধ হয় সকলেই মৃত মৎস্যকে উত্তানভাবে ভাসমান দেখিয়াছেন। অনেক মৎস্যের পক্ষ ব্যতীত একটি বায়ু থাকিবার উপযোগী থলির ন্যায় আধার থাকে; সেই থলির সঙ্কোচন ও বিস্ফারণ দ্বারা মৎস্য জলে ইচ্ছামত ডুবিতে ও ভাসিতে সক্ষম হয়। মৎস্যের পক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে শুধু যে ইহাদের গতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে তাহা নহে, পক্ষের সংখ্যা গঠনাদি দেখিয়া অনেক সময় মৎস্যের শ্রেণী ও জাতি অবগত হওয়া যায়।

মৎস্য জাতির ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য পরীক্ষা করিলে ইহাদিগের সুবুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। জলের ভিতর ইহাদের দর্শন শক্তির কোনওরূপ ব্যাঘাত হয় না। টোপ ফেল ইহারা দেখিবামাত্রেই দূর হইতে তদভিমুখে ধাবিত হয়। ইহাদিগের শ্রবণ ও ঘ্রাণ শক্তিও বিলক্ষণ তীক্ষ্ণ। সরোবর অথবা নদীর স্বচ্ছ স্ফটিকসঙ্কাশ জলরাশির নিম্নে স্থিরভাবে যে সকল মৎস্য অবস্থান করিতেছে, অকস্মাৎ কোনরূপ শ্রবণভেদি শব্দ হইলে তাহারা চঞ্চল ভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। রোমানেরা কৌতুক করিবার জন্য আপনাদের পুষ্করিণীস্থ মৎস্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখিত; সময়ে সময়ে তীর হইতে একটীর নাম ধরিয়া ডাকিলেই সে তৎক্ষণাৎ আহ্বানকারীর নিকটে আসিত। শ্রবণশক্তির অভাব হইলে এরূপ কখনই সম্ভবপর হয় না। মৎস্যের ঘ্রাণশক্তি কত প্রবল সহজেই তাহা অনুভূত হয়। আমরা মৎস্য ধরিবার সময় মৎস্যদিগকে সহজে আকৃষ্ট করিবার জন্য গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া যে চার ও টোপ প্রস্তুত করি তাহারই আঘ্রাণ পাইয়া উহারা চারে আসিয়া পড়ে। মৎস্যগণ যথেচ্ছা আহার করে না—যে মৎস্যের যে আহার সে তাহাই গ্রহণ করে—ঘ্রাণশক্তির দ্বারা তাহারা আহার বাছিয়া লয়। আস্বাদ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা মৎস্যজাতির আছে কি না সন্দেহ। কথিত আছে যাহারা আস্বাদ গ্রহণে অসমর্থ তাহারা চর্ব্বণ করিতে পারে না—দ্রব্যাদি গিলিয়া খায়। মৎস্যেরা চর্ব্বণ করে না—সুতরাং তাহারা আহার্য্যের আঘ্রাণ পাইলেও আস্বাদ পায় না। অনুভব শক্তি ইহাদিগের অত্যন্ত প্রবল। স্পর্শ মাত্রেই মৎস্য তাহা

অনুভব করিতে পারে। ইন্দ্রিয় সকলের পূর্ণতা দেখিয়া মৎস্যগণকে নিতান্ত বুদ্ধিহীন বলিয়া বোধ হয় না।

মৎস্যের মস্তিষ্ক উচ্চশ্রেণীর জন্তুদিগের মস্তিষ্কের তুলনায় কিছু নিকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে মৎস্যের মস্তিষ্কের অংশগুলি অসম্বদ্ধ ভাবে খুলির অতি অল্প স্থান মাত্র অধিকার করিয়া থাকে—মস্তিষ্কের পরিপুষ্টতা ও কার্য্যাবলীর মধ্যে পরস্পর অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া মৎস্য জাতি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জন্তু অপেক্ষা বুদ্ধিতে হীন বলিয়া বোধ হয়। আবার কোন কোন মৎস্যের মস্তিষ্ক উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর মস্তিষ্কের ন্যায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন। কিন্তু মৎস্যের মস্তিষ্কের যে টুকু বিশেষ নূতনত্ব আছে অপর কোন উচ্চশ্রেণীর জীবে তাহা দৃষ্ট হয় না। মাগেলি চসমললিউ প্রভৃতি বিখ্যাত দেহতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ মৎস্যদিগের মস্তিষ্কের কার্য্যপরীক্ষার্থ কোনও মৎস্যের মস্তিষ্কের কিয়দংশ বাহির করিয়া লইয়া দেখিয়াছিলেন তদ্দারা তাহাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে নাই। বডিলেট সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে মৎস্যদিগের মস্তিষ্কের অধিকাংশ ভাগ নষ্ট হইলেও তাহাদের বুদ্ধিশক্তির কোনরূপ বিপর্য্যয় ঘটে না। কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণিগণ অথবা পক্ষিজাতির মস্তিষ্ক লইয়া এরূপ পরীক্ষা করিলে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়। তাহাদিগের মস্তিষ্কের ক্ষতি হইলে সেই সঙ্গে বুদ্ধিশক্তি ও নষ্ট হইয়া যায়।

মৎস্যের আহারেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া মৎস্য নিরন্তর জল মধ্যে আহারান্বেষণ করিয়া বেড়ায়, কদাচিৎ কোন কষ্টের প্রতি দৃকপাৎ করে না। বড়সীবিদ্ধ মৎস্যকে তীরে উত্তোলন করিলে তখনও সে সেই ধ্বংশকারী টোপের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না। এক ব্যক্তি ছিপের সাহায্যে মৎস্য ধরিতেছিলেন। একবার ভাসমান ফাত্‌নায় অস্বাভাবিক আন্দোলন দেখিয়া মৎস্য টোপ খাইতেছে, এই বিবেচনায় তিনি ছিপ টানিয়া লইলেন। কিন্তু মৎস্যের পরিবর্ত্তে মৎস্যের একটী চক্ষু বড়সীতে বিদ্ধ হইয়া আসিল। তখন তিনি সেই চক্ষুটীকে টোপ স্বরূপ করিয়া পুনরায় ছিপ ফেলিলেন। সেবার একটী মৎস্য উঠিল। তিনি দেখিলেন মৎস্যটী এক চক্ষুহীন। যে মৎস্যটী ক্ষণপূর্ব্বে একটী চক্ষু হারাইয়াছিল, প্রবল আহারেচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া সে পুনরায় আপনার উৎপাটিত চক্ষু আহার করিতে আসিল এবং তখনই বড়সীবিদ্ধ হইয়া অনতিকাল মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল।

মৎস্যের পরিপাক হইবার পরও গৃহীত আহার্য্য দ্রব্য পাকস্থলীর মধ্যে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় অবিকৃত অবস্থায় থাকে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যেন পরিপাক কার্য্য আদৌ আরম্ভ হয় নাই। মৎস্যের ক্ষুধারও একটু বিশেষত্ব আছে। ইহারা যেমন ক্ষুধার জন্য আত্মহারা হইয়া বেড়ায়; আবার আহার না পাইলেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে পারে—তাহাতে ইহাদিগের শরীরের কোনও রূপ ক্লেশ হয় না।

মৎস্য শীতলরক্তবিশিষ্ট প্রাণী। ইহারা অত্যন্ত দীর্ঘজীবী। কতকগুলি মৎস্য আছে তাহাদের বয়সের ইয়ত্তা নাই। বংশানুক্রমে লোকে সেই সকল মৎস্য দেখিয়া আসিতেছে। কিন্তু কেহই তাহাদের বয়স নির্দ্ধারণে সমর্থ নহে। কিন্তু দীর্ঘ জীবন অপেক্ষা তাহাদের সন্তান সন্ত-

তির আধিক্য অধিকতর বিস্ময়কর। সালমন নামক মৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডিম্ব প্রসব করে। একটী সালমনের একেবারে ২০,০০০,০০০ গুলি ডিম্ব হয়। এমন অসাধারণ উৎপাদিকা শক্তি পৃথিবীর অন্য কোন প্রাণীর নাই।

মৎস্যগণ সন্তানদিগের প্রতি নিতান্ত মমতাহীন বলিয়া কথিত আছে। স্নেহবশে সন্তান প্রতিপালন করা জন্তুধর্ম্মের একটী প্রধান লক্ষণ। মৎস্যগণ কেন যে এ লক্ষণভুক্ত নহে তাহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহারা একেবারে অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। সুতরাং সকল গুলিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা ও একেবারে সহস্র সহস্র ক্ষুধার্থ সন্তানদিগকে আহার দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠে। আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াও যদি মৎসের ন্যায় বহুসংখ্য সন্তান পাইতাম তবে বোধ হয় আমাদিগকেও এই নিকৃষ্ট জন্তুদিগের ন্যায় সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতায় বিসর্জ্জন দিতে হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে সকল মৎসকেই সন্তান-স্নেহে বঞ্চিত বলা যায় না। হেরিং ও সালমন প্রভৃতি মৎস প্রসবকালে নদী ও সমুদ্রগর্ভস্থ বাসস্থান ত্যাগ করত প্রবল স্রোত ভেদ করিয়া তটাভিমুখে অগ্রসর হয় এবং তথায় কোন নিরাপদ স্থানে বাসনির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সন্তান প্রসব করে। সন্তানের প্রতি অপরিসীম মমতা প্রযুক্ত তাহারা যে এত কষ্ট স্বীকার করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একদা কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ দুইটি মৎসের একটীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। তাহাতে তাহার অনুচর মর্ম্মপীড়িত হইয়া বন্ধুর সহিত অনেক দূর পর্য্যন্ত সন্তরণ দিয়া আসিয়াছিল। যতক্ষণ তাহার বন্ধু দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ততক্ষণ কেহ তাহাকে জলে নিমগ্ন করিতে পারে নাই।

অন্যান্য জন্তুর তুলনায় মৎস্য অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জন্তু বলিয়া পরিগণিত হইলেও ইহাদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুদ্ধি চাতুর্য্যের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। মৎস্যের জীবনোপযোগী সুন্দর গঠন, ঐন্দ্রিয়িক পূর্ণতা ও স্বভাবসুলভ কার্য্যাবলী মনুষ্যমাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে, ও প্রাণিবিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়।

(ক্রমশঃ)

সারস্বত আশ্রমে ব্রহ্মোপাসনা।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে নহাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥"

পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হয় না।

পূর্ণ পরাৎপর মঙ্গলময় পর ব্রহ্মই মনুষ্যের একমাত্র উপাস্য দেবতা এবং যাবদীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কেবল মনুষ্যই তাঁহার উপাসনার অধিকারী। প্রাণী রাজ্যের মধ্যে পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি তাঁহার উপাসনা করে না। উদ্ভিদ্ রাজ্যের মধ্যে ওষধি, বনস্পতি, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি তাঁহার উপাসনা করে না। জড় রাজ্যের মধ্যে মৃৎ পাষাণাদি তাঁহার উপাসনা করে না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যেই কেবল উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতেই উপাসনার বহুল অনুষ্ঠান

এই পৃথিবীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বহুল অর্থ ব্যয়ে যে মঠ মন্দির প্রভৃতি সুরম্য দেবালয় সকল নির্ম্মাণ করেন, এই উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। এই উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতেই যাগ যজ্ঞ মহোৎসব প্রভৃতির দ্বারা বহু আড়ম্বরে মনুষ্য শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করত মনের বেগ নিবারণ করে। বেদ বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি স্তূপাকার গ্রন্থের মধ্যে যে জ্ঞান-কাণ্ড, ভক্তি-কাণ্ড এবং কর্ম্ম-কাণ্ড সন্নিবেশিত হইয়াছে, এই উপাস্য উপাসক সম্বন্ধই তৎ সমুদায়ের মূল প্রবর্ত্তক। এই উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতেই কেহবা পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করত ঈশ্বরের কীর্ত্তি কলাপ সন্দর্শন করেন, কেহবা স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থবাসী হইয়া মুক্তিলাভের অভিলাষী হন, কেহবা যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্তিমিত লোচনে নিদিধ্যাসনে এবং সমাধিসাধনে নিযুক্ত থাকেন। গুরু শিষ্য উভয়েই উপাসক এবং পরম গুরু পরমেশ্বর উভয়েরই উপাস্য, এই জন্যই পরমাত্মজ্ঞান লাভার্থে গুরুর নিকটে শিষ্য গমন করেন এবং সেই জ্ঞানাপন্ন শ্রদ্ধেয় গুরু উপস্থিত শিষ্যকে শান্ত সমাহিতচিত্ত দেখিয়া, যে বিদ্যা দ্বারা সত্য এবং অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ প্রদান করেন। পরমাত্মা এবং মানবাত্মার মধ্যে এই যে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা মনুষ্যের পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। কেননা এইরূপ সম্বন্ধ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এসম্বন্ধ প্রাণিরাজ্যে নাই, উদ্ভিদ্-রাজ্যে নাই, জড়-রাজ্যে নাই। এই সম্বন্ধের আধার ভূমি কেবল সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা এবং জ্ঞানধর্ম্মসমন্বিত এই অসংখ্য অসংখ্য মানবাত্মা।

যে দিন এই মানবাত্মার সৃষ্টি হইয়াছে, সেইদিন হইতেই উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে। কাল সহকারে মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্ম যতই বিকসিত হইতে থাকে, ততই এই সম্বন্ধ গাঢ়তর হয়। সেই আদি কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধের কখনও বিচ্ছেদ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবে না। এই পৃথিবীতে কালে কালে কত মহাপ্রলয় উপস্থিত হইতেছে। কালে কালে কত আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত উৎপন্ন হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পশু পক্ষী মনুষ্যসম্বলিত গ্রাম নগর দগ্ধ করিতেছে। কালে কালে কত রাজ্য বিপ্লব ও তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া নরকণ্ঠনিঃসৃত শোণিতস্রোতে পৃথ্বীতল প্লাবিত করিতেছে। কালে কালে প্রবাহ-বলে নদীতীরস্থ কত গ্রাম নগর ভগ্ন হইতেছে। কালে কালে কত জলপ্লাবনে দেশ প্রদেশ প্লাবিত, কত প্রলয় প্রবাত ও ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ জীবশ্রেণী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তত্রাচ এই উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ কখনই বিলুপ্ত হয় নাই। কালে কালে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইয়া কত নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কার হইতেছে। কালে কালে মহা মহা বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়া কত নূতন নূতন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইতেছে। কালে কালে নূতন রাজ্য ও রাজার প্রতিষ্ঠা হইয়া আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা এই উপাস্য উপা-

সক সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হইতেই দেখা যায়। এই উপাস্য উপাসক সম্বন্ধের স্বাভাবিক বিদ্যমানতা সত্ত্বেও শ্রদ্ধাহীন নিরীশ্বর নাস্তিকেরা উপাসনার বিরুদ্ধে কালে কালে কত কুতর্ক এবং প্রতিবাদ উত্থাপিত করিয়া আসিতেছে। কালে কালে নাস্তিত্ববাদপূর্ণ গ্রন্থ সকল সংরচন করিয়া তাহারা জন-সমাজের মধ্যে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছে, পুরুষের স্থলে প্রকৃতিকে অভিষিক্ত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব উড়াইবার জন্য কালে কালে কত জটিল বাক্যাড়ম্বর প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের কোন ও চেষ্টা ও কোন কার্য্য কস্মিন্‌কালে সংসিদ্ধ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবে না; বরং তাহাদের বিরুদ্ধ আচরণে তত্ত্ববিদ্যা আরও পরিপুষ্ট হইয়া, তত্ত্বজ্ঞান আরও উজ্জ্বল হইয়া, কুতর্ক স্থলে সুতর্ক আসিয়া, প্রকৃতির উপরে পুরুষ অভিষিক্ত হইয়া এই উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ আরও সুদৃঢ় হইতেই দৃষ্ট হয়। কাল-চক্র নিয়তই ঘূর্ণিত হইয়া মহাকালে বিলীন হইতেছে। বাল্য, যৌবন, জরা, মৃত্যু চিরকালই ক্রীড়া করিতেছে। এই পৃথিবী রূপ প্রকাণ্ড নাট্যশালায় সুখ-দুঃখের অত্যাশ্চর্য্য অভিনয় হইয়া কখন ও হাস্য, কখন ও ক্রন্দন, কখন হর্ষ, কখন ও বিষাদ, চিরকালই এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। জীবরাজ্যে জনন-প্রবাহ চিরকালই প্রবাহিত হইয়া নূতন নূতন বংশের উৎপত্তি হইতেছে এবং মরণ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া পুরাতন বংশের বিলোপ হইতেছে। কালের এই সকল পরিবর্ত্তনে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধের কখনও বিচ্ছেদ হয় নাই। এ সম্বন্ধ নিত্য কালই অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যে উপচার সকল দ্বারা পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করা যায়, এই পৃথিবীতে তাহার নানা প্রকার অনুষ্ঠান হইতেছে।

পরমাত্মা কেন উপাস্য হইলেন? কেবল মনুষ্যই কেন তাঁহার উপাসক হইল? সাত্ত্বিক বুদ্ধি, পরমাত্মজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি অত্যুচ্চ উপচার সকল কেন মানবাত্মার মধ্যেই নিহিত হইল? দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবার জন্য কেন এই ইন্দ্রিয়গণ এবং মনোবৃত্তি তত্তদুপযোগী হইয়া সৃষ্ট হইল? শান্তি, উপরতি, তিতিক্ষা এবং সমাধান এই সকল যে সাত্ত্বিক বুদ্ধি, পরমাত্মজ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তি সাধনের এক এক উজ্জ্বল রত্ন, এই সকল মহামূল্য উজ্জ্বল রত্ন দ্বারা কেন এই মানবাত্মা সুশোভিত হইল? এই সকল প্রশ্নের উত্তর এই, যে মনুষ্য সাধন দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্য সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর মঞ্চে দিন দিন যতই কেন আরোহণ করুক না, এই সাধনই প্রকৃত সভ্যতার মূল। যোগীরা যে শীতাতপ সহ্য করিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট থাকেন, কোন্ পাষণ্ড তাঁহাকে অসভ্য বলিতে পারে। বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণতর আলোক দিন দিন মনুষ্যের মনকে যতই কেন সচকিত করুক না, এই সাধনের অভ্যন্তরে যে বিশুদ্ধ এবং উন্নত বিজ্ঞান সঞ্চিত রহিয়াছে, সে বিজ্ঞান বহু অনুসন্ধানের ফল। বিদ্যা-বুদ্ধির চর্চ্চা হইয়া বিষয় বাণিজ্যের যতই কেন বিস্তার হউক না, সাধন দ্বারা যে বুদ্ধির উৎকর্ষতা লাভ হয়, যে বিদ্যার অনুশীলন হয়, তাহাই সাত্ত্বিক বুদ্ধি এবং তাহাই পরা বিদ্যা অথবা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া আমাদের সুমহান আর্য্য শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ সাত্ত্বিক বুদ্ধি এবং পরা বিদ্যাই মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্ন-

তির প্রধান কারণ। মনুষ্য সদাচার শিক্ষা করিয়া যতই শিষ্ট ও বিনয়ী হইতে পারে হউক, কিন্তু এই সাধনের অভ্যন্তরে যে শিষ্টাচার এবং বিনয় গুণ নিহিত রহিয়াছে, সে শিষ্টাচার এবং বিনয় গুণ স্বর্গীয়। মনুষ্য বিদ্বান্ হইয়া ন্যায়, সত্য, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সৎগুণ সকল যত উজ্জ্বল করিতে পারে করুক কিন্তু পরমাত্ম, জ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তির সাধনে ঐ সকল সদ্গুণ যে রূপ উজ্জ্বলভাব ধারণ করে, তাহা দেবস্পৃহনীয়। বহির্ব্বস্তু সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিয়া মনুষ্য যত জ্ঞানী হইতে পারে হউক কিন্তু পরমাত্ম জ্ঞানের অভ্যন্তরে যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা অতলস্পর্শ। স্বজাতির প্রতি ভালবাসা ইতর জন্তুদিগের মধ্যে যখন প্রকাশ পাইতেছে, তখন সৃষ্টির শিরোভূষণ স্বরূপ জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত উৎকৃষ্ট মনুষ্য স্বজাতির প্রতি যত ভালবাসা প্রকাশ করিতে পারে করুক, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অভ্যন্তরে যে গভীর প্রেম নিহিত রহিয়াছে, মনুষ্যের স্বজাতির প্রতি ভালবাসা সে প্রেমের ছায়ামাত্র।

মানবাত্মা যতদিন এই শরীরপিঞ্জরে বদ্ধ থাকিবে, ততদিন শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা দ্বারা সাধনের উপচার সকল আহরণ করিতে হইবে। আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সাধুসমাগম, সাধুসংসর্গে অবস্থিতি প্রভৃতি কার্য্য সুসম্পন্ন করিলে শরীরের দ্বারা সাধনের উপচার সকল আহরণ করা যায়। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া পরমাত্মসংগীত শ্রবণ, সাধুর সঙ্গে সদালাপ, সাত্ত্বিক আহার প্রভৃতি কার্য্য সুসম্পন্ন করিলে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সাধনের উপচার সকল আহরণ করা যায়। মনোবৃত্তিকে সংযত করিয়া স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতি কার্য্য সুসম্পন্ন করিলে মন দ্বারা সাধনের উপচার সকল আহরণ করা যায়। বুদ্ধিবৃত্তিকে সুমার্জ্জিত এবং সাত্ত্বিকভাবাপন্ন করিয়া তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিলে, বুদ্ধির দ্বারা সাধনের উপচার সকল আহরণ করা যায়। জ্ঞান ও প্রেমকে বিশুদ্ধ এবং উজ্জ্বল করিয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত থাকিলে আত্মা দ্বারা সাধনের উপচার সকল আহরণ করা যায়। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারা যত সাধনের উপচার আহরণ করা যায়, এ সমস্ত উপচারই আত্মজ্ঞান এবং আত্মপ্রভার ফল। এই আত্মা ব্যতীত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এ সকলি যে অকর্ম্মণ্য, এই শরীরের মৃত্যু তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! আত্মার চৈতন্যেই শরীরের স্পন্দন। আত্মার চৈতন্যেই ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য। আত্মার চৈতন্যেই মনঃ বিদ্যুৎ অপেক্ষা ও দ্রুতগামী। আত্মার চৈতন্যেই বুদ্ধির বিকাশ। সুতরাং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারা সাধনের যে সমস্ত উপচার আহরণ করা যায়, সে সমস্ত উপচার আত্মার প্রসন্নতার জন্য। আত্মা এই সমস্ত উপচার প্রাপ্ত হইলেই প্রসন্ন হয়, প্রসন্ন হইয়া তাহার নিজের উপচার যে বিশুদ্ধ জ্ঞান বিশুদ্ধ প্রেম, তাহার সঙ্গে সমস্ত উপচার একত্রিত করিয়া যখন পরমাত্মাকে প্রদান করে, তখনই কৃতার্থ হয়। যে সাধক আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে এই রূপে উপাসনা করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করেন। যে সাধক সাধন দ্বারা সৎবৃত্তি সকলকে উন্নত করিয়া সাধু হইতে পারেন, তাঁহার সাধু সংসর্গ, সাধু সমাগম প্রভৃতির প্রয়ো-

জন কি? যে সাধক সাধন দ্বারা আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া মহা মহা তীর্থের ফল ভোগ করিতে পারেন, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি চতুর্দ্দশ তীর্থ তাঁহার কি করিবে? আমাদের শাস্ত্রে আছে যে "জনা যৈস্তরন্তি তানি তীর্থানি।" অর্থাৎ মনুষ্যগণ যাহা দ্বারা দুঃখ হইতে, পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়, তাহাকেই তীর্থ বলা যায়। এই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রাচীন মহর্ষিরা উল্লিখিত চতুর্দ্দশ তীর্থের পরিবর্ত্তে যে চতুর্দ্দশ আধ্যাত্মিক তীর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে চতুর্দ্দশ মহাতীর্থ এই,

> "সত্যং তীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
> সর্ব্বভূতদয়াতীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেবচ॥
> দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
> ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
> জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম্।
> তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা।"
>
> (স্কন্দপুরাণ)।

অর্থাৎ প্রথম তীর্থ সত্য, দ্বিতীয় তীর্থ ক্ষমা, তৃতীয় তীর্থ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চতুর্থ তীর্থ সর্ব্বভূতে দয়া, পঞ্চমতীর্থ সর্ব্বত্র সরলতা, ষষ্ঠ তীর্থ দান, সপ্তম তীর্থ দম, অষ্টম তীর্থ সন্তোষ, নবম তীর্থ ব্রহ্মচর্য্য, দশমতীর্থ প্রিয়বাদিতা, একাদশ তীর্থ জ্ঞান, দ্বাদশ তীর্থ ধৃতি, ত্রয়োদশ তীর্থ পুণ্য, চতুর্দ্দশ তীর্থ মনের বিশুদ্ধতা। সাধনসম্পন্ন জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এই চতুর্দ্দশ আধ্যাত্মিক তীর্থের ফল ভোগ করিয়া দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পান। শরীর, ইন্দ্রিয়, মনঃ বুদ্ধি এবং আত্মা দ্বারা সাধনের যে সমস্ত উপচার আহরণ করা যায়, তৎসমুদয় উল্লিখিত চতুর্দ্দশ তীর্থের ফল। যে সাধক এই সমস্ত উপচার দ্বারা পরমাত্মার উপাসনা করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন। এই সমস্ত উপচার দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে কোনও কালেই তাঁহা হইতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না। তিনি গৃহী হইয়া সন্ন্যাসী হইতে পারেন, সন্ন্যাসী হইয়া গৃহস্থ আশ্রমের সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন। তীর্থবাসী যেমন বিবেকী এবং বৈরাগী হন, তিনি গৃহী হইয়াও সেই রূপ বিবেকী এবং বৈরাগী হইতে পারেন। বিষয়বিত্ত যদি সাধনের বিরোধী হয়, তবে তিনি তাহা পৃথিবীর ধূলিরাশি বলিয়া অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু পরমাত্মাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার শরীর এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করে কিন্তু আত্মা পরমাত্মাতে সংস্থিত থাকে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল উপস্থিত হইলে যদি তৎসমুদয় সাধনোপযোগী হয় তবেই তিনি তাহাদিগকে উপভোগ করেন, যদি সাধনোপযোগী না নয়, তবে তিনি তাহাদিগকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মনের বস্তু সকল তিনি বিবেকী হইয়া এই রূপে নির্ব্বাচন করেন, যে তৎসমুদয় তাঁহার সাধন এবং তপস্যার পক্ষে কোনও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। আত্মতত্ত্ব এবং পরমাত্ম-তত্ত্ব, আর আর সকল তত্ত্ব অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। তাঁহার সাত্ত্বিক বুদ্ধি আর আর সকল তত্ত্বকে স্থূল জ্ঞান করিয়া আত্মা এবং পরমাত্মাকেই পরম তত্ত্বের বিষয় করিয়া তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকেন। তিনি এই সমস্ত উপচার আহরণ করিয়া যেমন পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, এমন আর কেহই প্রিয়রূপে উপাসনা করিতে পারে না এই জন্যই মহর্ষি উপদেশ দিতেছেন "আত্মানমেব প্রিয়মুপা-

সীত"। "পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। আর আর সকল বস্তুই মরণধর্ম্মশীল এবং অনিত্য। তাহাদের উপাসনা করিলে আত্মার অমৃতত্ব এবং মোক্ষ লাভের সম্ভাবনা নাই, এই জন্যই মহর্ষি বলিতেছেন

"স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে নহাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি"॥)

যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হন না।

আজ আমরা যে আশ্রমে উপবিষ্ট হইয়া অমৃত স্বরূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছি, ইহাও এক তীর্থ বিশেষ। কেননা দূর দূরান্তর হইতে আজ এই সারস্বত আশ্রমে ভক্ত গণের সমাগম হইয়াছে। আমাদের সম্মুখস্থিত স্বরস্বতী নদী যদিও কালবশে মৃতা হইয়াছে, তত্রাচ ইহার নাম অদ্যাবধি বিলুপ্ত হয় নাই। সৌভাগ্য ক্রমে এই সুরম্য পবিত্র আশ্রম এই স্বরস্বতীতীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এস্থানে সেই পুরাণ পরব্রহ্মের উপাসনা হইতেছে। প্রাচীনতম কালে এই সরস্বতী তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিরা বেদ মন্ত্রে যে অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের স্তুতিগান এবং আরাধনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে যুগ যুগান্তর পরে আবার এই বর্ত্তমান কালে তথায় এই সারস্বত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বেদ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা সেই অদ্বিতীয় পুরাণ পরব্রহ্মের আরাধনা করিতেছি। সেই একমাত্র পরব্রহ্মই পুরাণ, ভারতের সেই আদি ব্রহ্মজ্ঞান পুরাণ, এই সরস্বতী দেব নদী পুরাণ, এই সারস্বত আশ্রম নাম পুরাণ। আমরা এই সরস্বতী তীরবাসী হইয়া সারস্বত আশ্রম যদি পুনঃ প্রতিষ্ঠা না করিব, তবে আর কে করিবে। যে ব্রহ্মজ্ঞান ভারতের পুরাতন বহু মূল্য উজ্জ্বল রত্ন, আমরা ভারতবাসী হইয়া যদি জন-সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে তাহা সর্ব্বাগ্রে ধারণ না করিব, তবে আর কে করিবে। যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা আর্য্য ঋষিদিগের একমাত্র উপাস্য কুলদেবতা ছিলেন, আমরা সেই বিশুদ্ধ আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সে উপাস্য কুলদেবতাকে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিব। এই জন্যই আজ এই পবিত্র ব্রহ্মতীর্থে, এই সারস্বত আশ্রমে ভক্তগণে একত্রিত হইয়া আমাদের আরাধ্য দেবতা যে পুরাণ পরব্রহ্ম, তাঁহারই উপাসনা করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থক্য সম্পাদন করিতেছি। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে।

হে পরমাত্মন! তুমি আমাদের যেমন প্রিয়, এমন প্রিয় আর কেহই নাই। তুমি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়। তুমি আমাদের সকল অবস্থায় ও সকল ঘটনায় প্রিয়। তুমি আমাদের জীবনে প্রিয়, মরণে প্রিয়। তুমি আমাদের সুখে প্রিয়, দুঃখে প্রিয়। তুমি আমাদের সম্পদে প্রিয়, বিপদে প্রিয়। তুমি আমাদের হাস্যে প্রিয়, ক্রন্দনে প্রিয়। তুমি আমাদের রোগে প্রিয়, আরোগ্যে প্রিয়। তুমি ইহকালে প্রিয় পরকালে প্রিয়। এই জন্যই তুমি আমাদের মরণশীল প্রিয় নও। হে দেব! পিতা পুত্রকে ত্যজ্য পুত্র করিতে পারেন, বন্ধু বন্ধুকে পরিত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু তুমি আমাদের এমন পিতা নও, এমন বন্ধু নও, যে তুমি আমাদিগকে কোন ও কালে পরিত্যাগ করিবে। আমরা ও যেন তোমাকে কোনও কালে পরিত্যাগ না করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪, পৌষ ও মাঘ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	৪৭৭॥৶০
পূর্ব্বকার স্থিত		৩১৬২।৶১০
সমষ্টি	... ...	৩৬৪০৵১০
ব্যয়		৫১৫।৵০
স্থিত	... ...	৩১২৪৸১০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ১২৭৸০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ১৮১৫ শকের বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ২৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১০০৲

৺ বাবু শিবচন্দ্র দেবের স্ত্রী ৫৲

শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী ৫৲

শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ২৲

" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত ২৲

" " দীননাথ অধ্যেতা ২৲

" " কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায় ৫৲

" " কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ১৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র ধর ৸০

পুরাতন বেত বিক্রয়ের মূল্য ২৲

১২৭৸০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ২৯৸০

শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার রংপুর ১৮১৪ শকের মাশুল শোধ ।৵০

১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৷৵০ মধ্যে ৩৲

" হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য ২৲ টাকা বাকী মধ্যে ১৲

" রামচন্দ্র মৌলিক বেনারস ১৮১৬ শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল ৩৷৵০

সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ বেনারস ১৮১৫ শকের মাশুল ।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল মতিলাল কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲ টাকার মধ্যে ২৲

৺ বাবু জয়গোপাল সেন ১৮১০ শকের পৌষমাসের সাহায্য ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল মিত্র কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

" " গোপালচন্দ্র দে কলিকাতা ১৮১৪ শকের মূল্য ৩৲ টাকার মধ্যে ১৲

" " দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ১৮১৪ শকের সাহায্য ৪॥০ টাকা মধ্যে ২৷০

" " মতিলাল পাল কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲

" " শ্রীশচন্দ্র মল্লিক আন্দুল ১৮১৫ শকের অর্দ্ধ মূল্য ১॥০

" " বসন্তকুমার ভকত চন্দননগর ১৮১৫ শকের পৌষ হইতে ১৮১৬ শকের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত পত্রিকার অর্দ্ধমূল্য ও মাশুল শোধ ১৸৵০

" " হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৮১৪ শকের পত্রিকার বাকী মূল্যশোধ ১৲

" " প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী কলিকাতা ১৮১৫ শকের মূল্য ২৲ টাকা বাকী মধ্যে ১৲

১৮১১ ও ১৪ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঁধাই দুই খণ্ড নগদ বিক্রয় ৪৲

২৯৸০

পুস্তকালয়	... ...	৩২৵১০
যন্ত্রালয়	... ...	১৫০৶১০
গচ্ছিত	... ...	১২৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৯॥০
সেভিংসব্যাঙ্ক		১১৫৲
পুস্তক বিক্রয়ের কমিসন	..	১৶১০
সমষ্টি		৪৭৭॥৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	১৬৫।৵৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৭৸৵০
পুস্তকালয়	...	৩৯৸৵০
যন্ত্রালয়	..	২১১৸১৫
গচ্ছিত	...	২৪।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১৫৸৶০
সমষ্টি		৫১৫।৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজত্। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নববর্ষ।

"যস্মাদর্ব্বাক্ সম্বৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্।"

যাঁহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সংবৎসর পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি অমৃত এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন।

আমরাও এই মর্ত্ত্যলোকস্থ হইয়া এই সংবৎসর পরিবর্ত্তন সময়ে সেই দেবোপাস্য পরম দেবতাকে এই অসীম জগতে দীপ্যমান ও আমাদের আত্মায় দেদীপ্যমান দেখিয়া প্রীতিভক্তি পরিপূরিত হৃদয়ে তাঁহার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। দেবগণ যেমন নিয়ত তাঁহারই উপাসনা করেন, আমরাও যেন নিয়ত তাঁহারই উপাসনা করিয়া দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন হইতে পারি। মানব শরীরে এবম্বিধ দেবস্বভাব লাভ করা অপেক্ষা আর উচ্চ অধিকার কি আছে?

হে বিষয়ি! তুমি ইহা জানিয়াও কি মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অমৃত-পথ হইতে ভ্রষ্ট ও সংসারারণ্যে মৃগতৃষ্ণিকা-পরবশ হইয়া কল্পিত সুখের অন্বেষণে ধাবিত হইবে? এখনও সময় আছে, যে পথে মহতী বিনষ্টি, তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর, ঈশ্বরের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ কর, মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হও, যে মনুষ্যজন্মে মুক্তির দ্বার অপাবৃত, সাবধানে তাহাতে প্রবেশ করিয়া পরমতত্ত্বের অনুসন্ধান কর, যে জীবন ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত নহে তাহা বিষাদময় অকিঞ্চিৎকর ও ব্যর্থ, অদ্য সে জীবন-ভার পরিহার করিয়া করুণাময় পরমেশ্বরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট অকপটে নূতন জীবন প্রার্থনা কর—তিনি তোমার প্রার্থনা পূরণ করিবেন।

হে মুমুক্ষু! তুমি হয়ত অনেক দিনের সাধন ও তপস্যাবলে দয়াময় ঈশ্বরের অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইয়া তোমার জীবন-তরীকে তাঁহার আশ্রয়স্থানে আনিতে পারিয়াছ ও অবশেষে তাঁহার প্রসাদে তাঁহার অভয় কূলে সমুত্তীর্ণ হইবে, এরূপ আশায় উৎফুল্ল রহিয়াছ, তুমি ঈশ্বরভক্ত জনগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিষয় আলোচনা করিয়া পরম তুষ্টি অনুভব

করিয়া থাক ও সেই বিদ্যুতপুরুষের সহবাস যাহা অচিরকালের জন্ম প্রাপ্ত হও তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া নিরন্তর তাঁহার সহবাস লাভ জন্য প্রবল স্পৃহান্বিত হইয়া রহিয়াছ। আইস, মুমুক্ষুগণ! তোমরা আমাদিগের সহিত যোগদান করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন কর। হে জীবন্মুক্ত ভক্ত সাধুগণ! তোমরা ঈশ্বরের প্রেমে নিমগ্ন হইয়া নিরন্তর তাঁহার ভজনসাধনাতে নিযুক্ত রহিয়াছ, তোমাদের সংশয়ান্ধকার ওমোহজাল অপসারিত হইয়াছে,হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ সংভিন্ন হইয়াছে,তোমরা তাঁহার প্রসাদে শুভবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তৎসহকারে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতেছ, তোমরা ঈশ্বরোপাসনাতে আমাদের পথপ্রদর্শক হও। হে ব্রহ্মবাদিনী! তোমরা নিজ নিজ কক্ষে অদ্য কোমল ও সুস্নিগ্ধ ভাবে মঙ্গলময়ী মাতার ক্রোড়ে যাইয়া তাঁহার নিকট আপন আপন প্রাণের বেদনা অবগত করাও। অনেক পূর্ব্বে তোমাদের কুলোজ্জ্বলকারিণী অনেকেই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তন্মধ্যে যিনি বলিয়াছিলেন সমস্ত পার্থিব বিষয় লইয়া আমি কি করিব? উহা দ্বারা আমি ত অমৃতত্ব পাইব না; তিনি কি গভীর বৈরাগ্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডবমাতা বিপৎসমূহ ঈশ্বরস্মরণের হেতু বলিয়া বিপদ্‌কে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অতএব তোমরা অদ্য বিগলিত হৃদয়ে ও সরলপ্রাণে আপনার ও আত্মীয় জনের জন্য যে শুভাশিষ প্রার্থনা করিবে, দয়াময় পরমেশ্বর তাহা অকাতরে প্রদান করিবেন।

হে ভক্তবৃন্দ! যাঁহার এক নিমেষের করুণা ধারণা করা যায় না তিনি যে বৎসরের পর বৎসর কত বৎসর ধরিয়া আমাদের প্রতি অজস্র করুণা বর্ষণ করিতেছেন তাহার কি ইয়ত্তা করা যায়? সে করুণার কি আমরা কিছুই প্রতিক্রিয়া করিব না? ঈশ্বর আমাদিগকে কি জন্য এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, যদি আমরা তাহা বুঝিয়া দেখি ও তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য যত্নশীল হই, তাহা হইলে সেই করুণার কথঞ্চিৎ প্রতিদান হইতে পারে। দিনের পর দিন বৃথা চলিয়া যাইতেছে, জীবনের মুহূর্ত্ত সকল যদি শুভকার্য্যে পরিণত করিতে না পারি তবে দীর্ঘ জীবনেই বা কি ফল?

"কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ॥"

ভাগবত ২।১২।

প্রমত্ত ব্যক্তির বহুতর বৎসর অলক্ষিত রূপে গত হয়। মুহূর্ত্ত কালের জন্যও যদি এরূপ বোধ হয় যে জীবন বৃথা যাইতেছে ও জীবনের প্রকৃত কার্য্য করা উচিত, সেই মুহূর্ত্তকালই প্রকৃত জীবন যে হেতু তৎসময়ে শ্রেয়োলাভের জন্য যত্ন হয়।

হে পরমাত্মন্! তোমার বিমল প্রসন্ন মুখ এখন যেমন হৃদয়ধামে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে অসীম আনন্দে আপ্লুত করিতেছে, সেইরূপ যেন এই নববর্ষের প্রত্যেক মঙ্গল মুহূর্ত্তে সুপ্রকাশিত থাকে। তোমার প্রেমপ্রসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে যেন তোমার কার্য্য তোমার জগতে সাধন করিতে পারি। পাপ তাপ দুঃখ শোকের মধ্যে তোমারই প্রেমানন যেন আমাদিগকে রক্ষা করে এবং সুখ সম্পদের হিল্লোলে তোমারই মধুর মূর্ত্তি যেন আমাদিগকে সংসারাসক্ত না করে। তুমি আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ কর নাই— আমরাও যেন তোমাকে কখনও পরিত্যাগ না করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

শাক্যকুল।

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমেন্দ্র কল্পলতা নামক গ্রন্থে শাক্য কুলের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে কপিলবাস্তু নগরে ন্যগ্রোধ আরামে ভগবান্ বুদ্ধদেব সশিষ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শাক্যগণ তথায় উপস্থিত হইয়া শাক্য বংশের পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বুদ্ধদেব শাক্যদিগের উৎসুকতা দর্শনে প্রীত হইয়া মৌদ্গল্যায়ণ নামা শিষ্যকে শাক্যকুলের বিবরণ শ্রবণ করাইবার আদেশ করিলেন। বুদ্ধের কৃপায় মৌদ্গল্যায়ণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া অতীত ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন ও সকল কথা তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল। তিনি সেই প্রাচীন বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবী জলাকার ছিল। বায়ুর বিতাড়নে ক্রমে অসীম সমুদ্র দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইল। দুগ্ধ ঘনীভূত হইয়া পুষ্ট হইলে মৃত্তিকা, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শের উৎপত্তি হইল। পুণ্যভোগ শেষ হওয়াতে দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভাস্বর দেহ এবং সাত্বিক প্রকৃতি ছিল। কিন্তু প্রলোভন হেতু অঙ্গুলি দ্বারা বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করায় তাঁহাদের দেহ হইতে ভাস্বরতা অপগত হইল এবং তাঁহারা মনুষ্যের স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হইলেন।*

ক্রমে পৃথিবীর উৎপাদন শক্তি সঞ্চারিত হইলে ইহা বৃক্ষ ফল পুষ্পাদি দ্বারা পরিশোভিত হইল এবং তাহা মনুষ্যের ভোগ্য হইয়া উঠিল। অনন্তর অন্যান্য জীবমণ্ডলীর সৃষ্টি হইল। মনুষ্যেরা বংশবৃদ্ধির সহিত স্বাধিকার লইয়া সর্ব্বদা পরস্পর বিবাদ কলহ উপস্থিত হওয়াতে আপনাদের মধ্যে একজনকে শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করিল। ইনিই ক্ষত্রিয়প্রধান মহাসম্মত নামে খ্যাত ছিলেন। পারিজাত পুষ্প যেমন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ মহাসম্মতের কুল হইতে উপসদ নামে এক প্রভূতপরাক্রমশালী নৃপতি জন্ম লাভ করেন। তাঁহার আধিপত্য বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাঁহার কীর্ত্তিকুসুম কখন ম্লান হয় নাই। ঐকুলে কৃকি নামে নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। কৃকির কুল হইতেই ইক্ষ্বাকুর জন্ম হইয়াছিল। ইক্ষ্বাকুর কুল হইতে বিরুধক বা বিদেহক উৎপন্ন হন। তিনি কনিষ্ঠা ভার্য্যার অনুরোধে জ্যেষ্ঠ সন্তানগণকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। রাজকুমারগণ পিতৃরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় কপিল মুনির আশ্রম সন্নিহিত স্থানে এক রাজপাঠ স্থাপনা করেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় যুবাদের যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্যে ঋষির তপস্যার বিঘ্ন হইতে লাগিল। তিনি ভিন্ন স্থানে গমনের মানস করিলে রাজকুমারগণ তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, আপনি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন আমরা সেই স্থানে গিয়া বাস করি। ঋষি তাহাই করিলেন। পরে সেই আশ্রমসন্নিহিত রাজপুরী কপিলবাস্তু নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ছিল।

কিছু দিন পরে রাজা বিরুধক অপত্য বিরহে ব্যথিত হইয়া অমাত্যগণকে কহিলেন, পুত্রগণ কোথায়, কি অবস্থায় আছে,

* উপরোক্ত বৌদ্ধ কিম্বদন্তী এবং বাইবেলের মনুষ্যের প্রলোভন জন্য নিষ্পাপ অবস্থা হইতে পতিত হইবার এইরূপ জনশ্রুতির কি প্রভেদ বিজ্ঞ লোকেরা তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন।

তাহারা কি জীবিত? যদি থাকে রাজ্যে তাহাদিগকে শীঘ্র প্রত্যানয়ন কর। অমাত্যগণ বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মহারাজ! হিমালয়ের সন্নিহিত কপিল মুনির আশ্রমের নিকট শাকোট বনে কুমারগণ প্রভূত ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন এক রাজপাঠ স্থাপন করত সেই স্থানে আধিপত্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যানয়ন করা অশক্য হইবে। রাজা কুমারগণকে প্রত্যানয়ন করা শক্য অথবা অশক্য এইরূপ বারংবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতেই শাক্যনামের উৎপত্তি হয়†। এই বংশে নৃপুর নামে এক রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, শাক্য রাজত্ব তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। পরে ২৫০০০ সহস্র পুরুষের রাজত্বের পর উক্ত বংশে দশরথ নামে রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশে সিংহহনু জন্ম গ্রহণ করেন। সিংহ যেমন হস্তিযূথ দেখিয়া ভীত হয় না, তিনি সেইরূপ অপর রাজন্য সমীপে ভীত ছিলেন না।

সিংহহনুর চারি পুত্র, শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন এবং অমিতোদন। কন্যাও চারিটী। শুদ্ধা, শুক্লা, দ্রোণা ও অমিতা। শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধদেব এবং নন্দ। শুক্লোদনের দুই পুত্র তিষ্য ও ভদ্রিক। দ্রোণোদনের দুই পুত্র অনিরুদ্ধ এবং মহান। অমিতোদনের আনন্দ ও দেবদত্ত নামে দুই পুত্র ছিলেন। শুদ্ধার পুত্রের নাম সুপ্রবুদ্ধ এবং শুক্লার পুত্রের নাম মলিক। দ্রোণার পুত্রের নাম ভদ্রানি। অমিতার পুত্রের নাম বৈশাল্য। বুদ্ধের পুত্রের নাম রাহুল। মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে সুজাত নামে ইক্ষ্বাকু বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। পুত্রগণের নাম তপুর, নিপুর, করকন্তক, উল্কামুখ ও হস্তিকশীর্ষ। কন্যাগণের নাম শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা, ও জলি। আর তাঁহার জেন্তী নাম্নী সখীর গর্ভে জেন্ত নামে আর এক পুত্র জন্মিয়াছিল। রাজা সুজাত সিংহাসনে তাহাকে স্থাপন করিবার জন্য স্বীয় স্ত্রীর গর্ব্ভজাত পুত্রদিগকে নির্ব্বাসিত করেন এবং তাঁহারা শাকোট বনে কপিলবাস্তু নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে ক্ষেমেন্দ্রের কল্পলতা-বর্ণিত বিরুধকের পরিবর্ত্তে সুজাত নাম উক্ত হইয়াছে কিন্তু ইহা ব্যতীত ঐতিহাসিক ঘটনায় উভয় গ্রন্থে কোন বৈষম্য নাই।

তিব্বতের কাহ থৈয়ুর (অনুবাদ) গ্রন্থে শাক্য বিবরণ ও শাক্য বংশাবলীর নামোল্লেখ আছে। বিজ্ঞবর সোমা ডি কোরো উপরোক্ত গ্রন্থ হইতে শাক্য বংশের বিবরণ অনুবাদ করেন। তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে মহাসম্মতের বংশাবলী অগণনীয়। মহাসম্মত হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূপতির নাম এ স্থানে উল্লেখ করা অসম্ভব। কর্ণের রাজধানী পোতল বা পাতাল। কেহ কেহ অনুমান করেন সিন্ধুনদের মোহানার নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান টাট্টা নামক স্থানে কর্ণের রাজধানী ছিল। কর্ণের গোতম এবং ভরদ্বাজ নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিলেন। গোতম সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মচিন্তায় রত ছিলেন। তাঁহার উপর বেশ্যাহত্যার মিথ্যা অভিযোগ প্রদান করত শূলে তাঁহার প্রাণ সংহার করা হয়। এইরূপে ভরদ্বাজ নির্ব্বিঘ্নে পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। কিন্তু ভরদ্বাজের পুত্রাদি না থাকাতে গোতমের দুই পুত্র পোতলে রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে

† সোমা ডি কাহ কোরো কাহ থৈয়ুর গ্রন্থ প্রমাণে শাক্য শব্দের স্বতন্ত্র ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।
ফাহিয়ান্ ২০৫ পৃষ্ঠা।

কনিষ্ঠ ইক্ষ্বাকু নামে খ্যাত ছিলেন। ইক্ষ্বাকুর পর তাঁহার পুত্র রাজত্ব করেন। ইক্ষ্বাকুর পর প্রায় এক শত ভূপতি রাজত্ব করিলে ইক্ষ্বাকু বিরুধক বা বিদেহক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। ক্ষেমেন্দ্রের কল্পলতা বর্ণিত বিরুধক ভূপতির নাম তিব্বতীয় কাহ থৈয়ুর নামক গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে। ক্ষেমেন্দ্রের বর্ণিত ইক্ষ্বাকুর চারিপুত্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের ঐক্য হইতেছে। মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে রাজার পাঁচটী পুত্রের কথা উল্লেখ আছে। তিব্বতীয় গ্রন্থের প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় অন্যূন ৫৫০০০ সহস্র ভূপতি কপিল বাস্তুর সিংহাসনে রাজত্ব করেন। লঙ্কার প্রসিদ্ধ মহাবংশ নামক পালি গ্রন্থ লাটিন ভাষায় বর্নুফ সাহেব অনুবাদ করেন, টর্ণার সাহেব উহা ইংরাজিতে ভাষান্তরিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ৮২০০০ সহস্র শাক্য নৃপতিগণের বংশাবলীর কথা উল্লেখ আছে। দীপ বংশ নামে আর একখানি পালি গ্রন্থেও ঐরূপ উল্লেখ আছে। যথা মহা সম্মতের পুত্র রজ, রজের পুত্র বড় রজ। তাহার পুত্র কল্যাণ, কল্যাণের পুত্র বড় কল্যাণ, তাহার পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র বড় মান্ধাতা। তাহার পুত্র উপসত্ত, উপসত্তের পুত্র কর, করের পুত্র উপকর। তাহার পুত্র মহাদেব। ইত্যাদি।

Seydel cites from Weber a portion of the long geneology of king Suddhodana, which has a considerable analogy with the christan lists of Josephs ancestors Lillie. P. 10.

এ প্রকার বংশাবলীর নামোল্লেখ দর্শনে বিদেশীর বিস্ময়ের বিশেষ কারণ নাই, যেহেতু অতি প্রাচীন কালেও ঐরূপ বংশাবলীর নাম উল্লেখের এদেশে রীতি ছিল। রামচন্দ্রের বিবাহসভা মধ্যে ক্ষত্রিয়দিগের প্রথা অনুসারে বশিষ্ঠদেব সূর্য্যবংশীয় রাজাদের যেরূপ নামোল্লেখ করিয়াছিলেন, মহর্ষি বাল্মীকি তাহা রামায়ণে বিবৃত করিয়াছেন। ইহা ইহুদীয় প্রথা নহে.।

ক্ষেমেন্দ্রের কল্পলতার বর্ণনার সহিত মহাবংশের লিপির একতা নাই। কল্পলতাতে উক্ত আছে যে সিংহহনুর চারি পুত্র। মহাবংশে তাহা বলে না। উহাতে যাহা উল্লেখ আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মহারাজ জয়সেনের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র সিহ হনু (সিংহ হনু) কপিল বাস্তুর রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। জয়সেনের যশোধারা নামে এক কন্যা ছিলেন। শাক্য বংশে দেবদহ নামে অন্য এক নৃপতি ছিলেন, তাঁহার অঞ্জন নামে এক পুত্র এবং কছন বা কাঞ্চন নামে এক কন্যা ছিলেন। দেবদহ নৃপতি মহারাজ সিহহনুর সহিত স্বীয় দুহিতা কাঞ্চনের বিবাহ দিয়াছিলেন। এবং কপিল বাস্তুর অধিপতি মহারাজ জয়সেন দেবদহ পুত্র অঞ্জনের সহিত স্বীয় দুহিতা যশোধরার বিবাহ দেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধে উভয়ের এইরূপ আদান প্রদান হইয়াছিল। রাজা অঞ্জনের মায়া এবং প্রজাবতী নামে দুইটী কন্যা, এবং দণ্ডপানি ও সুপ্রবুদ্ধ নামে দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিল। কাঞ্চনের গর্ভে সিংহহনুর ঔরসে শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন, ঘটিতোদন, অমিতোদন নামে পাঁচ পুত্র এবং অমৃতা ও মিতা নামে দুই কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সুপ্রবুদ্ধ অমৃতার পাণি গ্রহণ করেন। শুভদকচ্ছল এবং দেবদত্ত নামে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মে। শুদ্ধোদন মায়া এবং প্রজাবতীর

পাণি গ্রহণ করেন। মায়ার গর্ভে বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল।

বৌদ্ধদিগের উপরোক্ত লিপি দ্বারা স্পষ্ট অবগত হওয়া যাইতে পারে যে, অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় আদি রাজা ইক্ষ্বাকুর কুলে বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে শাক্যকুলের কোনও উল্লেখ নাই এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া কেহ কেহ বুদ্ধের পূর্ব্ব পুরুষ শাক্যগণকে কোন এক অধম জাতি স্থির করেন। ইহার কিন্তু বিশেষ প্রমাণ নাই।

সিকাগো ধর্ম্মমেলা।

চারিশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, মহাত্মা কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আমেরিকা বিশেষতঃ যুক্ত রাজ্য যেরূপ দ্রুতগতিতে সভ্যতা-শিখরে আরোহণ করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই মহাদেশের সিকাগো নগরীতে যে প্রদর্শনী গত কয়েক মাস ধরিয়া উন্মুক্ত হইয়াছিল, তাহা তদ্দেশের ধন ঐশ্বর্য্যের শিল্প চাতুর্য্যের এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির কিঞ্চিৎ পরিচয় মাত্র। সমস্ত পৃথিবী হইতে অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত ও মূল্যবান পদার্থ সকল এতই বহুল পরিমাণে সংগ্রহীত হইয়াছিল, দেশ বিদেশস্থ যাত্রীগণের পরিমাণ এতই অধিক হইয়াছিল, যে এই মহামেলা জগতের ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল স্থান অধিকার করিবে এবং এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া চিরকালই পরিকীর্ত্তিত হইবে।

নানাবিধ দ্রষ্টব্য দ্রব্যসমূহের সমাগম বশতঃ অথবা জনতার আধিক্য নিবন্ধন যে মেলার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু যেমন এরূপ প্রদর্শনী হইতে শিল্প বাণিজ্যের নবতর অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যে এক মহাপ্লাবনের বীজ অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। জগতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পরের ধর্ম্মমত আলোচনা করিবার জন্য এই মহাযজ্ঞে আহূত হইয়াছিলেন। চীন, জাপান, ব্রহ্ম, ভারতবর্ষ, সিংহল, পারস্য প্রভৃতি দূর দূরান্তর হইতে এবং ইউরোপের যাবতীয় প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ সমাগত হইয়া স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মমত কীর্ত্তনে কালব্যাপী এই মহাযজ্ঞের উপসংহার করেন।

এমন এক সময় চলিয়া গিয়াছে, যখন রোমান ক্যাথলিকগণ প্রোটেষ্টাণ্টদিগের বিরুদ্ধে বিবাদবহ্নি সন্ধুক্ষিত করিয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের নামে নরহত্যা করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। মুসলমানগণ নিজ ধর্ম্মগুরুর আদেশে নিষ্কোশিত তরবারির আঘাতে কাফেরের পাপমুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। নিরামিষাশী বৈষ্ণবগণ শাক্ত বা গাণপত্যের রুধির প্রবাহে হস্ত কলঙ্কিত করিতে ভীত হয় নাই। কিন্তু সিকাগো মহামেলা যে দৃশ্য দেখাইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অভাবনীয় ও অচিন্তনীয়। সেখানে বিভিন্ন ধর্ম্মযাজকগণ ভ্রাতৃসৌহার্দ্দে মিলিত হইয়া শান্তভাবে পরস্পরের ধর্ম্মমত শ্রবণ করিয়াছেন, উদারভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। প্রায় ছয় সহস্র লোক একত্রে সমাসীন হইয়া, উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস ধরিয়া, ঈশার প্রেম, বুদ্ধের বৈরাগ্য, হিন্দুর গভীর অধ্যাত্মজ্ঞান, মহম্মদের বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া এককালে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন।

ধরাপৃষ্ঠে চিকিৎসা শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা যে অসম্ভাবিত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে উহাতে জাতি সাধারণের সমান অধিকার। সম্প্রদায়ের গণ্ডী আসিয়া এই সকল বিদ্যা আলোচনার অন্তরায় উপস্থিত করে না। ইহারই জন্য সুসভ্য ইউরোপে জ্ঞান বিজ্ঞান যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, ধর্ম্মবিজ্ঞান অধ্যাত্মতত্ত্ব তাহার শতাংশ উন্নতি লাভ করিয়াছে কি না সন্দেহ। দুই চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে ধর্ম্ম ঈশ্বর পরকাল ও আত্মা লইয়া জন সাধারণের যেরূপ বিশ্বাস ছিল, বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নত অবস্থার সময়ে তাহা হইতে অধিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে কি না, বলা বড়ই সুকঠিন। কিন্তু পূর্ণ এক শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কি এক ভয়ানক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বাষ্পীয় শকট, বাষ্পপোত, তাড়িত বার্ত্তাবহ, বস্ত্রের কল প্রভৃতি নানা বিধ যন্ত্রের প্রচলন হওয়ায়, পৃথিবীর মুখশ্রী কত না উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু বাইবেলবিশ্বাসী ইউরোপীয়গণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত একইরূপ রহিয়াছে, কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে এই মাত্র। অসাম্প্রদায়িক ভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোচনা হয় বলিয়া এক দেশে হয়ত টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কার হইল, আর একদেশে তাড়িতালোকের সৃষ্টি হইল, অন্য দেশে তাড়িত সাহায্যে রেলওয়ে শকট পরিচালনার কৌশল বাহির হইয়া পড়িল। কেহ বা তাড়িতের সাহায্যে রোগ আবিষ্কারের উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন, কেহবা বজ্রাঘাতের হস্ত হইতে গৃহ অট্টালিকা রক্ষা করিবার উপায় স্থির করিলেন। এক তাড়িত লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বিবিধ তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িল। অথচ ভিন্ন দেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অভিমানশূন্য হইয়া সেই সকল তত্ত্ব পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া নিজ নিজ দেশের উপকার সাধন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যখন আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাই, আমাদের অভিমান ফিরিয়া আইসে। কোথায় ধর্ম্মের নামে অভিমান চলিয়া যাইবে, তাহা না হইয়া যে অভিমান বিজ্ঞান আলোচনার সময় চলিয়া যায়, তাহা ধর্ম্মালোচনার সময় জাগিয়া উঠে। যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়-নিশান প্রথম উড্ডীন হইল, তখন খৃষ্টীয় পাদ্‌রী ও পৌত্তলিক সম্প্রদায় হইতে কি ভয়ানক আক্রমণ না তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। সদ্ভাবে ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দেওয়া এক পদার্থ, আর নিষ্ঠুর ভাবে অকারণ নিগ্রহ করা আর এক পদার্থ। ধর্ম্মসমাজে কোন নূতন মত বা কোন নূতন সত্য প্রচার করিতে গেলেই উৎপীড়নের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া প্রায় কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। বাইবেল প্রচার কার্য্যালয় হইতে যে রাশি রাশি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণীত হইয়া সাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়, তাহাতে শ্লেষ ভিন্ন আর কিছুই নাই যাঁহারা এইরূপ উপায়ে আপনাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত হৃদয়ে বেদনা দিয়া কুসংস্কার মোচনের যুক্তি বড়ই অকিঞ্চিৎকর। খৃষ্টান মিসনরিগণ যে নিরবচ্ছিন্ন এই দোষে দোষী এমন নহে, আমরাও অনেকগুলি বিষয়ে অকারণ পৌত্তলিক ভ্রাতাদিগকে মর্ম্মপীড়া দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পথ সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি এবং এখনও ফেলিতেছি।

সেই জন্যই বলিতে ছিলাম ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারতা চাই। তুমি যবন কোরাণ তোমার ধর্ম্ম, আমি হিন্দু বেদ আমার ধর্ম্ম, তুমি খৃষ্টান, বাইবেল তোমার ধর্ম্ম, তাহাতে ক্ষতি কি। ঈশ্বর ত এক। তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিরভিমানে অপরের ধর্ম্মমত শ্রবণের বা ধীরভাবে আন্দোলনের আপত্তি কি। এরূপ অসাম্প্রদায়িক্ আলোচনায় হৃদয়ে শান্তির আবির্ভাব হয়, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নিগূঢ় সত্য সকল বাহির হইয়া পড়ে। সাধনার পথ অনাবৃত হইয়া যায়, নিজ নিজ ধর্ম্মের ত্রুটি তিরোহিত হয়। সকল মত সত্যের নিকষে পরীক্ষিত হইয়া জীবনের উপসেব্য হইয়া উঠে।

এই যে ব্রহ্মের সেবক উপাসক বলিয়া আমাদের এত গৌরব, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল। উপনিষদে নিহিত অত্যুজ্জ্বল সত্যের গাত্রে যে ভস্মস্তূপ জন্মিয়াছিল, কিরূপে তাহা বিধৌত হইয়া গেল। রামমোহন রায়ের বুদ্ধিকে কে এত তেজস্বিনী করিয়া দিল। প্রকৃত কথা বলিতে গেলেই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে বিভিন্ন দেশীয় ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা তাহার প্রকৃত কারণ। তেত্রিশ কোটি দেবতা লইয়া মহা আড়ম্বরে গৃহে গৃহে পূজা চলিতেছিল, অসংখ্য প্রতিমার অসংখ্য রূপের সম্মুখে ছাগ-মহিষের রক্তস্রোত বহিতেছিল, কিন্তু রামমোহন দেখিলেন, কোরাণে এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা, বাইবেলে এক দেবতার অর্চ্চনা, উপনিষদের পত্রে সেই এক দেবের আরাধনা। কুসংস্কারের রজ্জুতে যুক্তি তর্কের হস্তপদ এতকাল আবদ্ধ ছিল, সে বন্ধন ত্রুটিত হইয়া গেল। রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। যদি এ দেশ অন্য ধর্ম্মের সংঘর্ষে না আসিত, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতে হয়ত শতবর্ষের অধিক কাল বিলম্ব ঘটিত। এই যে সুসভ্য ইউরোপে বাইবেল শাস্ত্রের পূর্ব্ব মর্য্যাদার খর্ব্ব হইতেছে, জ্ঞানোন্নতি তাহার বলবৎ কারণ হইলেও তদ্দেশে ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা তাঁহার অন্যতম কারণ। এই যে বর্ত্তমানে হিন্দুশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আধিক্য দেখা যাইতেছে, ইহারও কালবিলম্ব হইত যদি প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের সংঘর্ষে না আসিত। সাধারণে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবেই শাস্ত্রাপেক্ষা যুক্তিরই অধিক পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি বিধানই ঈশ্বরের সৃষ্টির সুমহান লক্ষ্য। কেহ বা অলক্ষিত ভাবে, কেহবা ইচ্ছার সহিত ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্য্য করিতেছে। ঈশ্বর কিরূপে কাহার দ্বারা তাঁহার লক্ষ্য যে সিদ্ধ করিবেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা যতদূর দেখিতেছি, তাহা হইতে নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কালে সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে, বিবাদ বিসম্বাদ জগত হইতে এককালে তিরোহিত হইবে, চারিদিকে শান্তির রাজ্য বিরাজ করিতে থাকিবে। বলিতে কি সিকাগোর মহামেলার অধিবেশনে আমরা অনেক দূর আশ্বস্ত হইয়াছি।

যে মহাপুরুষের অদম্য ও উৎসাহবলে এই ধর্ম্মমেলার সৃষ্টি তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব। মহাত্মা জন হেনেরি ব্যারো এই সার্ব্বভৌম মহাধর্ম্মমণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সিকাগো নগরের একটি প্রধান ধর্ম্মশালার যাজক,

এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠতম বক্তা। ইনি ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ১১ই জুলাই তারিখে মেডিনা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অধ্যাপনের কার্য্য করিতেন, মাতাও বিদ্যায় একজন উপাধিধারী। ১৮৬৭ সালে জন ব্যারো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হন। কিয়ৎদিবস ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠান্তে কান্সা প্রচারকার্য্যালয়ে আড়াই বৎসর সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইনি ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। আমেরিকায় ফিরিয়া আসিবার পরে ইহাঁর বাগ্মিতার খ্যাতি প্রতিপত্তি দিগ্‌দিগন্তে বাহির হইয়া পড়ে। এবং ইনি ১৮৮১ সিকাগো ধর্ম্মশালায় যোগ দেন। ইহাঁর অসাধারণ বক্তৃতা শক্তি সহস্র সহস্র শ্রোতার হৃদয়ে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। ইহাঁর ভাষা যেমনি ওজস্বী কণ্ঠস্বর তেমনি গম্ভীর, আকৃতি তেমনি মহান। তাঁহার অনেকগুলি প্রসিদ্ধ বক্তৃতা পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত অন্যান্য পুস্তকেরও অসদ্ভাব নাই। এ সমুদয়ই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয়। এবং সকলগুলিই আদরের সহিত ইউরোপীয় জনসমাজে গৃহীত হইয়া থাকে। সিকাগো মহাধর্ম্মমেলা ইহাঁর বিরাট হৃদয়ের অসাধারণ উদারতার পরিচয়। এই সাধু উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তিনি যে ইহার জন্য সমগ্র পৃথিবীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এমন নহে, তিনি ধর্ম্মসমন্বয়ের যে অক্ষয় বীজ নিহিত করিয়া গেলেন, তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে গেলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। ঈশ্বরের অক্ষয় ন্যায় স্মরণ করিয়া আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, যে এ কল্পনা তিনি একদিন সত্যে পরিণত করিবেন। এবং সে দিনেরও নিতান্ত বিলম্ব নাই।

তিব্বতের বিবাহ-প্রথা।

তিব্বতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিবাহপ্রথার কিছু কিছু স্থানগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও যাহা সর্ব্বসাধারণ তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। বাল্যবিবাহ এদেশে আদৌ নাই। কন্যা ঋতুমতী হইলে পিতামাতা তাহার বিবাহের জন্য উদ্‌যোগী হন। সচরাচর রজোযোগের দুই তিন বৎসর পরে বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়। আমাদিগের দেশে শুভ মাসে শুভ দিনে শুভক্ষণে পাত্র পাত্রীর জন্মতিথি, নক্ষত্র, রাশি ও গণ দেখিয়া হিন্দু সাধারণে বিবাহ দিয়া থাকেন, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান তিব্বতে তদপেক্ষা আরও কিছু অধিক। তথায় পিতা মাতার জন্ম-বর্ষ ধরিয়া গণনা পূর্ব্বক পুত্র বা কন্যার বিবাহের ঔচিত্যানৌচিত্য জ্যোতিষিগণ বিচার করেন। এই গণনা কার্য্যের নিমিত্ত ২।৩ জন জ্যোতিষী নিযুক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে পাত্র বা কন্যা পক্ষীয়গণ তণ্ডুল, যবচূর্ণ ও সুরা তাঁহাদিগকে উপহার দেন। পরে দেবতাদিগের উদ্দেশে সুরাপূর্ণ একটি পাত্র রাখিয়া ও একটী ক্ষুদ্র পঞ্চবর্ণের রেশমী পতাকা সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া চৌকির উপর পঞ্জিকা খুলিয়া গণক গণনা করিতে বসেন। তিনি বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাদি দেব দেবী মুনি ঋষি ও ভারত ও চীন দেশীয় পণ্ডিতগণের নাম উচ্চারণ করিয়া কতকগুলি পাশার ন্যায় সাদা ও কাল রঙ্গের ঘুঁটি লইয়া পাত্র ও পাত্রীর ভাগ্যের শুভাশুভ গণনা করেন। যদি সমস্ত ভাল হয় তাহা হইলে এক নির্দ্দিষ্ট

দিবসে বিবাহ হইয়া থাকে। অন্যান্য দেশে পিতা মাতাই বিবাহের প্রধান অধ্যক্ষ। ইহাঁদিগের মতামতেই বিবাহ হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে; কিন্তু তিব্বতে কন্যার মাতুলই প্রধান অধ্যক্ষ। পিতামাতা বা অন্য কাহারও মতের তত গুরুত্ব নাই। শুক্ল পক্ষীয় কোনও এক নির্দিষ্ট শুভ দিনে মাতুলের মত লইয়া 'বর-মি' * অর্থাৎ ঘটক মদিরা পট্টবস্ত্র ও রৌপ্য মুদ্রা উপঢৌকন দিয়া কন্যার পিতামাতার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। কিন্তু এই রূপ কথা উত্থাপন করা কেবল চিরপ্রচলিত প্রথা আছে বলিয়াই করিতে হয়। তিব্বতীয়েরা যাত্রাকালে শুভাশুভ লক্ষণের দিকে দৃষ্টি রাখে, শূন্য পাত্র বা কোন অশুভ বস্তু দেখিলে কেহ গমন করে না। তিব্বতীয়দিগের বর শ্বশুরগৃহে বিবাহ করিতে যায় না। বরযাত্রিগণ কন্যাকে আনিবার জন্য তাহার পিত্রালয়ে গমন করেন। তথায় তিন চারি দিন ধরিয়া বিবাহ উৎসব অবস্থানুসারে সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সময় আত্মীয়বর্গের যাহা কিছু দিবার থাকে কন্যাকে তৎসমস্ত তাঁহারা উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। একজন তান্ত্রিক পুরোহিত ধূপ ধুনাদি জ্বালাইয়া প্রেতাদির তুষ্টির নিমিত্ত নানারূপ প্রক্রিয়া করিলে বন্‌ধর্ম্মাবলম্বী † কোনও যাজক দেবতাগণের প্রসাদার্থে মন্ত্র পাঠ করেন। তদনন্তর সালঙ্কৃতা কন্যাকে একটি চৌকিতে বসাইয়া বরপক্ষীয়গণ তাহার শ্বশুরালয়ে লইয়া যান। প্রেতাদির মন্দদৃষ্টি হইতে রক্ষার্থে কন্যার হাতে কবচ থাকে। তাহার অগ্রে অগ্রে একজন লোক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতে থাকেন। বরের গৃহে কন্যা পৌছিলে একজন তান্ত্রিক পুরোহিত আসিয়া নিম্নলিখিত ভাবে আশীর্ব্বাদ করেন;—হে অনাদি অনন্ত স্বয়ম্ভু ধর্ম্ম! প্রাণিমাত্রে সুখ সম্ভোগ করুক। স্বর্ণ রৌপ্য ও মহামূল্য দ্রব্যজাতে এই দ্বার বিনির্ম্মিত ও সুশোভিত। ইহা উদ্‌ঘাটন করিয়া সকলে পঞ্চরত্ন ভাণ্ডার দেখ। এমত বাটীতে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারাই সুখী। কোনও রূপ জ্বালা যন্ত্রণা না পাইয়া নিরাপদে তাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করুন। সকলের মঙ্গল হউক এবং অশেষ ধনলাভ করুন। হে সুখী দম্পতি, তোমরা যদি পরিবারবর্গ মধ্যস্থিত হইতে চাও, তাহা হইলে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘকে সর্ব্বাগ্রে পূজা করিও। তাহার পর দরিদ্র ও পতিত নরনারীগণের প্রতি উদার দৃষ্টিতে দেখিও। তৃতীয়তঃ যাবতীয় প্রাণিগণের প্রতি তোমাদিগের যেন অসীম দয়া থাকে। আমরা জাতিবৃদ্ধি ও পঞ্চরত্নাকর প্রকাশ করিবার জন্য রত্নগর্ত্তা পিতৃ (জন্ম) ভূমি হইতে আসিয়া থাকি। আমাদিগের কার্য্য মহৎ, উদ্দেশ্য মহৎ, অতএব দ্বার রুদ্ধ করিও না। খুলিয়া দেও আমরা প্রবেশ করি।

পরে বরের মাতা সুসজ্জিতা হইয়া দক্ষিণ হস্তে মাঙ্গল্য দ্রব্য (যবচূর্ণ ও মাখন) ও বাম হস্তে দুগ্ধপরিপূর্ণ এক পাত্র লইয়া কন্যাকে বরণ করিতে আইসেন। তিনি কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বিবাহের বেদীর সম্মুখে লইয়া গিয়া বরের বামপার্শ্বে বসাইয়া দেন। ইহার পর বরের হাতে কতকগুলি পশম অর্পিত হয়। কন্যা তাহার হাত হইতে সেগুলি লইয়া সূতা প্রস্তুত করে। ইহাকেই উদ্বাহবন্ধন বলে। এইরূপে নৃত্যগীত ভোজন পানাদি দ্বারা বিবাহ-উৎসব কার্য্য শেষ হয়। বিবাহের পূর্ব্বে

* সিকিমে এই নাম। তিব্বতে 'লংমি' বলে।

† বন্ তথাকার প্রাচীন ধর্ম্ম।

তিব্বতে বাদ্যাদি হয় না। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কন্যা ধরিয়া আনিয়া বা কন্যা পাত্রের সহিত পলাইয়া বিবাহ করিয়া থাকে, কিন্তু এই প্রকার বিবাহ বন্ধন ইচ্ছামত বিচ্ছিন্নও হইতে পারে।

আমাদিগের দেশে সাধারণের বিশ্বাস যে তিব্বতে স্ত্রীগণেরাই বহু স্বামী গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাকার কোনও কোনও অঞ্চলে এই রীতি একেবারে প্রচলিত নাই।

বেদোক্ত বিবাহ বিধান।

গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টি র্যথা সঃ। ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বা দুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। ১

ইহৈবস্তং মাবিযৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্। ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভি র্মোদমানৌ স্বে গৃহে। ২ ঋগ্বেদ।

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।

হে স্ত্রী, আমি সৌভাগ্য অর্থাৎ গৃহাশ্রমের সুখের জন্য তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি। আর এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে কার্য্য তোমার অপ্রিয় আমি তাহা কদাচ করিব না। এবং তুমিও যে কার্য্য আমার অপ্রিয় তাহা কখন করিবে না। এইরূপে তুমি আমার সহিত বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং আমিও এইরূপে তোমার সহিত বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইব। আমরা উভয়ে ব্যভিচারাদি দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সুখে স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিব। যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, যিনি জীবের পাপ পুণ্যের যথাবৎ ফলদাতা, যিনি জগতের স্রষ্টা ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিধাতা আর যিনি পুরন্ধি অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন সেই পরমেশ্বর আমাকে গৃহকার্য্যের নিমিত্ত তোমায় অর্পণ করিলেন। এই সমস্ত দেব অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তিরাই এই বিষয়ে সাক্ষী রহিলেন। অতঃপর আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতি করিব, উদ্যমশীল হইয়া যত্নসহকারে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিব, মিথ্যাচার হইতে বিরত থাকিয়া ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট রহিব, সমস্ত জগতের উপকারার্থ সত্য জ্ঞান প্রচার করিব এবং ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া তাহাকে সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত করিব। আমরা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমরা এই সমস্ত নিয়ম যথার্থত রক্ষা করিব। মনেও দ্বিতীয় স্ত্রী বা দ্বিতীয় পুরুষ আনিব না।

দ্বিতীয় ঋক মন্ত্র বিবাহিত স্ত্রীপুরুষকে ঈশ্বরের আজ্ঞা উদ্বোধিত করিতেছে।

তোমরা উভয়ে ইহলোকে গৃহাশ্রমে সর্ব্বদা সুখে বসবাস করিবে। কখনও বিরোধ বা দেশান্তর গমন দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবে না। কদাচ ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে না। সন্তানোৎপাদন, তাহার প্রতিপালন, সুশিক্ষা বিধান এবং তাহার গর্ভাবস্থানকালে বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া শত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবনসুখ ভোগ কর। আপনার গৃহে আনন্দে থাকিয়া পুত্র পৌত্রাদির সহিত ধর্ম্মাচরণ করত সুখে কাল যাপন কর। কদাচ ইহার বিপরীত ব্যবহার করিও না এবং আমার এই আদেশ সর্ব্বদা স্মৃতিপথে রাখিও।

এই ঋক মন্ত্রে স্ত্রী পুরুষে এক বচনের প্রয়োগ আছে। তদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে এক স্ত্রীর একই পতি এবং এক পতির একই স্ত্রী হইবে। অর্থাৎ পুরুষের বহুপত্নী গ্রহণ এবং স্ত্রীর বহুপতি গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

(শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য)

দ্বিতীয় প্রকরণ।

প্রথম ব্যাখ্যান।

(বিগত অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকার ১৫৫ পৃষ্ঠার পর।)

ওহে পাপি! ভুলি তুমি মোহের ছলনে।
যাপিতেছ দিন হায়! ঈশ্বর বিহনে।
দেখ দুরাশার টানে; ভাসিতেছ কোন খানে,
জনম বিফল যায় ভেবে দেখ মনে॥

বিবেক সুমতি হৃদি জাগিয়া তোমার।
"কি কর কি কর!" বলে এক একবার।
প্রবৃত্তির ঝঞ্ঝাবায়, সে বাণী কোথায় যায়,
শুনেও শুননা তাহা শুনিতে ও ভার!

পাপেতে মজিয়া চাহ পাপেতে ডুবিতে।
ঈশ্বরের পানে আর না পার চাহিতে।
ধর্ম্ম কঠোরতা ময়, হেন অনুমান হয়,
তাই ইচ্ছ তাঁরে ছাড়ি সুদূরে থাকিতে॥

কিন্তু মহারণ্য কিবা পর্ব্বত শিখর।
গিরিগুহা নদী কিবা বিজন প্রান্তর।
তিনি নাই বিদ্যমান, হেন কোথা আছে স্থান,
কেমনে থাকিবে বল তাঁ'হতে অন্তর?

কেন ভাব রবে পাপি তাঁহারে ছাড়িয়া?
এস ভাই! তাঁর কাছে পাপেরে ত্যাগিয়া
মহা পাপি তারিবারে, ডাকিছেন বারে বারে,
থাকিবে কি আরো পাপে সে ডাক শুনিয়া?

অবাধ্য সন্তানে পিতা কভু ত্যাগ করে।
চাহে না তাহার পানে—মমতা পাসরে।
কিন্তু যিনি দয়াময়, তাঁর কেহো ত্যাজ্য নয়,
তাঁর কৃপা বর্ষে সম সবার উপরে॥

পাপের পাষাণ চাপে বদ্ধ যার চিত।
সুচিন্তা প্রবেশে যাহে নাহি কদাচিৎ।
পিতা শুভক্ষণ ধরি, সে হৃদয় ভেদ করি,
দেখা দিয়া তাঁর প্রেমে করেন মোহিত॥

কত দুঃখ রোগ তিনি পাপিরে পাঠান।
কতই কৌশল করি তাহারে জাগান।
অমৃত অঞ্জন দিয়া, চক্ষু তার ফুটাইয়া,
ক্রমে ক্রমে তাঁর পথে কিবা লয়ে যান॥

কভু পাপী পাপে হয় এমনি মগন।
হৃদয়-নাথের কভু না শুনে বচন।
হয়ত জীবন ভোর, কাটে না মায়ার ঘোর,
বিষকৃমি হয়ে থাকে হায় কি পতন!

তাহার মরণ কালে পিতা দয়াময়।
হয়ত হৃদয়ে তার হয়েন উদয়।
পাপী তবে পাপ তরে, কেবলি ক্রন্দন করে,
একান্তে তখন চায় শরণ অভয়॥

পাপিরে যে দণ্ড দেন পিতা ইহ—পরে।
সে দণ্ড কেবল পাপি তরাবার তরে।
পাপ তার তেয়াগিয়া পুণ্য বাস পরাইয়া,
অবশেষে ক্রোড়ে করি ল'ন নিজ ঘরে॥

অনন্ত নরকানল করিয়া সৃজন।
তাহে পাপি তিনি নাহি করেন দহন।
দয়ার সাগর যিনি, স্নেহে দণ্ড দেন তিনি,
বজ্রের ভিতরে সুধা করেন প্রেরণ॥

পাপী যদি অনুতাপি করয়ে ক্রন্দন।
পাপ ত্যাগি পুণ্য পথে করে বিচরণ।
সত্য বটে পাপহারী, দিয়া সান্ত্বনার বারি;
পাপ হ'তে মুক্ত তারে করেন তখন॥

কিন্তু শুন তাঁর বাণী শান্ত করি মন।
পাপের কণ্টক হৃদে ক'রো না রোপন,
থেকোনা পাপের লেশে, অনুতাপ তাহে শেষে
হৃদয়ের করিবেক শোণিত শোষণ॥

কর তাঁর নাম গান, চল তাঁর পথে।
প্রলোভনে টলি কভু পড়োনা বিপথে।
সময় ক্ষমতা ধন, তাঁরে কর সমর্পণ।
রহিও না এক পল ছাড়ি তাঁহা হ'তে॥

ক্রমশঃ।

সামাজিক আন্দোলন।

এখন শিক্ষার সহিত বিশুদ্ধ ও উন্নত ধর্ম্মমত এদেশে প্রচার হইতেছে। শিক্ষা ও সুসংস্কৃত ধর্ম্মের প্রভাবে সমাজের আভ্যন্তরীণ আবর্জনা সকল দূর হয় এবং তাহা ক্রমশঃ উন্নত অবস্থায় আরোহণ করিতে থাকে। বর্ত্তমানে এই মহা নগরীর সামাজিক আন্দোলন ইহার প্রমাণস্থল। অনেকেই জানেন বিলাত প্রত্যাগতদিগকে লইয়া এখানে ঘোরতর দলাদলি চলিতেছে। তন্মধ্যে অনেকেই তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিবার পক্ষপাতী এবং অনেকেই বিপক্ষ। প্রতিপক্ষেরা বলেন উঁহাদিগকে সংগ্রহ করিলে ধর্ম্মলোপ ও জাতিলোপ হইবে। যাই হউক এইরূপ মতভেদ লইয়া দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার সংস্পর্শ অনেক পল্লীগ্রামেও পৌছিয়াছে। যাঁহারা সংগ্রহের পক্ষপাতী তাঁহারা অসংগ্রহে সমাজের অন্তর্বল কমিবে এই আশঙ্কা করেন। কারণ আজ কাল উচ্চ শিক্ষা উচ্চ পদ ব্যবসায় বাণিজ্য নানা সূত্রে লোকে বিলাত যাইতেছে। এই স্রোত রোধ করাও কঠিন। কারণ নিজের এবং দেশের সর্ব্বব্যাপী দুরবস্থার সহিত এই সমস্ত স্বার্থের সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং ইহার প্রতিরোধ চেষ্টা নিরর্থক। তাঁহারা আরও দেখিতেছেন ইংরাজ রাজত্বে কেবল ধনের আদর নাই, বিদ্যা ও পদমর্য্যাদারও যথেষ্ট প্রতিপত্তি। এই বিলাত প্রত্যাগতদিগের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ ও রাজদ্বারেও সুপ্রতিপন্ন। এই দলই ক্রমে ক্রমশ প্রবল হইতে চলিল তখন ইহাঁদের অসংগ্রহে সমাজ দুর্বল হইয়া পড়িবে। প্রতিপক্ষ দল কহিতেছেন অগ্রে ধর্ম্ম ও জাতিরক্ষা চাই। কারণ ধর্ম্ম ও জাতিই হিন্দুর প্রাণ। ফলত প্রতিপক্ষীয়েরা দেশকাল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন এবং নিজের মত প্রতিষ্ঠিত রাখিতে বিশেষ যত্নবান। যাই হউক এইরূপ মতভেদ লইয়া এই মহানগরীতে দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে।

যাঁহারা মনে করেন হিন্দুসমাজ অটলপ্রতিষ্ঠ তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত। যাঁহারা অভিনিবিষ্ট চিত্তে ইহার অতীত আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, জনসমাজের শুভাশুভে নির্ভর করিয়া ইহাতে ব্যাপক-কাল-প্রচলিত প্রথার অন্যথা ঘটিয়াছে এবং নূতনের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দু পরিবর্ত্তনে ভীত ছিলেন না বরং জনসমাজের হিতকর বলিয়া পরিবর্ত্তনকে সাদর দৃষ্টিতে দেখিতেন। বর্ত্তমানে এ দেশের অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয়। সেই দুরবস্থা মোচনের জন্য যে কোন পথ উন্মুক্ত হইবে তাহা কণ্টকাবৃত করা বুদ্ধির কার্য্য নহে। অতি পূর্ব্বে অর্থকৃচ্ছের সময় কেহ কোন বাধা মানিত না, যথেচ্ছাচার চলিত, কিন্তু শাস্ত্রকারগণ সকরুণ ভাবে সে গুলি অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। এখন এই দেশব্যাপী অর্থকষ্টে সেই পূর্ব্বপ্রথা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। দেশকালকে উপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই সমাজের অধঃপাত হয়। আর জাতি ও ধর্ম্মলোপের যে আশঙ্কা তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সমাজের অবস্থা বিশেষে যে কার্য্য হিতকরবোধে অনুষ্ঠিত হয় তাহা কোন অংশে দূষণীয় নহে এবং তাহার অনুষ্ঠাতাদিগের সংশ্রবে পূর্ব্বতন লোকের জাতি ও ধর্ম্ম কদাচ বিলুপ্ত হইত না। তবে এখনই বা কেন সেই চিন্তায় আকুল হও। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র অতি উদার। সমাজের যে কোন রূপ দুরবস্থা মোচনের জন্য বিজাতীয়দিগের দেশে গমন করাকে শাস্ত্রকারেরা তত দূষণীয় বিবেচনা করেন না। বর্ত্তমান আচার্য্যদিগেরও তাহাই ব্যবস্থা।

সুতরাং জাতি ও ধর্ম্মলোপের অমূলক আশঙ্কার কথা তুলিয়া বিদ্যা অর্থ ও পদমর্য্যাদায় যাঁহারা বাস্তবিক সমাজের শ্রী তাঁহাদিগকে অসংগৃহীত রাখা শ্রেয়স্কর নহে। ইহাঁদের অভাবে সমাজের অঙ্গ নিশ্চয়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। কিন্তু সুখের বিষয় হিন্দুসমাজ অনুদার নহে। অনেকে এই সমস্ত লোককে সংগ্রহ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা কোন বাধা কোন বিঘ্নই আর মানিতেছেন না। আজ কাল হিন্দুর ভিতর এই যে পরিবর্ত্তনটুকু দেখিতেছি এদেশে শিক্ষা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচারই তাহার প্রধান কারণ। বহুকাল পূর্ব্বে এই মহানগরীতে যাঁহারা কালিপ্রসাদি হাঙ্গাম স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারা সেই হিন্দুসমাজের এই সহনীয় ভাব দেখিয়া আজ নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন।

উপসংহারে বিলাত প্রত্যাগতদিগকে কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহারা শিক্ষাদি যে কোন স্বার্থ লইয়াই হউক বাস্তবিকই যদি দেশের হিতোদ্দেশে বিলাত গিয়া থাকেন তাহা হইলে তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেশাবচ্ছিন্ন ভাবের প্রতি যেন উপেক্ষা না করেন। কি আহার কি পরিচ্ছদ সকল বিষয়ে দেশকে আদর্শ করা তাঁহাদের উচিত। তাঁহারা হয় ত মনে করেন হিন্দুজাতি বড় অনুদার। বাস্তবিক তাহা নহে। দেশাচারের বিরুদ্ধ ভাব কোন সভ্য জাতিই সহ্য করিতে পারে না। তোমরা আচার ব্যবহারে তাঁহাদের ন্যায় হও তাঁহারা সস্নেহে তোমাদিগকে ক্রোড়ে লইবেন! সংযোগেই তাঁহাদের প্রয়াস বিশ্লেষে নহে। বুদ্ধিমান হইয়া এই সুযোগ উপেক্ষা করা তোমাদের উচিত নয়। যদি যথার্থই দেশের দুরবস্থায় তোমাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়া থাকে আর সেই হৃদয়েরই প্রবর্ত্তনায় ব্যাপক কাল আত্মীয় স্বজন বিরহিত হইয়া দেশান্তরবাসের কষ্ট সহিয়া থাক তাহা হইলে মনে করিও না দেশের সহিত সর্ব্বাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশের উপকারে কৃতকার্য্য হইবে।

সমালোচন।

চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

১খণ্ড। ৬ষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা।

এখানিতে অনেক গুলি প্রবন্ধ আছে। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রতি সংখ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে এক একটি গভীর তত্ত্বের অবতারণা করিয়া তাহার আলোচনা করিতেছেন। এ বারে গীতার প্রক্ষেপবাদের বিরুদ্ধে কতিপয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়া উহার খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। "যুদ্ধারম্ভে গীতা সম্বাদ সম্ভব কি না? এ প্রশ্নের পূর্ব্বাপরের সুচারু সমন্বয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ এদেশে যত বহুল পরিমাণে প্রচার হয় ততই মঙ্গল।

The Calcutta University Magazine. June 1894.

পত্রখানি পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষতা ও গৌরব সহকারে সম্পাদিত হইতেছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় "বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিম বাবুর বাল্য যৌবন আভিজাত্য বিদ্যাশিক্ষা, তাঁহার উপন্যাস লিখিতে লিখিতে ধর্ম্মবিষয়ক প্রস্তাবে হস্তার্পণ প্রভৃতি বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করিয়া প্রবন্ধটি সুন্দর ও মনোহারী করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় একস্থলে লিখিয়াছেন যে বঙ্কিমবাবু ইংরাজিতে বিশেষ কৃতবিদ্য ছিলেন বলিয়া এক সময় তাঁহার ইংরাজিতে লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে ইংরাজি অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষাতে গ্রন্থ রচনা করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল ও বঙ্গভাষার উন্নতি হইবে তখন তিনি পূর্ব্বোক্ত দুরূহ প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে বাঙ্গালাতে অভূতপূর্ব্ব নূতন নূতন ভাব ও তত্ত্ব সমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধন্য তাঁহার সেই মত পরিবর্ত্তন যদ্দ্বারা বঙ্গীয় জনগণ তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমোদ ও শান্তি লাভ করিতেছে ও বহুকাল করিবে। বর্ত্তমানকালে যে সকল বঙ্গীয় কৃতবিদ্য লেখক ইংরাজিতে গ্রন্থকার হইবার জন্য লোলুপ, তাঁহাদিগের এ বিষয়টি প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত।

The Hindu world April 1884.

সম্পাদক মুখবন্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে এই পাক্ষিক পত্রে তিনি সাহিত্য বিজ্ঞান রাজনীতি ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য সমাজের মত পার্শ্বাপার্শ্বি প্রকটন করিয়া সভ্য জগতের কিরূপ উন্নতি হইতেছে দেখাইবেন। কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল সংবাদ পত্রাদি হইতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি নিজ পত্রে উদ্ধৃত করিবেন ও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে নিজের মত অপক্ষপাতে প্রকাশ করিবেন। প্রথম সংখ্যায় ঐ সংকল্পে অনুযায়ী কার্য্য কিয়দংশে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম; ভরসা করি সম্পাদক পত্রিকাখানির দিন দিন উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

সাংখ্য স্বরলিপি।

দিবানিশির সন্ধিকালে যেমন সন্ধ্যার উৎপত্তি হয় সেইরূপ দুই বা ততোধিক স্বরের সন্ধিকালে স্বরসন্ধ্যার উৎপত্তি হয়। এই স্বরসন্ধ্যা সঙ্গীতরাজ্যে বড় কার্য্যকরী।

স্বরগুণন অর্থাৎ স্বরসন্ধিকালেই—স্বরসন্ধ্যা—জন্মলাভ করে। স্বরগুণনেই স্বরের প্রকৃত সন্ধিস্থল বিরাজিত হয়।

আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী ও আমরা অতিরিক্তভাবে স্বরগুণনকে স্বরসন্ধীকরণ—স্বরগুণকে স্বরসন্ধি কহিতে পারি।

গুণ্যস্বর।

যে স্বরটিকে গুণদ্বারা বর্দ্ধিত করা যায় তাহাকে গুণ্যস্বর কহে।

গুণকস্বর।

যে স্বরের দ্বারা অপর কোন স্বরকে গুণ করা যায় তাহাকে গুণকস্বর কহে।

ফলস্বর।

একটি স্বরকে অপর কোন স্বর দিয়া গুণ করিলে যে ফল হইবে তাহাকে স্বরগুণফল বা গুণফলস্বর কহা যায়। এমন কি শুধু ফলস্বর কহা যাইতেও পারে।

বর্গস্বর।

গুণ্য ও গুণকস্বর সর্ব্বতোভাবে সমান হইলে তাহাদের গুণফলকে বর্গস্বর কহে। যথা সা × সা = সা২ বা সা২।

যুক্তস্বর।

হসন্তমাত্রিক ও মুখ্যস্বর যুক্ত হইলে তাহাদের যোগফলকে যুক্তস্বর কহে। যথা স্‌মা বা স্মা। গ্‌মা বা গ্মা। ম্‌পা বা ম্পা।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওট।

ব্রহ্মণ মো পর হও হে মোর সব দুখ দূর কর।
শান্তিদাতা শান্তিবারি বরিষিয়ে কর শীতল মোচন কর পাপভার।
মোপর সদয় হও হে মোর সব দুখ দূর কর।

তালি। ২ঃ (স্তু আরম্ভ)। ৩। ০। ১।
মাত্রা। ৩ । ৪। ৩। ২, ১, (স্থা) ১।

(স্থা) "সা সা" বা "রে রে"। পা পা পা। রে রে গা মা। গা২ রে২ গা রে। সা সা সা সা।
(স্থা) ব্র হ্ম ব্র হ্ম। মন্ — —। মো — প র। স — দ য়। হ ও হে —।

। ধ্সা ধা ধা। সা সা সা সা। স্মা "গ্মা বা "মা" রে। র্নি রে (স্থা—পু)ঃ—সা সা।
২ ২ ... ২
। মো — র। স ব দু খ। দূ — — র। ক রো (স্থা—পু)ঃ—ব্র হ্ম।

২ ... ...
। (স্তু)ঃ০—। স্পা "ম্পা" বা "পা" গা। গ্পা ৲মা ৲ম্ধা পা। প্সা সা সা। সা সা সা সা। সা গা রে।
। (স্তু)ঃ০—। শা — — স্তি। দা — তা —। শা — স্তি। বা — রি —। ব রি ষি।

... ... ২...... ২
। গা মা গা গা। স্গা রে রে। সা সা সা সা। পা পা পা। ধা ধা ধ্সা সা। পা ধা সা২ সা২।
। য়ে — ক র। শী — ত। ল — — —। মো — চ। ন — — — —। ক — — র।

। পা ধা পা২ ৲মা২ পা। গা রে রে। রে২ গা মা। গা২ -রে২ গা রে। সা সা সা সা।
। পা — — — প। ভা — র্। মো প র। স — দ য়। হ ও হে —।

। ধ্সা সা ধা সা সা সা সা। স্মা মা রে। রে২ -নি২ রে (স্থা—পু)ঃ০—সা সা।
২ ২ ২
। মো — র। স ব দু খ। দূ — র। ক —রো (স্থা—পু)ঃ০—ব্র হ্ম।

। স্পাঃ ॥
। মন্ ॥

টপ্পা।

ইত্যে

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪, ফাল্গুন ও চৈত্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ৩৫৫৸৫
পূর্ব্বকার স্থিত ৩১২৪৸১০

সমষ্টি ৩৪৮০৷১০
ব্যয় ... ৩৮০৷১০

স্থিত ... ... ৩১০০৲

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ১৬৷৶০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন
১৮১৫ শকের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ১৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল মল্লিক ৪৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী ৫৲
„ „ মণিলাল মল্লিক ৪৲
দানাধারে প্রাপ্ত ২৷৶০

১৬৷৶০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ২৯৶০

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল মল্লিক, কলিকাতা
১৮১৫ শকের ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত পত্রিকার সাহায্য ২৲
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা
১৮১০ শকের মাঘ মাসের সাহায্য ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সুর, কলিকাতা
১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
„ „ ক্ষেত্রমোহন ধর, কলিকাতা
১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
„ „ হরিমোহন নন্দী, কলিকাতা
১৮১৫ শকের শ্রাবণ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত পত্রিকার সাহায্য ১৶০
„ „ পতিতপাবন মিত্র, খিদিরপুর,
১৮১৪ শকের বাকী মূল্য শোধ ১৲
„ „ শোভনলাল ছোটলাল, ভাবনগর
১৮১৫ শকের মূল্য ও মাশুল ৩৶০ মধ্যে ৩৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, নোয়াখালি, ১৮১৫ শকের অৰ্দ্ধমূল্য ও মাশুল ১৸৶০
শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায়, কলিকাতা
১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
৺বাবু যদুনাথ মল্লিক, কলিকাতা
১৮১১ শকের মূল্য ৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু কেদারেশ্বর সেন গুপ্ত, কলিকাতা
১৮১৫ শকের অৰ্দ্ধ মূল্য ১৷০
„ „ প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী, কলিকাতা
১৮১৫ শকের বাকী মূল্য শোধ ১৲
„ „ লালবিহারী বড়াল, কলিকাতা
১৮১৫ শকের মূল্য ৩৲
১৮১২ শকের মাঘ ও চৈত্র,
১৮১৩ শকের মাঘ, ১৮১৪ শকের শ্রাবণ ও পৌষ, এবং ১৮১৫ শকের ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয় ১৷৶০

২৯৶০

পুস্তকালয় ৩৬৸৶০
যন্ত্রালয় ... ... ২৪৬৲
গচ্ছিত ১৭৷৴০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ৭৲
পুস্তক বিক্রয়ের কমিসন .. ২৷০

সমষ্টি ৩৫৫৸০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ১৩৯৴৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৫৪।০
পুস্তকালয় ... ২০৷৶
যন্ত্রালয় .. ১০৪৶৫
গচ্ছিত ... ২৮৴১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ৩৶৫
সেভিংসব্যাঙ্ক ৩১৲

সমষ্টি ৩৮০৷১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৫।

৬১১ সংখ্যা

১৮১৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ফাহিয়ানের ভারত ভ্রমণ।

গগনস্পর্শী পর্ব্বতের হিমময় শিলাখণ্ড ভেদ করিয়া খরবাহিনী স্রোতস্বতী পঞ্চনদ রূপে পঞ্জাব প্রদেশ বিধৌত করত সাগর সন্নিধানে প্রধাবিত। তীরে পবিত্রচেতা আর্য্য ঋষিগণের পুণ্যাশ্রম। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির রমণীয় শোভা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। স্বভাবের মনোমোহন চিত্রদর্শনে আর্য্য হৃদয় ভরিয়া উঠিল। মহাপুরুষগণের বিশাল হৃদয় বিশ্বেশ্বরের প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া সমুদ্রগামিনী বেগবতী তরঙ্গিণীর ন্যায় তৎপ্রতি ধাবিত হইল। প্রবাহের সমতানে বেদমন্ত্র পঞ্চনদ প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

কালে সেই প্রবহমান আর্য্যহৃদয় হইতে বুদ্ধদেবের বহুকালের সাধনাসম্ভূত আর এক স্রোতের উৎপত্তি হইল। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' এই রবে দিঙ্মণ্ডল মাতিয়া উঠিল। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সেই উপদেশ দেশ দেশান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন। তখনকার সেই প্রবল বৌদ্ধপ্রবাহপ্লাবিত প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থা জ্ঞাত হইতে সকলেই কুতূহলী। কিন্তু সে কৌতূহলের পরিতৃপ্তি কোথায়? শত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে কত রাজ্যবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, অত্যাচার, উৎপীড়ন ভারতবাসীকে নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। হিন্দুর ইতিহাসে সে সকল কথা জানিবার উপায় নাই। বিদেশীয়গণলিখিত, বিদেশীয়গণবর্ণিত আর্য্যকাহিনী পাঠ করিলে সেই অতৃপ্ত কৌতূহল কথঞ্চিৎ পরিমাণে নিবৃত্ত হইতে পারে।

সুদূর চীন সাম্রাজ্য হইতে বুদ্ধদেবের লীলাস্থল ও জ্ঞানসমুন্নত পবিত্র ভারতভূমি সন্দর্শনার্থ ফাহিয়ান, সাঙ্ হু, ও হিউয়েন্থ্সঙ্গ নামক তিন জন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বর্ণিত ভারতের বিবরণী পাঠে আমরা আমাদিগের আলোচ্য কালের ভারতবাসীর অবস্থা জানিতে পারিব।

৪০০ খৃষ্টাব্দে ফাহিয়ান সর্ব্ব প্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন। তৎকালে গুপ্তরাজবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ভারতের সিংহাসনে ছিলেন। ফাহিয়ান কাবুলের মধ্য দিয়া উত্তর ভারতে প্রবেশ করেন। অত্রত্য

অধিবাসীদিগের আহার, পরিচ্ছদ, রীতি, নীতি সমুদয়ই মধ্য আসিয়াবাসীর অনুরূপ ছিল। ফাহিয়ান তথা হইতে পেশবারে আইসেন। তথায় এক অত্যুচ্চ, বহুলোকসেবিত বৌদ্ধমন্দির তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। অনিমেষলোচনে পর্য্যটক সেই জ্ঞানস্তম্ভের প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং পুণ্যভূমির দ্বারদেশে এই মহান দৃশ্য অবলোকন করিয়া মনশ্চক্ষে অভ্যন্তরের অপরিসীম সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে পরিব্রাজক হিন্দুর পবিত্র তীর্থ মথুরা সন্নিধানে উপনীত হইলেন। স্বচ্ছসলিলা যমুনা মথুরার পাদদেশ প্রক্ষালন করিয়া প্রবাহিত। তাহার দুই কূলে অসংখ্য বৌদ্ধ শ্রমণদিগের আশ্রম বিরাজমান ছিল। তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার দর্শন করিয়া তিনি সাতিশয় আনন্দানুভব করিলেন এবং কিছুদিন শ্রমণদিগের সংসর্গে থাকিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক অজ্ঞাত তথ্য অবগত হইলেন। মথুরার পশ্চিম প্রান্ত হইতে রাজপুতানার বিশাল মরুভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। সেই মরুভূমির পরপারস্থ অধিবাসী সম্বন্ধে ফাহিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন যে তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করে—পৃথিবীতে তাহাদিগের অস্তিত্ব আছে বলিয়া কোনও রূপ রাজকর দিতে হয় না। এবং রাজকর্ম্মচারিগণ কোন রূপ বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ নহে। কেবল মাত্র যে সকল ব্যক্তি রাজকীয় ভূমি কর্ষণ করে তাহাদিগকে ভূমির উপস্বত্বের কিয়দংশ রাজভাণ্ডারে দিতে হয়। তাহারা ইচ্ছামত ভূমি গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে পারে। রাজা অপরাধিবর্গকে কোনরূপ শারীরিক দণ্ড না দিয়া অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা পূর্ব্বক অর্থদণ্ড করেন। রাজ্যে কেহ প্রাণিবধ করিতে পারে না এবং কোন রূপ গুরুতর পাপাদি দোষে আসক্ত নহে। অত্রত্য অধিবাসিগণ শূকর কুক্কুট প্রভৃতি পালন করে না। বাজারে মদ্য মাংসের বিপনী দৃষ্ট হয় না। ক্রয় বিক্রয়ার্থ কড়িই ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে কেবল মাত্র চণ্ডালগণ পানদোষে আসক্ত ও সর্ব্বদা প্রাণিহত্যারত। রাজা ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূমি সম্পত্তি দান করেন। সর্ব্বত্র মঠাধ্যক্ষগণ নিয়মিত রূপে শয্যা, আহার্য্য ও পানীয় দ্বারা পরিসেবিত হইয়া থাকেন।

মথুরা ত্যাগ করিয়া ফাহিয়ান কান্যকুব্জে গমন করিলেন। সেই সমৃদ্ধ ও গৌরবসমন্বিত নগরীর দুইটী সংগ্রামের কথা ভিন্ন পরিব্রাজক আর কিছুরই উল্লেখ করেন নাই। কান্যকুব্জ হইতে তিনি কোশল রাজ্যের প্রধান নগরী শ্রাবস্তী দর্শন মানসে যাত্রা করিলেন। তখন শ্রাবস্তীর পূর্ব্বগৌরব লুপ্ত হইয়াছে—ধর্ম্মশালা, ধর্ম্মমন্দির সকল ভগ্ন হইয়া নির্জ্জনতার পরিচয় প্রদান করিতেছে—সুন্দর শিলাখণ্ড ভেদ করিয়া প্রাচীন অশ্বত্থ, বট চারিদিক আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। হৃতসর্ব্বস্ব, কঙ্কালাবশিষ্ট মনুষ্যাকৃতির ন্যায় সেই সকল ভগ্ন মন্দিরের গৌরবাবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে সাশ্রু নয়নে চাহিয়া থাকিতে হয়—দূরে অদূরে সুবৃহৎ অট্টালিকা, সুরম্য চিত্তবিনোদন উদ্যান সমূহের বিকৃতাবস্থা দর্শন করিয়া পরিবর্ত্তনশীল জগতের পরিণাম বুঝিতে পারা যায়। সেই শ্মশানতুল্য নগরীতে কেবলমাত্র দুই শত ঘর লোকের বসতি ছিল। কিন্তু তত্রত্য জিতবনের সৌন্দর্য্যের তুলনা ছিল না।

যখন বুদ্ধদেব সেইস্থানে ধর্ম্মগাথা গাহিয়া বেড়াইতেন তখন সেইস্থান যেরূপ মনোহর ছিল ফাহিয়ান আসিয়াও সেইরূপ দেখিলেন। তথাকার বিহারশ্রেণী নানালঙ্কারে ভূষিত। সম্মুখস্থ রমণীয় উদ্যানে নানাজাতীয় বৃক্ষ ফলভরে অবনত; পুষ্পগুচ্ছ সুশোভিত লতামণ্ডপে ভ্রমরগণ মধুলোভে মত্ত; সুবৃহৎ সরোবরে স্বচ্ছ ঈষৎ তরঙ্গায়িত বারিরাশির উপর হংস সারস প্রভৃতি বিহঙ্গকুল নিরন্তর ক্রীড়াশীল। সেই শান্তরসাস্পদ উদ্যানের বিচিত্র শোভা সন্দর্শনে ফাহিয়ান বিমোহিত হইলেন। বিহারবাসীরা বিদেশী পর্য্যটকের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"কি আশ্চর্য্য, ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্তি করিবার জন্য মানুষ পৃথিবীর সীমান্ত হইতে এতদূর আসিয়াছে।"

তৎকালে বুদ্ধের জন্মস্থান কালের বিধ্বংসিনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছিল। তথায় কেবল মাত্র বৌদ্ধ পুরোহিতগণের দুই একখানি আশ্রম দৃষ্টিগোচর হইত। যে সুসমৃদ্ধ কুশীনগরে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার সুখসূর্য্য তাঁহারই সহিত অস্তমিত হইয়াছিল—ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কতকগুলি হীনাবস্থাপন্ন ব্যক্তির পর্ণকুটীর অবশিষ্ট ছিল।

অতঃপর ফাহিয়ান বৈশালীতে উপনীত হইলেন। এই বৈশালী এক সময়ে লিচ্ছিবি রাজগণের বড় আদরের রাজধানী ছিল; এবং এইখানে আসিয়াই গৌতম অম্বপলীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থল সম্বন্ধে ফাহিয়ান লিখিয়াছেন যে বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর এক শতাব্দী অতীত হইলে বৈশালীর কতিপয় ভিক্ষু বিনয়পীঠক-নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করায় তত্রত্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ সমবেত হইয়া পুনরায় উক্ত গ্রন্থের সংগ্রহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বৈশালী হইতে পর্য্যটক পাটলীপুত্রে গমন করিলেন। ঐ নগরী অজাতশত্রু শত্রুদমনার্থ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে অশোকের রাজধানী বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত হয়। ফাহিয়ান নগরাভ্যন্তরে অশোকনির্ম্মিত বিশাল রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলেন। ভগ্নপ্রায় প্রাচীর নির্গমনদ্বার প্রভৃতির কারুকার্য্য দেখিয়া তৎসমুদায় মনুষ্যসম্পাদিত বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। অশোকস্থাপিত স্তম্ভসন্নিধানে এক সুবৃহৎ সংগ্রাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় অন্যূন ৭০০ বৌদ্ধ ভিক্ষুর বসতি ছিল। বিখ্যাত বামনাচার্য্য মঞ্জুশ্রী সেই বৌদ্ধাশ্রমে বাস করিতেন এবং শ্রমণদিগের দ্বারা বিবিধবিধানে সম্মানিত ও সম্পূজিত হইতেন। সেই সময়ে বৌদ্ধদিগের ক্রিয়াকাণ্ড কিরূপ আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইত ফাহিয়ান তাহা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে বিবিধ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি রাজপথ দিয়া মহা সমারোহের সহিত লইয়া যাওয়া হয়। এই উপলক্ষে অধিবাসিগণ চারি চক্রের একখানি গাড়ীর উপর দেবমন্দিরসদৃশ প্রায় চৌদ্দহস্ত উচ্চ বংশনির্ম্মিত পঞ্চতল একটী বুরুজ স্থাপিত করিয়া শ্বেতবস্ত্র দ্বারা তাহা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করে এবং তাহা বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেয়। তৎপরে তাহারা তাহার চতুষ্কোণে চারিটী মন্দির প্রস্তুত করত তন্মধ্যে বুদ্ধের সমাসীন মূর্ত্তি এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি পরিশোভিত অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সকল সেই শকটস্থিত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত রেশমের চন্দ্রাতপের নিম্নে

স্থাপন করে। বিভিন্ন প্রকারে সজ্জিত এইরূপ বিংশতিখানি শকট নির্ম্মিত হয়। এই মূর্ত্তিপ্রদর্শনীর দিবসে বহুসংখ্যক শ্রমণ ও অন্যান্য লোক একত্র হয় এবং নানারূপ ক্রীড়া ও গীতবাদ্য হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারিরা এই সময়ে নিমন্ত্রিত হন এবং উৎসবে যোগদান করেন। তৎপরে বৌদ্ধেরা একে একে নগর মধ্যে প্রবেশ করেন ও সমস্ত রাত্রি নানা প্রকার কৌতুক ও পূজায় অতিবাহিত করেন।

ফাহিয়ান পাটলীপুত্রের চিকিৎসালয় দেখিয়া লিখিয়াছেন যে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ একত্র হইয়া নগর মধ্যে চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তথায় নানা স্থান হইতে রুগ্ন ও সহায়হীন ব্যক্তিগণ আগমন করে এবং তাহারা বিনা ব্যয়ে পরমযত্নে পরিসেবিত হয়। চিকিৎসকগণ রোগীর রোগ ও অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক পথ্য ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। সুনিয়মে থাকিয়া রোগী যখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হয় তখন সে আপনার সুবিধামত গমন করিতে পারে।

তৎপরে ফহিয়ান রাজগৃহে আগমন করিলেন। ঐ নগরী শিশুনাগবংশীয় বিম্বসারের প্রাচীন রাজধানী ছিল ও অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই স্থলে বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিবার জন্য বৌদ্ধসমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। ফাহিয়ান লিখিয়াছেন যে তত্রত্য চেতী নামক বৃহৎ পর্ব্বতগুহায় পাঁচ শত বৌদ্ধ সম্মিলিত হইয়া সেই সংগ্রহ কার্য্য সমাধা করেন।

অনন্তর গয়াধামে উপস্থিত হইয়া পর্য্যটক দেখিলেন ঐস্থান মরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে—মনুষ্যের বসতিমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। তথায় যে বোধিদ্রুমের * তলদেশে বসিয়া সিদ্ধার্থ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে পর্য্যটক তাহা সন্দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং অপরাপর যে যে স্থলে বুদ্ধদেব তপস্যাদি করিতেন তৎসমুদয় দর্শন করিয়া বারানসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভাগিরথী তটবর্ত্তী সেই পুরীর অভ্যন্তরস্থ যে বিচিত্র উদ্যানে † জ্ঞানসমৃদ্ধ গৌতম প্রথমে স্বীয় অসীম জ্ঞানরাশি বিকীরণ করিয়া মানব হৃদয় আন্দোলিত ও আলোড়িত করিয়াছিলেন, বারানসীতে উপনীত হইয়াই ফাহিয়ান সর্ব্বাগ্রে তথায় গমন করিলেন। সেইস্থানে দুইটী মাত্র সংগ্রাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথা হইতে বুদ্ধের প্রচারক্ষেত্র কৌশাম্বী নগরী দর্শনানন্তর পরিব্রাজক পুনরায় বিনয়পীঠক সংগ্রহ মানসে পাটলীপুত্রে প্রতিগমন করিলেন। তৎকালে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধ প্রচারকগণ প্রধানতঃ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন—অনেকের নিকট মূলগ্রন্থ থাকিত না। ফাহিয়ান অনেক অনুসন্ধানের পর পাটলীপুত্রের কোন সংগ্রাম হইতে উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থের হস্তলিপি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অনন্তর ফাহিয়ান চম্পানগরীতে গমন করিলেন। ঐ নগরী অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। তথা হইতে আরও দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে, যথায় ভাগিরথীর নির্ম্মল বারিরাশি বারিধির অনন্ত উর্ম্মিমালাশোভিত বক্ষ আলিঙ্গন করিতেছে, তত্রত্য প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত বন্দর ও বাণিজ্যাগার তাম্র

* অশ্বত্থবৃক্ষ।

† এক্ষণে সেই উদ্যান ধামেক (Dhamek) নামে প্রসিদ্ধ।

লপ্তিতে ফাহিয়ান উপনীত হইলেন। সেই নগরস্থ চব্বিশটী সংগ্রামে বুদ্ধের নিয়মাবলী যথাযথরূপে পালিত হইত। ফাহিয়ান সেই স্থলে দুই বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া অনেক ধর্ম্মপুস্তকের প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে এবং প্রতিমূর্ত্তি সমূহের চিত্রাঙ্কনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পরে শীতঋতু আগমন করিলে একখানি বৃন্দর সমুদ্রযানে ফাহিয়ান সিংহলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন বঙ্গোপসাগরের ঝটিকাক্লিষ্ট বারিরাশি হিমস্পর্শে শীতল হইয়া প্রশান্তভাবে সুনীল গগনের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। নির্ব্বিঘ্নে বৃহৎ পোত সেই নীল জলরাশি ভেদ করিয়া চতুর্দ্দশ দিবসে সিংহলে উপস্থিত হইল। পর্য্যটক উল্লেখ করিয়াছেন যে পূর্ব্বে সিংহলে মনুষ্যের বসতি ছিল না— বণিক সম্প্রদায়ের গমনাগমন হেতু ক্রমে ঐস্থল এক বিশাল রাজ্যে পরিণত হয় এবং অধিবাসিগণ নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। সিংহলের স্বাস্থ্য অতি সুখকর ও ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা ছিল। রাজধানীর উত্তরাংশে এক অত্যুচ্চ রাজপ্রাসাদ শোভা পাইতেছিল। তথাকার এক সংগ্রামে অন্যূন পাঁচ সহস্র শ্রমণ বাস করিত।

এইরূপে ঐ ধর্ম্মপ্রাণ স্বদেশবৎসল পর্য্যটক বৈচিত্রময় শোভায় পরিবেষ্টিত হইয়াও স্বদেশের জন্য আকুল হইয়া পড়িলেন। অনেক দিন হইল স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছেন তাই ক্ষণে ক্ষণে জন্মভূমিকে মনে পড়িতেছিল। মাতৃহারা শিশু বিবিধ ক্রীড়া সামগ্রী পাইলেও যেমন মাকে ভুলিতে পারে না, স্বদেশবৎসল ফাহিয়ানেরও সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে জন্মভূমিকে মনে পড়িতে লাগিল। একদিন বুদ্ধদেবের এক প্রতিমূর্ত্তির সন্নিকটে কোন বণিকপ্রদত্ত একখানি চীনদেশীয় পাখা দেখিয়া তিনি বালকের ন্যায় অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন।

দুই বৎসরকাল সিংহলে অবস্থান করিয়া এবং ইতিমধ্যে বিনয়পীঠক ও চীনদিগের অপরিজ্ঞাত আরও কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করত ফাহিয়ান এক বৃহৎ পোতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে এক মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। কোথা হইতে ঘোর কৃষ্ণ মেঘরাশি আকাশের চন্দ্রতারকা আচ্ছন্ন করিয়া সশব্দে সুপ্ত সমুদ্রকে ডাকিতে লাগিল। মহাগর্জ্জনে মহাসমুদ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন আকাশে ও সমুদ্রে মিলিয়া মহাপ্রলয় উত্থাপিত করিল। সেই ভীষণ দুর্য্যোগে দিগন্তহীন দুস্তর ভারতসাগরে একখানি তরণী লক্ষ্যহীন ভাবে যেন কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিল। পোতাধ্যক্ষ সেই মগ্নপ্রায় তরণীর রক্ষাবিধানে তৎপর হইয়া অনেক মালপত্র সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ফাহিয়ানের হৃদয়ে সাতিশয় ভীতির সঞ্চার হইল। যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণ ভার লাঘবের জন্য পোতাধ্যক্ষ তাঁহার সংকলিত পুঁথিগুলি সমুদ্রে বিসর্জ্জন দেন সেই ভাবনায় ফাহিয়ান আকুল হইয়া উঠিলেন। যদি কেহ তখন তাঁহার পুঁথিগুলির ভার লইয়া তাঁহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আজ্ঞা করিত; তাহা হইলে অকুতোভয়ে তিনি তাহা করিতে পারিতেন। সৌভাগ্য বশত তাঁহার দুর্ভাবনা শীঘ্রই বিদূরিত হইল। ত্রয়োদশ দিবসে ঝটিকাহত পোতখানি একটী ক্ষুদ্রদ্বীপে আসিয়া পড়িল। সে দ্বীপ বহুদূরে অবস্থিত। তথা হইতে একমাস পরে পোতখানি যবদ্বীপে উপনীত হইল।

তথায় দুইমাস কাল অবস্থান করিয়া অন্য একখানি জাহাজে উঠিয়া ফাহিয়ান স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। গতিপথে পুনরায় ভীষণ ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়া তরী মগ্ন প্রায় হইল। ব্রাহ্মণ আরোহিবর্গ বৌদ্ধ পরিব্রাজকের আগমনই সকল বিপদের কারণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ফাহিয়ানকে কোনও জনহীন দ্বীপমধ্যে ফেলিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব, সকলকে এই পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিলেন—অকূলে আর তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল না। প্রায় আড়াইমাস পরে জাহাজ চীন দেশে পহুঁছিল। ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু পর্য্যটকের ভারতভ্রমণ পরিসমাপ্ত হইল।

ভূ-গর্ভস্থ উত্তাপ।

মনুষ্য ভূ-পৃষ্ঠ হইতে অধিক উচ্চে অথবা অধিক নিম্নে যাইতে পারে না। ব্যোমযানের সাহায্যে কিছু দূর উঠিলেই এমন সূক্ষ্ম বায়ুমণ্ডলে উপনীত হইতে হয় যথায় শ্বাস প্রশ্বাস সহজে রুদ্ধ হইয়া আইসে। যদি সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা কর তবে পার্শ্ববর্ত্তী জলরাশির ভারে দেহচূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু মানব এই সমস্ত স্থানকে অগম্য জানিয়াই ক্ষান্ত নহে; জগদীশ্বর তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। সে সেই বুদ্ধির সাহায্যে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তাহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অগ্রসর।

সকলেই বোধ হয় জানেন যে বায়ু, সূর্য্যের নিকট হইতে তাপ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই তাপ আবার পৃথিবীতে বিকীর্ণ করে। এই তাপের সাহায্যে পৃথিবী সজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা হইয়া নয়ন প্রাণ মুগ্ধ করে। আবার এই উত্তাপেই সাহারা মরু অতি ভীষণ ভাব ধারণ করে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশে ভূপৃষ্ঠ চির তুষারাচ্ছন্ন। পৃথিবীর উপর সূর্য্য-তাপের এত প্রভাব সত্ত্বেও পণ্ডিতেরা বলেন যে ঐ উত্তাপ ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিতে সমর্থ নহে। পৃথিবী খনন করিয়া ৬০ কিম্বা ৮০ ফিট নিম্নে গমন করিলে তথায় আর সূর্য্যতাপের হ্রাস বৃদ্ধি কিছুমাত্র বুঝিতে পারা যায় না। পারিস মানমন্দিরে প্রায় ৮৬ ফিট গভীর এক সুড়ঙ্গ মধ্যে বহুকাল হইতে একটি তাপমান রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে চিরকালই ১১০৭ অংশ উত্তাপ দেখা যায়। উপরে হয়তো দারুণ গ্রীষ্মে লোক অস্থির হইতেছে অথবা ভীষণ শীতে চতুর্দ্দিক নীহারাচ্ছন্ন হইয়াছে তথাপি ভূগর্ভস্থ তাপমানে চিরদিন সেই একই উত্তাপ দেখা যাইতেছে! কিন্তু নানাস্থানে নানাবিধ উপায়ে জানা গিয়াছে যে আরও অপেক্ষাকৃত নিম্নে তাপমান লইয়া যাইলে আবার ক্রমে ক্রমে তাপবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে অতি গভীর কূপ খনন করিতে হইয়াছে সেইখানেই ৮৬ ফিটের নিচে আবার তাপ বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পারিসের গ্রেনেল নামক কূপে প্রায় ১০০০ফিট নিম্নে ২২২ ডিগ্রি ও ১৫৫৫ ফিট নিম্নে ২৬০৪৩ ডিগ্রি উত্তাপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ কূপের জল প্রায় ১৬৮৮ফিট নিম্ন হইতে উঠিতেছে। ঐ জলের তাপ চিরকালই ২৭০৭০ ডিগ্রি।

ওয়েষ্টফালিয়ার অন্তর্গত নিউসালজার্স নামক নগরে কূপ খনন কালে ৫৮০, ১২৮৫ ও ১৯৩৫ ফিট নিম্ন হইতে তাপমানের সাহায্যে যথাক্রমে ১৯০৭,২৭০৫ ও

৩১০৪ ডিগ্রি তাপ পাওয়া গিয়াছে। অবশেষে এক্ষণে ২১৪৪ ফিট নিম্নের তাপ চির কালই ৩৩০৬ হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রতি ৮০ কিম্বা ১০০ ফিট নিম্নে এক ডিগ্রি তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ভূপৃষ্ঠ হইতে১০০০০ফিট নিচে যে উত্তাপ আছে তাহাতে জল ফুটিয়া বাষ্প হইতে পারে। এবং ৮০ কিম্বা ১০০ মাইল নিম্নে তাপ এত অধিক যে তথায় কঠিন উপলখণ্ডও মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্রবীভূত হয়।

এই প্রকার উত্তাপবৃদ্ধি কেবল অনুমান দ্বারা স্থিরীকৃত হইলেও পৃথিবীর নানা স্থানের বহ্নিপর্ব্বতের ধাতু নিঃস্রাব ও উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিলে ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে ভূগর্ভ অতিশয় উত্তপ্ত ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

উষ্ণ কটিবন্ধে শীতল প্রস্রবণ ও মধ্য কটিবন্ধে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিয়া বোধ হয় যে উহাদের জল যেস্থল হইতে উঠিতেছে তথায় সূর্য্যতাপের কিছুমাত্র প্রভাব নাই। শীতপ্রধান চিরতুষারাচ্ছন্ন আইসলণ্ড ও গ্রীষ্মপ্রধান উত্তপ্ত বালুকাময় ফিজি দ্বীপের উষ্ণপ্রবণের উত্তাপ প্রায় সমান। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে প্রস্রবণ পৃথিবীর যে কোন দেশেই হউক না কেন তাহার উষ্ণতা অথবা শৈত্যের সহিত সূর্য্যতাপের কোন সম্বন্ধ নাই।

কিন্তু কেবল উষ্ণপ্রস্রবণ নহে বহ্নিপর্ব্বতের ধাতুনিঃস্রাবে অসংশয়িত চিত্তে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। উহার গলিত ধাতু ও প্রস্তর নিস্রবে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ সমস্ত দ্রবীভূত পদার্থ প্রস্রবণের জল অপেক্ষা অনেক নিম্নতর স্তর হইতে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। কারণ পাষাণকে তরল করিতে অন্তত ২০০০ ডিগ্রি তাপের আবশ্যক।

প্রস্রবণের ন্যায় বহ্নিপর্ব্বতও পৃথিবীর অনেক দেশে বর্ত্তমান। এবং সকল পর্ব্বত হইতে একই প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহাতেই জানা যায় যে পৃথিবীর উপরি ভাগ যেমনই কেন হউক না অভ্যন্তর দেশ এক প্রকাণ্ড অগ্নিময়, দ্রবীভূত ধাতু পাষানাদির মহা সমুদ্র বিশেষ!! পৃথিবী বহুকাল ধরিয়া মহাবেগে শূন্য পথে ছুটিতে ছুটিতে কিয়ৎ পরিমাণে তাপ বিকীর্ণ করিয়াছে। তন্নিবন্ধন তাহার পৃষ্ঠদেশ অপেক্ষাকৃত শীতল দৃঢ় ও প্রাণিবাসযোগ্য হইয়াছে, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ আজিও সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিময় রহিয়াছে!

আমরা এই অগ্নিময় মহাসাগরের উপর ভাষমান কঠিন মৃত্তিকাস্তর অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি কিন্তু আমাদের পদতলে যে কি ভয়ানক ব্যাপার রহিয়াছে তাহা ভাবিলে প্রাণ সিহরিয়া উঠে। এবং যাঁহার করুণাবলে এই অগ্নিসাগরেও আমরা নয়নপ্রীতিকর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছি সেই অনন্ত তেজের আধার ব্রহ্মাণ্ডপতিকে দেখিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

সংপ্রসঙ্গ।

১। জনসনের একটী গল্পে আছে, একজন রাজা তাঁহার ভৃত্যকে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, সে যেন প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহাকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—রাজন্! স্মরণ কর যে তোমার মৃত্যু হইবে!

২। পারস্যরাজ জারাক্‌সিজ্ আপনার বিশ লক্ষ সৈন্য পর্ব্বতের উপর হইতে দেখিয়া এই বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, একশত বৎসরের পরে ইহাদের একজনও জীবিত থাকিবে না।

৩। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ পরম ভাগবত রঘুনাথ দাস ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সুখাভিলাষ, ধনজন গৃহপরিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রিযোগে বারংবার পলায়ন করেন। আর তাঁহার পিতাও তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া সংসার কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিতে চান। পুত্রের এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টে একদা মাতা বলিলেন, পুত্র বাতুল হইয়াছে, ইহাকে বাঁধিয়া রাখ। তখন পিতা বলিলেন, ইন্দ্রের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্য, অপ্সরার ন্যায় রূপলাবণ্যবতী জীবনতোষিণী পতিপরায়ণা রমণী যাহারহৃদয় বান্ধিতে পারিল না, সামান্য রজ্জুর বন্ধনে কি তাহাকে গৃহে রাখিতে পারিবে? সন্তান ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে কে ধরিয়া রাখিবে? বেগবতী স্রোতস্বতী সমুদায় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের উদ্দেশে প্রধাবিত হয়। এইরূপ মানব হৃদয় যখন ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হয়, তখন তাহার নিকটে সংসারের কিছুই ভাল লাগে না; সে সংসারের মায়া মমতা ভয় ভ্রুকুটিকে তুচ্ছ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রেমময়ের উদ্দেশে ধাবিত হইয়া থাকে। সংসার! যে তোমাকে চায়, তুমি তাহারই উপর আধিপত্য করিতে পার। আর যে তোমার সুখে আসক্ত নয়, তুমি তার কি করিতে পার?

৪। যুবরাজ সিদ্ধার্থ জরাব্যাধি শোক তাপসঙ্কুল সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া, সকলকে বিষয়তৃষ্ণার আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রাজভবন পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলে রাজা শুদ্ধোদন আর্ত্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র! তোমার কিসের দুঃখ? কেন তুমি রাজকুল পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে কাঁদাইবে? তুমি যাহাই চাও, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। এই মনোহর কুসুমকানন, পরম রূপবতী ভার্য্যা, বিপুল ঐশ্বর্য্য, তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতনিনাদ, সকলই তোমার চিত্তবিনোদনের জন্য উপস্থিত। বৎস! তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবে, একথা আর মুখে আনিও না। পিতার বিলাপ শুনিয়া বোধিসত্ত্ব শাক্যমুনি বলিলেন, পিতঃ! আমি আপনার নিকট চারিটী বর প্রার্থনা করিতেছি, যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন, আমি গৃহে থাকিব, নতুবা সংসার পরিত্যাগ করিব। আমার অভিলষিত বর এই যে, জরা যেন আমাকে আক্রমণ না করে, শুভ্রবর্ণ যৌবন যেন নিত্যকাল স্থিতি করে, আমি যেন ব্যাধিগ্রস্ত না হই, কখনও আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয়; এবং যেন চিরকাল জীবিত থাকি। পুত্রের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া রাজা দুঃখিত ও শোকাভিভূত হইয়া বলিলেন, পুত্র! আমার এমন শক্তি কোথায় যে তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ করিব? মানব! বাসনাজালে জড়িত হইয়া বৃথা কেন শোক করিতেছ? সংসারে তোমার অধিকার কতটুকু একবার চিন্তা কর।

৫। শুক্রাচার্য্য স্বীয় কন্যা দেবযানীকে কহিলেন, যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে অন্যের তিরস্কার বাক্য উপেক্ষা করেন, এই চরাচর বিশ্ব তাঁহারই আয়ত্ত হয়। সাধু ব্যক্তিরা অশ্বের বল্‌গাধারীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধাবেগকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই সারথি বলিয়া থাকেন। যিনি উদ্রিক্ত ক্রোধা-

গ্নিতে ক্ষমাবারি সেচন করিতে পারেন, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব তাঁহার জয় করা হয়। সর্প যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে সেইরূপ যিনি ক্রোধকে পরিত্যাগ করিতে পারেন জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁহাকে সৎপুরুষ বলিয়া থাকেন। যিনি সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপ প্রদান করেন না, যিনি ক্রোধাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহারই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। শতবর্ষব্যাপী দেবসেবা বা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী অপেক্ষা অক্রোধন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। হে কন্যে! বালক বালিকারা অবিবেকী হইয়া ক্রোধ বশতঃ পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কদাচ এপ্রকার করেন না।

৬। ভোগসুখে একান্ত আসক্তচিত্ত যযাতি রাজা স্বীয় পুত্রকে জরাভার অর্পণ করিয়া সহস্র বৎসর কুসুমগন্ধামোদিত কাননকুঞ্জ ও সুরম্য গিরিশৃঙ্গে বিহার করিয়াও যথার্থ তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া প্রিয়তম পুত্র পুরুকে বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছা ও উৎসাহানুরূপ বিষয় ভোগ করিয়া দেখিলাম কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনার উপশম হয় না, প্রত্যুত ঘৃতপ্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। এই পৃথিবীতে ধন ধান্য হিরণ্য পশু রমণী প্রভৃতি যাহা কিছু উপভোগ্য দ্রব্য আছে, তৎসমুদায় এক ব্যক্তির হস্তগত হইলেও তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, অতএব ভোগতৃষ্ণা পরিহার করাই কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি ব্যক্তিরা যে আশাপাশ ছেদন করিতে পারে না, এবং দেহ জীর্ণ হইলেও যে আশা জীর্ণ হয় না, প্রাণান্তকর রোগস্বরূপ সেই আশাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। আমি ইচ্ছানুরূপ নানা প্রকারে বিষয় সম্ভোগ পূর্ব্বক সহস্র বৎসর অতিবাহন করিলাম। তথাপি আমার বিষয়তৃষ্ণা বর্দ্ধিতই হইতেছে। অতএব আমি এই ভোগলালসাকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পুণ্যারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিব। হে বৎস! তুমি আমার প্রিয়কারী সুশীল পুত্র, তোমার সদ্গুণে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তুমি স্বীয় যৌবন ও মদীয় রাজ্যভার গ্রহণ কর।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

পাণ্ডবেরা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া যখন কাম্যকবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন মহাতপা মহামুনি মার্কণ্ডেয় তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর সমবেত ব্রাহ্মণগণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণ ঋষিসত্তম মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! আমরা আপনার নিকট প্রাচীন ইতিবৃত্ত, রাজা ও ঋষিগণের অনুষ্ঠেয় সদাচার, এবং স্ত্রীলোকদিগের সনাতন ধর্ম্ম ইত্যাদি পুণ্যকথা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

অনন্তর মহামুনি, একদিন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নানা উপাখ্যান সংবলিত ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ণন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, পতিব্রতা মহিলাগণের যথার্থ মাহাত্ম্য ও সূক্ষ্ম ধর্ম্ম কি—তাহা বর্ণন করুন, শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। পতিব্রতা রমণীগণ যে ইন্দ্রিয়নিরোধ ও মনঃসংযম পূর্ব্বক পতিশুশ্রূষা করেন, ইহা আমার নিকট অতিশয় দুষ্কর তপস্যা বলিয়া বোধ হয়। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে ভারত! পতি-

পরায়ণা মহিলার পতিশুশ্রূষা যে দুঃসাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু নারীর পক্ষে পতিশুশ্রূষা ব্যতীত আর কোনও যজ্ঞানুষ্ঠান কি শ্রাদ্ধ কি উপবাস ব্রত কিছুরই প্রয়োজন নাই। একমাত্র পতিসেবা দ্বারা তিনি স্বর্গলোক জয় করিয়া থাকেন। হে রাজন্! কোন পতিপরায়ণার পুণ্য কথা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

কোনও সময়ে কৌশিক নামে একজন বেদজ্ঞ তাপস ব্রাহ্মণ, তরুতলে বিশ্রাম লাভার্থ উপবেশন করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে বৃক্ষের উপর হইতে এক বলাকা ব্রাহ্মণের গাত্রে পুরীষ ত্যাগ করাতে ব্রাহ্মণ রুষ্ট হইয়া কোপদৃষ্টি করিবামাত্র বলাকা মৃত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। বলাকাকে মৃতাবস্থায় দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ শোকসন্তপ্ত হইলেন, এবং হায়! আমি রোষমাৎসর্য্যের অধীন হইয়া একি করিলাম এই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি লোকালয়ে আগমনপূর্ব্বক কোন পূর্ব্বপরিচিত গৃহস্থভবনে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহস্বামিনীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন।

গৃহস্বামিনী সেই সময়ে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। তিনি প্রার্থী ব্রাহ্মণকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ইত্যবসরে ঐ রমণীর স্বামী পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। রমণী আর ভিক্ষা দিবার সময় পাইলেন না, তিনি পতিশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশ্রান্ত পতিকে পাদ্য, আচমনীয় ও আসন প্রদান করিয়া পরে বিবিধ আহার্য্য বস্তু দ্বারা বিনম্রভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এই বরবর্ণিনী ভামিনী নিয়তই ভর্ত্তৃচিত্তানুসারিণী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক স্বামীর ভুক্তাবশেষ ভোজন ও তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, কায়মনোবাক্যে তিনি সততই পতির হিতাভিলাষিণী ছিলেন। তাঁহার চিত্তবৃত্তি-প্রবাহ নিয়ত পতির প্রতিই প্রবাহিত হইত। সদা সদাচারবতী শুচি ও কর্ম্মকুশলা হইয়া পতির হিতানুষ্ঠানে আপনাকে নিয়োজিত রাখিতেন। অথচ ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত রাখিয়া দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, কুটুম্ব এবং শ্বশ্রু ও শ্বশুরেরও নিরন্তর সেবা করিতেন। হে রাজেন্দ্র! এই সাধ্বী, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পতিসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণের কথা স্মরণ হওয়ায় লজ্জিত হইয়া ভিক্ষাপ্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে নারি! তোমার এ কিরূপ আচরণ? তুমি কি ধর্ম্মনিয়ম কিছুই জান না! তখন ব্রাহ্মণকে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত ও তেজে জাজ্জ্বল্যমান দেখিয়া সাধ্বী রমণী বিনয়মধুরবচনে বলিলেন, হে বিপ্র! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, দেখুন স্বামী আমার পরম দেবতা, তিনিও আপনার ন্যায় ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া সমাগত হওয়ায় আমি তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলাম। ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া বলিলেন, ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া তুমি স্বামীর সেবাতে নিযুক্ত হইয়াছ।

"ব্রাহ্মণা ন গরীয়াংসো গরীয়াংস্তে পতিঃ কৃতঃ।
গৃহস্থধর্ম্মে বর্ত্তন্তী ব্রাহ্মণানবমন্যসে॥"

ব্রাহ্মণেরা 'তোমার নিকটে গরীয়ান হইলেন না, পতিই শ্রেষ্ঠ হইলেন। তুমি গৃহস্থধর্ম্ম পালন কর অথচ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা কর? মনুষ্যের কথা কি, দেবতাও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া থাকেন। তুমি কি জাননা যে ব্রাহ্মণেরা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসদৃশ

ক্রোধাগ্নিতে পৃথিবীকেও দগ্ধ করিতে পারেন?

তখন সেই রমণী বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! স্থির হউন, ক্রোধাবেগ সংবরণ করুন, আমি ক্ষুদ্র বলাকা নহি যে কোপদৃষ্টিতে আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। আমি ধর্ম্মনিয়ম অবগত আছি। কুলরমণীর পক্ষে পরিশ্রান্ত স্বামীর সেবা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তৎপরে দেবদ্বিজের অভ্যর্থনা। পতি-সেবায় যে ধর্ম্ম, তাহাতেই আমার অভিরুচি, পতিই আমার পরমদেবতা, আপনার কোপানলে বলাকা যে দগ্ধ হইয়াছে, তাহা আমি পতিশুশ্রূষাবলেই জানিতে পারিয়াছি। হে বিপ্র! আপনি এই ব্যতিক্রম বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন। বিশুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য ও প্রভাবে আমি বিশিষ্ট রূপেই অবগত আছি, তাঁহারা আমার পূজনীয়। মহাত্মাগণের ক্রোধ ও প্রসন্নতা উভয়ই বিপুল। এই বলিয়া সেই পতিপ্রাণা নারী ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিতে লাগিলেন,—

"ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম!
যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তংদেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়-নিরতঃ শুচিঃ।
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চরতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

অর্থাৎ হে দ্বিজোত্তম! ক্রোধ মনুষ্যের শরীরস্থ শত্রু, সেই ক্রোধ এবং তজ্জনিত মোহকে যিনি পরিহার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। এই সংসারে যে ব্যক্তি সত্যবাদী, এবং গুরু জনের সন্তোষ বিধানে তৎপর, যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও শুদ্ধাচার; এবং কাম ও ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যে ধর্ম্মজ্ঞ মনস্বী ব্যক্তি লোকমাত্রকেই আত্মসম জ্ঞান করেন এবং যিনি সকল প্রকার ধর্ম্মের আচরণ করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে দ্বিজসত্তম! এই কএকটীই ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ সাধুরা সত্য ও সরলতাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। শাশ্বত ধর্ম্ম অতিদুর্জ্জেয়, তাহা সত্যেতেই প্রতিষ্ঠিত। হে ব্রহ্মন্! আপনি স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও শুদ্ধাচার হইলেও আমার বিবেচনায় আজিও ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। আপনি ব্রাহ্মণ বলিয়া অহঙ্কৃত হইবেন না, ধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব জানিতে ইচ্ছা করিলে, মিথিলা নগরে এক জন ধর্ম্মব্যাধ আছেন, তাঁহার নিকট গিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা করুন। সেই ব্যক্তি পিতামাতার শুশ্রূষাপরায়ণ এবং সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। হে বিপ্র! আমার এই ধৃষ্টতা আপনি মার্জ্জনা করিবেন, যেহেতু আমি স্ত্রীজাতি; ধর্ম্মলাভার্থীদিগের নিকট স্ত্রীজাতি চিরকালই অবধ্য।

পতিপরায়ণার এইরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত সুমিষ্ট বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া বিপ্র চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, হে শোভনে! আমি তোমার বাক্যে প্রীত হইলাম, তোমার কল্যাণ হউক। আমার ক্রোধ অপগত হইয়াছে, তোমার তিরস্কার বাক্য আমি পরম শ্রেয়ঃসাধন জ্ঞান করিব।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ব্রাহ্মণ এই বলিয়া অনুতাপিতচিত্তে আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে স্বীয়ভবনে প্রস্থান করিলেন।

জৈন গৃহী ও জৈন সন্ন্যাসী। *

জৈন গৃহীদিগকে শ্রাবক বলে। ইহাঁদিগকে নিম্নলিখিত দ্বাদশটি নিয়ম পালন করিতে হয়।—নির্দোষীকে প্রহার করিবে না; মিথ্যাপ্রমাণে ভূমি বা গাভী সম্বন্ধে কাহারও খ্যাতি বা অখ্যাতি করিয়া ধৃষ্টতার পরিচয় দিবে না; অসদাচরণ করিবে না; পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; মধ্যবিত্ত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে; উদ্বৃত্ত অর্থ দানে ব্যয় করিবে; ভ্রমণকালে নির্দ্দিষ্ট দূরতার অধিক যাইবে না; প্রাত্যহিক ভক্ষ্যদ্রব্য সঞ্চয় রাখিয়া চলিবে; যে স্থানে দস্যুর প্রাণদণ্ড হইয়াছে বা যে স্থানে সতীদাহ হইয়াছে, সে স্থানে যাইবে না; প্রতিদিন ধ্যানে কিছুকাল অতিবাহিত করিবে; রাত্রি কালে ভোজন প্রভৃতির কোনও রূপ ইচ্ছা রাখিবে না; এবং শুক্ল পক্ষীয় প্রতিপদ, অষ্টমী চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে যে ভিক্ষুককে প্রথমে দেখিতে পাইবে, তাহাকে ভোজন করাইবে। উপরি-উক্ত এই সমস্ত নিয়ম প্রতিদিন বিশ্রামকালে স্মরণ করিবে এবং তাহা যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়া দেখিবে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত যে ব্যক্তি এই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলেন তিনি ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ এবং পুণ্যবান ব্যক্তিদিগের নিয়ত প্রশংসাবাদ করিবেন; অন্যের বিশেষতঃ শাসনকর্ত্তৃগণের অপযশ রটনা করিবেন না। সম্পদবস্থায় পাণিগ্রহণ করা এবং পাপের ভয়ে সর্ব্বদা ভীত থাকা তাঁহার আবশ্যক। যে স্থানে বাস করিবেন, তথাকার প্রচলিত নিয়ম সকল সম্মান করিয়া চলা তাঁহার শ্রেয়। যাহা লোকে অন্বেষণ করিয়া না লইতে পারে এরূপ নিভৃতস্থানেও নয়, বা যাহা পথিক অনায়াসে জানিতে পারে এরূপ প্রকাশ্য স্থানেও নয়, দুই বা তিনটির অনধিক দ্বার বিশিষ্ট গৃহে তিনি বাস করিবেন; এবং পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা সাধু সংসর্গে থাকিবেন। যেখানে বিদেশীয় সৈন্যেরা থাকে সে স্থানে বাস করা তাঁহার শুভজনক নহে। তিনি আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবেন এবং অবস্থানুযায়ী পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিবেন। সদা সংযত হইয়া থাকা এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন করা তাঁহার আবশ্যক। তিনি ধন-লিপ্সা, ধনোপার্জ্জন ও ধন-সংরক্ষণে নিয়ত ব্যাপৃত হইবেন না; অতিথি, সন্ন্যাসী ও পীড়িত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষায় বিশেষ যত্নবান থাকিবেন; আপনার মত ও বাক্যের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধাবান হওয়া তাঁহার উচিত নহে। তিনি বিদ্যার আদর করিবেন। অকালে কোথাও যাত্রা করা তাঁহার অবিধেয়। তিনি এমন কোনও দেশে যাইবেন না, যে স্থানে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে না পারেন। কে শত্রু কে মিত্র বিচার না করিয়া কাহারও সহিত কলহ করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। তিনি কুটুম্ববর্গের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিবেন; সঞ্চয়ী ও দূরদর্শী এবং হৃদয়ে কৃতজ্ঞ হইবেন; এবং এরূপ ব্যবহার করিবেন, যাহাতে সকলে তাঁহাকে সম্মান করে। তিনি বিনয়ী নম্র, সদালাপী ও সদাচারী হইবেন; সর্ব্বদা পরহিত সাধনে আপনাকে নিয়োজিত রাখিবেন এবং রিপুদমন করিয়া পাঁচ ইন্দ্রিয়কে বিবেকাধীন করিবেন।

* এই প্রবন্ধ আইন আকবরী অবলম্বন করিয়া লিখিত হইল।

জৈনসন্ন্যাসীদিগের দুইশ্রেণী আছে। এক শ্বেতাম্বর, অপর দিগম্বর। দিগম্বরগণ বলেন যে, নারীজাতির মুক্তি নাই। মুক্তি লাভ করিলে কাহারই আর আহারের আবশ্যকতা থাকে না। জৈন সন্ন্যাসী স্ত্রীসঙ্গ দূরে থাকুক, যে স্থানে তাহার কথাও শুনিতে পাওয়া যায়, সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইহাঁরা মিষ্টান্ন, ফল ও মাংস আহার করেন না। এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ন্যায় পাক করিয়া খান না। মধ্যাহ্ণের সময় গৃহস্থের গৃহে যাইয়া শুদ্ধ "ধর্ম্মলভা" এই কথা দুটি বলিয়া দণ্ডায়মান থাকেন। গৃহস্থ যাহা দেন,তাহা গ্রহণ করেন। যাহা পূর্ব্বক্রীত বা কোনও অন্ধকারময় গৃহ হইতে আনীত অথবা গৃহস্থের বা অন্য কোনও ভিক্ষুদিগের জন্য প্রস্তুত সেই খাদ্য দ্রব্য তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া গ্রহণ করেন না। তাঁহাদিগের পানীয় উষ্ণ জল। তাঁহারা রাত্রে পান আহার করেন না। যে গৃহে বাস করেন, তথায় অগ্নি বা প্রদীপ রাখেন না। তাঁহারা কোনও বস্তু তুলিয়া লন না, অপরিচ্ছন্ন না হইলে অঙ্গাদি প্রক্ষালন করেন না; ক্রোধ ও ধনলিপ্সা হইতে সুদূরে থাকেন; মিথ্যা কথা কহেন না; চৌর্য্যবৃত্তি বা জীবহত্যা করেন না; কেবল পরিচ্ছদ ব্যতীত কোনও পার্থিব পদার্থের আদৌ প্রয়োজন রাখেন না। শীতকাল ব্যতীত তিন খণ্ড বস্ত্রে ইহাঁদিগের নির্ব্বাহ হয়। এক খণ্ড কটিবন্ধ একখণ্ড উত্তরীয় এবং একখণ্ড অনাবৃত মস্তকের বন্ধনী। শীত নিবারণের জন্য এইগুলির উপর একখানি গরম কাপড় ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত পাঠকালীন যাহাতে মুখাভ্যন্তরে কোনও কীটপতঙ্গ না প্রবেশ করিতে পারে ও মুখ হইতে নির্গত নিষ্ঠীবনবিন্দু দ্বারা দেহ অপবিত্র না হয়, তজ্জন্য মুখে ও কর্ণকুহরে এক খণ্ড বস্ত্র সংলগ্ন করিয়া দেন। তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বদা একটী "ধর্ম্মধ্বজা" থাকে। ভূতলেই উপবেশন করা তাঁহাদের নিয়ম। সুতরাং পাছে কোনও কীট পতঙ্গ নষ্ট হয় এই ভয়ে পরিষ্কার করিয়া তৎপরে তদুপরি উপবেশন করেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় ইহাঁরাও মস্তকে কেশ রাখেন না। কি গৃহী কি সন্ন্যাসী জৈন মাত্রে মদ্য, মাংস, মধু, মাখন, অহিফেন বহুবীজবিশিষ্ট ফলাদি সেবন করেন না।

হিন্দু সমাজের আন্দোলন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

জনসমাজে সমীক্ষ্যকারিতা ও হঠকারিতা দুএরি আধিপত্য। বরং প্রথমের অপেক্ষা দ্বিতীয়েরই প্রভাব অধিক। একটী অসংযত ইচ্ছাকে দমন করিয়া মনুষ্যকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া দেয়। অপরটী মনুষ্যকে স্বস্বপ্রধান করিয়া সমাজের বিপ্লব ঘটায়। এইরূপে এই দুইটী বস্তু চিরকালই মনুষ্য সমাজকে অধিকার করিয়া আছে। ইহার মধ্যে একের প্রসার ও অন্যের উচ্ছেদের জন্য নানা উপায়ও অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। বিস্তর ব্যবহার শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জনসমাজের হস্তপদ বন্ধন করা হইয়াছে। বহু পূর্ব্বে আমাদের দেশে এই সকল ব্যবহারশাস্ত্র দ্বারা যে কিছু ফল হইয়াছিল আমরা তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সে সময় স্বতন্ত্র ছিল। তখন অজ্ঞানেরই অধিকতর প্রভাব। তখন শাস্ত্রবন্ধন বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু

এখন জ্ঞানোজ্জ্বল কাল। এখনও শাস্ত্রের অদেশকালোচিত বন্ধন স্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে এ কথার অর্থ 'আমরা বুঝিতে পারি না। বলিতে পার বন্ধন না থাকিলে সমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। ইহা খুবই সত্য কিন্তু সেই বন্ধন প্রার্থনীয় হইলেও তাহা নিত্য কাল যে একইরূপ থাকিবে, তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। প্রত্যুত ইহা দ্বারা সমাজদেহে বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। দেখ পূর্ব্বনিয়মে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চ্চা কেবল ভদ্রসমাজেই আবদ্ধ ছিল। সেই বন্ধন ভগ্ন হওয়াতেই আজ আমরা বৃক্ষের পাদদেশেও সৌরভপূর্ণ পুষ্পের বিকাস দেখিতেছি। এখন কে বলিতে পারেন সমাজের নিম্নতম শ্রেণীতে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চ্চা প্রার্থনীয় নয়। ফলত যেখানে বদ্ধভাব সেখানে অবনতি আর যেখানে মুক্তভাব সেইখানেই উন্নতি। এ নিয়মের কখনও ব্যভিচার নাই।

এদেশে শাস্ত্রবন্ধনই যে সমান আধিপত্য করিয়া আসিতেছে তাহাও স্বীকার্য্য নহে। সমাজের বক্ষ ব্যবচ্ছেদ কর দেখিবে শাস্ত্র ব্যতীত ব্যবহারও এখানে যথেষ্ট বলবৎ। কিন্তু এমন মনে করিও না ব্যবহারমাত্রই শাস্ত্রমূলক। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে নিবন্ধকারেরা যেখানে শাস্ত্রের অভাব তথায় ব্যবহার রক্ষার ব্যবস্থা করিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া সকলেরই ব্যবহার যে প্রমাণ হইয়া আসিয়াছে তাহাও নহে। শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছে ধর্ম্ম ও বিশুদ্ধ নীতির অনুমোদিত কার্য্য,—দেশকালোচিত কার্য্য। যদি শাস্ত্রকেই বিচারস্থলে আনয়ন করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যাহা ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শকে এবং দেশকালকে উপেক্ষা করিয়া একটা হঠকারিতা সমর্থন করিতেছে তাহা সম্যক্ অশাস্ত্র। স্বামী দয়ানন্দ এই নিকষে অনেক শাস্ত্রকে একপ্রকার অপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন এবং নিবন্ধকারেরাও কোন কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। সুতরাং ইহা দ্বারা এই কথাই প্রতিপন্ন হয় শাস্ত্রই বল আর ব্যবহারই বল যাহা ধর্ম্ম ও নীতির উচ্চ আদর্শে প্রবর্ত্তিত এবং দেশকালোচিত তদ্দারাই জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয়। এখন এদেশে বিদ্যা বুদ্ধি ও ধর্ম্মের যথেষ্ট অনুশীলন হইতেছে। অনেকেই প্রকৃত চিন্তাশীল। সমাজতত্ত্ব অনেকেই বুঝিতে সক্ষম। এ অবস্থায় মান্ধাতার আমলের বন্ধন যাহা বর্ত্তমান কালের সম্পূর্ণ অযোগ্য তাহা আর শোভা পায় না। ধর্ম্ম ও নীতির বলবত্তা স্বীকার করিয়া তাহার নামে সমাজবন্ধন আবশ্যক এবং দেশকালকে রক্ষা করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তবেই সমাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে এবং হঠকারিতারও উচ্ছেদ হইবে।

সর্ব্বত্রই দেখা যায় সমাজে শ্রেষ্ঠ লোকেরই আধিপত্য। তাঁহার ব্যবহার অন্যের অনুকরণীয়। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন অন্যে তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অন্য কোন বিষয়ে এইরূপ গতানুগতিকতার প্রবর্ত্তন শ্রেয়স্কর না হইলেও সমাজ সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। সমাজনিয়ম সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলপ্রসূ। আর এই নিয়ম অবধারণ করাও যার তার কর্ম্ম নহে। ইহাতে ধর্ম্মবুদ্ধি নৈতিক জ্ঞান বহুদর্শিতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণের প্রয়োজন। ফলত এই সমস্ত মনুষ্যোচিত গুণ যাঁহাদের আছে আবহমান কাল তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন।

আর তাঁহারাই সমাজের ব্যবস্থাপক। সমাজ সম্বন্ধে ইহাঁরা যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। বিবেকবলহীন অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের তাহাতেই মস্তক অবনত করা আবশ্যক। নচেৎ সমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। যে যাহা আপনার সুবিধাজনক বুঝে কার্য্যে তাহাই পরিণত করিতে গেলে সমাজের কোন বন্ধনই থাকে না। আমার এক প্রকার অন্যের আর এক প্রকার; এই প্রকার ভেদে সামাজিক কোন একটী নিয়মই দাঁড়ায় না। ইহাকেই বলে বিশৃঙ্খলতা ও সর্ব্ববিলোপ। এই উচ্ছেদ দশা হইতে সমাজকে রক্ষা করা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

কিন্তু এখন যেরূপ সময় তাহাতে ইহার উপায় নির্দ্ধারণ করা সহজ কথা নয়। এখন শাসনদণ্ড ভিন্নজাতীয় ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর হস্তে। আমাদের কিসে ভাল কিসে মন্দ হয় তাহা তাঁহারা বুঝেন না এবং বুঝিবার শক্তিও নাই। বিশেষতঃ তাঁহাদের দ্বারে অপরাপর বিষয়ের ন্যায় সামাজিক স্বাধীনতা বিক্রয় করাও যুক্তিসিদ্ধ নয়। তবে একটী উপায় আছে এবং তাহা আমাদেরই সম্যক্ আয়ত্ত। ব্যাপককাল হইতে এদেশে একটা প্রবল সমাজশক্তি ছিল। তাহার মূল ভিত্তি ধর্ম্ম ও নীতি। যিনি ইহার ব্যতিক্রম করিতেন সেই শক্তি তাঁহাকে আক্রমণ করিত। সমাজের হীন ও মলিন অবস্থায় সেই শক্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানের দলাদলি তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে আবার সেই শক্তিকে জাগ্রত করা আবশ্যক। শ্রেষ্ঠ লোকেরা সমাজের পক্ষে যাহা পথ্য ও হিতকর বুঝিবেন অন্যকে তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। ইহার অন্যথায় শক্তি সঞ্চালনের ব্যবস্থা। শ্রেষ্ঠ লোকেরা সেই ব্যতিক্রমীর পক্ষে যাহা সাধু ও যোগ্য বিবেচনা করিবেন সমস্ত সমাজকে তাহার অনুমোদন করিতে হইবে। ফলত সর্ব্ব প্রকার আদান আদান বন্ধ করাই ইহার প্রকৃত দণ্ড। এইরূপে ধর্ম্ম ও নীতির উচ্চ আদর্শে যদি সমাজবন্ধনের সূত্রপাত করা যায় এবং যে হঠকারী ব্যক্তি ধর্ম্ম ও নীতি এবং দেশকালকে উপেক্ষা করিবে তাহার সহিত যদি সেই সমাজের কোনও সংশ্রব না থাকে তবে কালসহকারে তাহা নিশ্চয় একটী আদর্শসমাজ হইবে। এবং তদ্দ্বারা প্রভূত পরিমাণে দেশের কল্যাণ সাধিত হইতে থাকিবে।

সুখের বিষয় এই মহানগরীতে এক ধর্ম্ম মহামণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে। দেশের শ্রেষ্ঠ লোকদিগেরই ইহাতে যোগ। যদি নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশের সেবা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, সমাজবক্ষ হইতে বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জনা দূর করা এবং সর্ব্বহিতকর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে এ দেশের প্রভূত কল্যাণেরই সম্ভাবনা। চিরনিদ্রিত বলিয়া হিন্দুসমাজের বক্ষে একটী কালিমা আছে। যদি তাঁহারা দেশকালকে সম্মুখে রাখিয়া ধর্ম্মের নামে আবার ইহাঁকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারেন ঈশ্বর তাঁহাদের নিশ্চয়ই মঙ্গল করিবেন।

সমালোচনা।

সংস্কৃত চন্দ্রিকা ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা।

চন্দ্রিকা দ্বিতীয় বর্ষে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। ইহাতে বিশুদ্ধ রীতিতে লিখিত সংস্কৃত ভাষার প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া সংস্কৃতব্যবসায়িদিগের উপকার সাধিত হইতেছে। এই

পত্রের উন্নতি দেখিয়া আমরা সংস্কৃত চর্চ্চার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, মনে করিয়া আনন্দানুভব করিতেছি। ঐ চর্চ্চাই দেশের প্রভূত মঙ্গলের নিদানভূত, যেহেতু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অমূল্য শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া বিজাতীয় শিক্ষার দোষ কথঞ্চিৎ নিরাকৃত হইতে পারে ও তদ্দ্বারা লোকের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা।

জ্যোতি ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা।

এই নূতন পত্রখানি পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। ইহাতে জীবন চরিত্র পুরাতত্ত্ব আখ্যায়িকা চরিত্র বিশ্লেষণ বিজ্ঞান মাহাত্ম্য প্রভৃতি কতিপয় সুচারু প্রবন্ধ প্রকটিত আছে। প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য হৃদয়গ্রাহী। আমরা ভরসা করি 'জ্যোতি' নবীন জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে "দিব্য পথে" লইয়া গিয়া দিন দিন সন্তোষ দান করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় শুক্রবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর দ্বাচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

১ আষাঢ়
১৮১৬ শক, } শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী নিয়োগ।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা)
„ শ্রীনাথ মিত্র।
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল।
শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ট্রষ্টী।
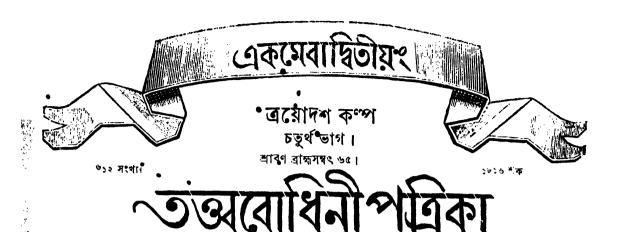
ত্রয়োদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৫।
৬১২ সংখ্যা ১৮১৬ শক
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।*

অর্দ্ধ শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ এই বঙ্গদেশে প্রথম নিহিত হয়। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অজেয় পরাক্রম সকল ধর্ম্ম ও সকল জাতির ভিতরে এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ বিপুল উদ্যমে কার্য্য করিয়াছে, তাহা মনোযোগের সহিত দেখিলে এককালে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। যখন ইংরাজি শিক্ষার স্রোত এদেশে প্রথম বহমান হইতে আরম্ভ হইল, জ্ঞানালোকে অন্তর্দ্দেশ আলোকিত হইল, জ্ঞানভাণ্ডার বেদ বেদান্তের শিক্ষার স্থান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শন ও জ্যোতিষের আলোচনা সম্যক অধিকার করিয়া লইল, সেই সময়ে আত্মার অন্ন সত্যধর্ম্ম পাইবার জন্য শিক্ষিত দলের মধ্যে এক মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। তৎকালে প্রচলিত ধর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার কাহারও ইচ্ছা নাই, অবসর নাই, তাঁহারা ধর্ম্মের বাহ্য পরিচ্ছদ দেখিয়াই এককালে তন্ত্র মন্ত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, আড়ম্বরের আধিক্যে নিতান্ত অধীর, কেহ বা খৃষ্টধর্ম্মকে অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ ভাবিয়া তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত; সে সময়ে এমন কেহ ছিল না, যে ধর্ম্মের দেহে ব্যাপক কাল হইতে সঞ্চিত ভস্মরাশি অপসারিত করিয়া তাহার স্বর্গীয় অগ্নি, দিব্য জ্যোতি প্রকৃতরূপ দেখাইয়া দেয়; প্রচলিত ধর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে নিরাশা যখন পূর্ণ ভাবে শিক্ষিত দলকে সন্ত্রস্ত ও ভীত করিয়া তুলিয়াছে, ঠিক এই অবসরে রামমোহন রায় ঐন্দ্রজালিক দণ্ডহস্তে সাধারণের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। যদিও এই ঘটনা বহুকালের নয়, তথাপি এই স্বল্প দিনের মধ্যে তিনি আমারদের দেশে যে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উন্নতির এক সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিবার জন্য হয়ত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণির দুই চারি শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতের সৌভাগ্যে শিক্ষার সমধিক বিস্তারে সে উন্নতিমঞ্চে আরোহণ করিতে পূর্ণ এক শতাব্দীর চতুর্থাংশই পর্য্যাপ্ত। কিন্তু এই যে উন্নতির বিষয় বলিলাম ৫০

* ভবানীপুর সাম্বৎসরিক মহোৎসবে বিবৃত।

বৎসর পূর্ব্বে তাহার কিছুই ছিলনা, ক্রমশঃ মোহমেঘ—নিবিড় নৈশ অন্ধকার অপসারিত হইতেছিল বটে, কিন্তু মধ্যাহ্নের এই দিবালোকে বসিয়া সে সময়ের ছবি কল্পনার চক্ষে আনয়ন করা সহজ নহে।

রামমোহন রায় কি করিলেন, তিনি প্রচলিত ধর্ম্মে সঞ্চিত ভস্মরাশি ঐন্দ্রজালিক দণ্ডে অপসারিত করিয়া দিয়া, ধর্ম্মের এমন এক মনোহর সৌন্দর্য্য শান্তিপ্রদ জ্যোৎস্না বিস্তার করিলেন, যে সুশিক্ষিত লোকের দৃষ্টি সেই দিকে নিপতিত হইল, একেশ্বরবাদের সুশীতল ছায়া সম্ভোগ করিবার জন্য সকলেই লালায়িত হইলেন। খৃষ্টধর্ম্মের চক্র নাস্তিকতার চক্র যাহা পদ্মার ঘোর আবর্ত্তের ন্যায় বিশাল পরিধিতে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদন করিয়াছিল, তাহা জন্মের মত মন্ত্রশক্তিতে অকৃতকার্য্য হইয়া পড়িল। বলিতে কি রামমোহন যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার কিছুকাল বিলম্ব ঘটিলে শিক্ষিত দলকে আর পাইতাম না। এ দেশেও মান্দ্রাজের ন্যায় এক বিশাল খৃষ্টীয় সমাজ খৃষ্টীয় সম্প্রদায় গঠিত দেখিয়া শিরে করাঘাত করিতে হইত। যদি দেশের উপর আস্থা থাকে, সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রতি তোমার অনুরাগ থাকে তবে রামমোহন রায়ের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য তোমার হৃদয় কাঁদিবেই কাঁদিবে। বেদ বেদান্ত উপনিষদ ত বঙ্গদেশ হইতে এক প্রকার নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, রামমোহনই তাহাদিগকে আবার আনয়ন করিয়া,তাহার উপরেই প্রকৃত আড়ম্বরশূন্য ধর্ম্মের ভিত্তি নিখাত করিলেন। তিনি দেখিলেন আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবহারিক ধর্ম্ম যাহা সুনিপুণ হস্তে পুরাণতন্ত্রের প্রতিপত্র রচিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা জ্ঞানোন্নত অধিকারীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে না, তাহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, এই জন্যই তিনি তদুপরি কোনরূপ বিদ্বেষ প্রচার না করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টি করিলেন যেখানে সকল লোক সকল জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সত্যের সেবা ঈশ্বরের সেবা করিতে পারিবে। ইহা তাঁহার সামান্য মহত্ত্বের পরিচয় নহে।

ভারত ধর্ম্মসম্বন্ধে চির সৌভাগ্যশালী হইলেও, রাজনৈতিক সৌভাগ্য উপভোগ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ইতিহাসের অতীত সময়ে ভারতের সৌভাগ্যরবি উন্নত গগনে আরোহণ করিয়া পরে অস্তমিত হইয়া যায়। এই সময়েই শিল্প সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞানের যে কিছু উন্নতি সকলই সংসাধিত হয়। তাহার পর হইতে ক্রমিকই পরাধীনতা এদেশের মর্ম্মেমর্ম্মে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। পরাধীনতা যে, সকল প্রকার উন্নতির চিরশত্রু তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। অধীনতার কঠিন নিগড়ে আমারদের হস্ত পদ আবদ্ধ, কিন্তু আত্মার স্বাধীনতার উপরে তাহার সকল বন্ধন ব্যর্থ হইয়াছে। এই কারণে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন, তাহা প্রকৃত পথে বা বিপথেই হউক, তাহার বিরাম হয় নাই। ধর্ম্মভাবকে আমাদিগের মধ্যে বদ্ধমূল করিবার জন্য এক সময় কি বিপুল আয়োজনের না সংস্থান হইয়াছিল। ধর্ম্মভাবকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য শক্তির উপাসনা বাঁহুল্য রূপে আমারদের মধ্যে স্থান পাইল। পুণ্যসলিলা গঙ্গা হিমালয়ের বক্ষ বিদারিত করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ভাসাইয়া মহাসাগরের অভিমুখীন হইয়াছে। গঙ্গা ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ, সুতরাং গঙ্গাই আমারদের

পূজনীয় আমারদের স্তবনীয়। এইরূপে যেমন একদিকে শক্তির পূজা আরম্ভ হইল, তেমনি ঈশ্বরের সত্ত্বাতে নিখিল ভুবন পরিপূরিত দেখিয়া শিলাপাষাণ ধাতব ও মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে তাঁহার উপাসনা চলিতে থাকিল। প্রতিমায় আত্মবৎ পূজা প্রবর্ত্তিত হইল। তাহার উপরে বামাচার বীরাচার প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ প্রহেলিকা-পূর্ণ তন্ত্রকে আরও বিভীষিকাময় করিয়া তুলিল। ফলত প্রকৃত অধিকারীর দুর্দ্দশা দেখিয়া শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মে যতই ব্যবহারিক আকার প্রদান করিতে লাগিলেন, ততই তাহার স্বর্গীয় মূর্ত্তি ম্লানতর ভাব ধারণ করিতে লাগিল। এখন শিক্ষা প্রচার হইতেছে, সভ্যতা বিস্তার হইতেছে। সুশিক্ষিত! এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি তোমার ধর্ম্ম, যাহার জন্য হিন্দুর এত মহত্ত্ব। তুমি প্রত্যুত্তরে অমনি বলিবে আমারদিগের মধ্যে গীতা আছে, মহাভারত আছে, শ্রীমদ্ভাগবৎ আছে, সর্ব্বোপরি উপনিষদ আছে, যাহা জগতে অতুলনীয়। আমরাও তাহাই বলিতেছি, কিন্তু কাহার প্রসাদে তুমি গীতা ভাগবৎ প্রভৃতি পুস্তক পাঠে অনুরাগী হইলে, কে তোমাকে তান্ত্রিক প্রহেলিকা হইতে বেদ-বেদান্ত গীতা উপনিষদের দিকে ফিরাইল, কে তোমাকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিল। সুশিক্ষিত! যদি তুমি সরল মনে স্বীকার কর তবে অবশ্যই বলিবে যে রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মধর্ম্ম। তুমি এই যে শক্তিপূজা করিতে গিয়া মূলশক্তি পূর্ণপুরুষের প্রতি উদাসীন হইয়া চাহিয়াছিলে, কে তোমাকে সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিল, তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই যে মৃৎ পাষাণাদি মূর্ত্তিতে ঈশ্বরের বহুত্ব স্থাপন করিয়া তাঁহার একত্বে বিশ্বাস প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছিলে এ সঙ্কট অবস্থায় কে তোমাকে জাগ্রত করিয়া দিল, তোমায় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ব্রহ্মধর্ম্ম। এই যে বাহ্য উপচারে পূজা লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলে, কে তোমাকে এই বাক্যে সচকিত করিয়া দিল, "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" "আত্মন্যেব আত্মানং পশ্য" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, আত্মার মধ্যে তাঁহার উজ্জ্বলপ্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিতে অভ্যাস কর, তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে ব্রাহ্মধর্ম্ম। রামমোহন কিছু কোন ধর্ম্মের আবিষ্কারক বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন না, স্পর্দ্ধা করিলেও আবিষ্কারকের সম্মান তিনি পাইতেন না। তাঁহার কার্য্য আমাদিগকে সমনস্ক করা, প্রাচীন শাস্ত্র সম্বন্ধে সাধনের সন্ধান সত্যের পথ বলিয়া দেওয়া। আমরা তাঁহারই ইঙ্গিতে আমারদিগের গন্তব্য পথ স্থির করিয়াছি এবং বুঝিতেছি যে তাঁহার ন্যায় কাণ্ডারী না পাইলে, ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় যন্ত্র না পাইলে, আমারদের দূরতর ভবিষ্যত অমানিশার ঘোর অন্ধকারে প্রোথিত থাকিত। ইহারই জন্য রামমোহন রায়ের নিকট এবং ব্রাহ্মসমাজের নিকট সাধারণের কৃতজ্ঞ হওয়া যার পর নাই কর্ত্তব্য। আজ কাল এই যে শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এবং প্রক্ষেপবাদ লইয়া নানা পুস্তক বাহির হইতেছে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার অন্যতম কারণ। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের কৃপায় ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছি, যখন প্রচলিত শাস্ত্রার্থের সহিত তাহার একতা দেখিতে না পাই, তখনই তাহার গম্ভীরতম অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা আইসে; এবং অংশ বিশেষ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমানে যুক্তিরই

প্রধান্য স্থাপিত হইতেছে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যখন রামমোহন রায়ের শুভাভিপ্রায়ের সহিত আমাদের কোন অংশে বিরোধ নাই, তখন ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে কেন না আমরা বদ্ধপরিকর হই। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছু নূতন ধর্ম্ম নহে যে ইহা দ্বারা স্বধর্ম্ম বিনাশের আপত্তি বর্ত্তিতে পারে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি যখন সৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য, ঈশ্বরের সুমহান সংকল্প, তখন কেন না আমরা সকল হৃদয়ের সহিত এ শুভ অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী হইব। যদি জ্ঞান বিজ্ঞানে কৃতার্থ হইয়া ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরে বিতৃষ্ণ হও, তবে এই অত্যুজ্জ্বল ধর্ম্মভূষণে আপনাকে অলঙ্কৃত কর, যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হইবে, আত্মার ক্ষুধা বিদূরিত হইবে, প্রাণের পিপাসা শান্তি হইবে। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে দূরে আসিয়া এই জীবন অতি বাহিত করিও না। কাব্য সাহিত্যের রস ত আস্বাদন করিয়াছ, কিন্তু একবার সত্য ধর্ম্মের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া দেখ, দেখিবে কি স্বর্গীয় পবিত্রতা কি অনুপম মাধুর্য্য ইহাতে চির নিহিত রহিয়াছে। এমন স্বাধীন আত্মা লাভ করিয়া চিরজীবন তাহাকে অনুর্ব্বর উশর ক্ষেত্র করিয়া রাখিও না, প্রথম বয়স হইতেই তাহাতে শ্রদ্ধাভক্তির বীজ নিহিত কর, তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে মৃত্যুকে সম্মুখীন দেখিয়া নির্ভীক হইবে। যদি ব্রাহ্মসমাজের দোষ দৃষ্টে ভীত হইয়া থাক তথাপি পলায়ন করিও না, ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্দেশ সমীতরুর ন্যায় সারবান জানিও। বাহ্য আকারে দোষ দেখিলে সংশোধনে ধৃতব্রত হও, ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্ব্বাহ্য তুল্যরূপে পবিত্র রাখিয়া সত্যের পথে ঈশ্বরের পথে ক্রমিকই অগ্রসর হও। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অবসর ছাড়িয়া দিলে এক মহাবিনাশ আমাদের দেশের জন্য অপেক্ষা করিবে। ঈশ্বর যখন এপথের কাণ্ডারী তিনি যখন নিজে ইহার পথপ্রদর্শক তখন ভয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া নূতন মত প্রচার বা ব্রাহ্ম বলিয়া এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করা আমারদের উদ্দেশ্য নহে। প্রচারের জন্য যদি বা এ নামের আবশ্যক, কিন্তু আমরা সে নামের জন্য তত লালায়িত নহি। যখন সমুদয় ভারতে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন কোটি কোটি কণ্ঠ সমস্বরে ওঁকার মহাশব্দ গায়ত্রীছন্দে গাহিতে থাকিবে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুজাতির মধ্যে মিশাইয়া যাইবে, ব্রাহ্ম নামের স্বতন্ত্র সত্বা আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এইরূপে কার্য্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সিদ্ধিদাতা কৃপা করিয়া আমাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ করুন।

পুরাকল্প।

পুরাকল্প শব্দটী ইতিবৃত্তবাচী। সুতরাং বুঝিতে হইবে, এই প্রবন্ধে কেবল প্রাচীন বস্তুই আলোচিত হইবে, অন্য কিছু আলোচিত হইবে না। অপিচ, আজ্ কাল যাহা সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া পরিচিত, দৃষ্টান্ত ভাবেই হউক, আর অন্য কোন প্রসঙ্গেই হউক, বেদ মধ্যে সে সকলের কি পর্য্যন্ত উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাই এই পুরাকল্প প্রবন্ধের আলোচ্য বা অনুসন্ধেয়।

বৈদিক সময়ে এ দেশের লোক সকল সভ্য কি অর্দ্ধসভ্য কি অসভ্য ছিল, এ দেশের অবস্থাই বা কিরূপ ছিল, সে সকল জানিবার জন্য অনেকেরই অনেক সময়ে কৌতুক জন্মিতে দেখা যায়। যদি এই পুরাকল্প নামক প্রবন্ধ সে কৌতুক অল্প-

মাত্রও চরিতার্থ করিতে পারে তাহা হইলে প্রবন্ধ-লেখক শ্রম সফল বোধ করিবেন।

যে সময়ে বৈদিক সমাজ সংগঠিত হইয়াছিল, তখন ও তৎপূর্ব্বে লোক সকল যে কিছুমাত্র বিদ্যাশিল্পাদিসম্পন্ন ছিল না, পশুকল্পই ছিল, অনুসন্ধানে তাহা পাওয়া যায় না। প্রত্যুত প্রাচীনতম ঋগ্বেদের মধ্যে দৃষ্টান্ত বিধায় রূপক ভাবে অসংখ্য প্রকার সভ্য কালের উপযোগী বস্তুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মনুষ্য জাতির মধ্যে একটী সার্ব্বভৌমিক স্বভাব সন্নিবিষ্ট আছে। যথা—মানুষ প্রথমে কেবলমাত্র অন্ন ও আচ্ছাদন কামনা করে, তাহা আয়ত্ত ও সুসাধ্য হইলে পুত্র-কলত্রাদি-সুখ আকাঙ্ক্ষা করে, অনন্তর বাসোপযোগী গৃহাদির অভিলাষী হয়। অভিহিত ত্রিতয়ের পর অল্পে অল্পে সুখবৃদ্ধির আশা উদিত হয়, সুখবৃদ্ধির আশা বলবতী হইলেই মনুষ্য অলংবুদ্ধি বিধুর হইয়া নানা প্রকার উদ্যম অবলম্বন করে। সেই সেই উদ্যমের ফল বিদ্যা, বিনয় ও শিল্পাদি এবং তাহারই অন্য নাম সভ্যতা। এ ক্রম স্বাভাবিক, অন্যথা বা নিবারণ করিবার কাহার সাধ্য নাই। এক দিকে ঐ সার্ব্বভৌমিক মনুষ্যস্বভাব, অপর দিকে তৎপ্রভব কার্য্যবৃন্দ, উভয়েই প্রবাহ নিয়মে চলিতে থাকে, অন্যথা হয় না। আমরা যাহাকে বেদ বলি, তাহাও তদন্তর্গত। এই অবস্থায় কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, অর্থব্যবহার, রাজা ও রাজকীয় ব্যবস্থা, গ্রাম, নগর ও পুরী প্রভৃতি, গান, বাদ্য নৃত্য প্রভৃতি; সর্ব্বশেষে অক্ষরশিল্প ও গ্রন্থনির্ম্মাণ অল্পে অল্পে দেখা দিতে থাকে। সমস্তই উদ্যমের ফল এবং সমস্তই সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। যতই মনুষ্যের উদ্যম বৃদ্ধি পায় ততই ঐ সকল উৎকর্ষ সোপানে আরোহণ করে। বাক্‌শক্তির উৎকর্ষ হইলে তজ্জাত ভাষা বৃদ্ধি পায়, পরে অক্ষরসৃষ্টি হয়, তৎপর তদ্দারা আবশ্যকীয় গ্রন্থরাশি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা উচিত যে, গ্রন্থ দৃষ্টে গ্রন্থোৎপত্তির অনেক পূর্ব্বের বৃত্তান্ত জানা যাইতে পারে। সে অনুসারে, যে সময়ে এদেশে বেদ গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল, সে সময়ের পূর্ব্বের—বহু পূর্ব্বের—অনেকগুলি বৃত্তান্ত অবশ্যই বেদ দৃষ্টে জানা যাইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাউক, বেদ দৃষ্টে পূর্ব্বকালের কি কি অবস্থা জানা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের তৃতীয় অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে একটী মন্ত্র আছে—

"শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্।"

অর্থ—বাহাঃ বলীবর্দ্দাঃ শুনং সুখং যথা স্যাৎ তথা ভারং বহন্তু। নর ইতি নৃশব্দস্য প্রথমাবহুবচনরূপম্। কর্ষুকা নরাঃ শুনং যথা স্যাৎ তথা কৃষিং কুর্ব্বন্তু। লাঙ্গলং নাম অয়োমুখং ভূমিদারকং কাষ্ঠং কৃষতু ভূমিং বিদারয়তু।

বলীবর্দ্দ সকল সুখে ভার বহন করুক, কৃষক মনুষ্যেরা সুখে কৃষিকার্য্য করুক, লাঙ্গল ভূমি খনন করুক।

ঐ বেদের প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে আর একটী মন্ত্র আছে।

"স্যোনা পৃথিবি ভবা নৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছা নঃ শর্ম্ম সপ্রথ।"

অর্থ—হে পৃথিবি! ত্বং অস্মান্ প্রতি স্যোনা শিবা অনৃক্ষরা নিষ্কণ্টকা নিবেশনী স্থানপ্রদা চ ভব। কিঞ্চ নোঽস্মভ্যং সপ্রথ বিশালং শর্ম্ম গৃহং যচ্ছ দেহীত্যর্থঃ।

পৃথিবি! তুমি আমাদের জন্য নিষ্কণ্টক হও, বাসস্থান প্রদান কর, এবং বিশাল বাস-গৃহ প্রদান কর।

এই দুই শ্লোক দেখিলেই মনে হয়, ঐ সময়ের লোকেরা কৃষিকার্য্য ও তদুপযোগী উপকরণ বিষয়ে (কৃষিবিদ্যায়) অভিজ্ঞ ছিল এবং ধান্যাদি শস্য উৎপাদন করতঃ নদীসন্নিহিত অথবা পর্ব্বতসন্নিহিত ভূভাগে গ্রাম নগরাদি ব্যবস্থায় গৃহ নি-

র্ম্মাণ করতঃ বসতি করিত। অপিচ, সকলেই যে কৃষিকার্য্য করিত তাঁহা নহে। পূর্ব্বেও এখনকার ন্যায় কতক অংশ লোক কৃষিকার্য্য করিত। বৈদিক সময়ে এবং বৈদিক সময়ের পূর্ব্বে গ্রাম, নগর, পুরী, এ সকল সভ্যোচিত ব্যবস্থা ছিল না, এমন মনে করা যায় না। কারণ, বেদের শত শত স্থানে ঐ সকলের অর্থাৎ পুর গ্রামাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো ব্যাস্যৎ।
দিবোদাসায় দাশুষে।"

ঋ, ৩ অষ্টক, ৬ অং।

অর্থ—অশ্মময়ীনাং প্রস্তরনির্ম্মিতানাং পুরাং নগরীণাং শতং দিবোদাসায় দিবোদাসনাম্নে দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে স্বরাজকায়েতি যাবৎ। ইন্দ্রঃ ব্যাস্যৎ দত্তবান্।

ইন্দ্র আপনার পূজক দিবোদাসকে এক শত প্রস্তররচিত পুরী প্রদান করিয়াছিলেন।

"ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতিম্।
যাথা নঃ শমসৎ দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ অনাতুরম্॥" *

অর্থ—নঃ অস্মাকং দ্বিপদে মনুষ্যবর্গায় ভার্য্যাপুত্রাদিরূপায় চতুষ্পদে পশুবর্গায় গবাশ্বাদিরূপায় চ শং সুখং অসৎ স্যাৎ। কিঞ্চ অস্মিন্ গ্রামে বিশ্বং সর্ব্বং প্রাণিজাতং পুষ্টং সুখপূর্ণং অনাতুরাং উপদ্রবরহিতং চ যথা ভবেৎ তথা বয়ং রুদ্রায় দেবায় ইমাং মতিং পূজাধ্যানাদিবিষয়াং বুদ্ধিং প্রভরামহে প্রকর্ষেণ পোষয়ামঃ। কীদৃশায় রুদ্রায় তবসে বলবতে কপর্দ্দিনে জটাবন্ধযুক্তায় তাপসায় এব ক্ষয়দ্বীরায় ক্ষীয়মাণপ্রতিপক্ষায়।

মনুষ্যবর্গের ও পশুবর্গের সুখ হউক। এই গ্রামের সমুদয় প্রাণিনিকায় রুদ্রদেবের পূজায় নিবিষ্টচিত্ত থাকুক। রুদ্রদেব জটাধারী, বলবান এবং শত্রুবিনাশী।

এইরূপ বেদমন্ত্র তৎকালে ও তৎপূর্ব্বকালে গ্রাম নগরাদির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে সমর্থ। আবসথ, গ্রাম, নগর, পুরী, জনপদ, এ সকল ব্যবস্থা অসভ্য অবস্থায় হয় না। মনুষ্য যাবৎ সভ্য পদবী আরোহণ না করে তাবৎ তাহারা গ্রাম নগরাদি বিভাগ ক্রমে বাস করিতে পারে না। আরও কথা এই যে, অতি প্রাচীন কালের লোকেরা প্রস্তর গৃহাদি নির্ম্মাণের উপযোগী উত্তম শিল্প জ্ঞাত ছিল। প্রস্তরচ্ছেদন করিবার উপযুক্ত টঙ্ক নামক যন্ত্র (পাষাণ বিদারক যন্ত্র) এ দেশের বহু পুরাতন। কৃষিবিদ্যা ও তদুপযোগী শিল্প তৎকালে কাহারও অবিদিত ছিল না।

যানারোহণে গমনাগমন করাও সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ। এ অঙ্গটীও বেদমধ্যে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। যথা—

"তক্ষন্ নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথম্।"

(ঋগ্বেদ, ১ অষ্টক, ২ অং।

অর্থ—অশ্বিনীকুমারার্থং ঋভবঃ সুখং সুখকারকং পরিজ্মানং সর্ব্বতঃ সঞ্চরণক্ষমং রথং তক্ষন্ নির্ম্মিতবন্তঃ।

দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের নিমিত্ত দেবতারা সুখকর ও সর্ব্বস্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে এরূপ রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

রথশব্দ যানবাচী। রথের বিভাগ ত্রিবিধ। দেবরথ, যুদ্ধরথ, ও মনুষ্যরথ। দেবরথ স্বতন্ত্র যুদ্ধরথও স্বতন্ত্র এবং মনুষ্যরথও পৃথক্। দেবরথের নমুনা রথযাত্রায় দেখা যায়। যুদ্ধরথ এখন নাই। যুদ্ধরথের নাম স্যন্দন, তাহা এক্ষণে লুপ্ত। মনুষ্য রথ এক্ষণে গাড়ী নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। এ সকল বিভাগ শুক্রনীতি গ্রন্থে লিখিত আছে এবং ঐ সকল রথের আকার প্রকার ও নির্ম্মাণ পদ্ধতিও অভিহিত আছে। সে সকল আলোচনা করিলে প্রতীত হয়, সে কালের মনুষ্য রথ আর এ কালের পশ্চিম দেশ প্রচলিত একা গাড়ী সমান।

ক্রমপ্রকাশ্য।

* এই মন্ত্রই পুরাণোক্ত মহাদেবের বর্ণনার বীজ!

হরিদাস ঠাকুর

(১)

হরিদাস ঠাকুরের জীবন অতি বিস্ময়া বহু অদ্ভুত ঘটনাপুঞ্জে পরিপূর্ণ। চৈতন্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে ইনি সর্ব্বদা ভগবানের নামরসাস্বাদন করিতেন এবং জীবের পরিত্রাণের জন্য গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহা ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেন। এই সময়ে বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। কবি বৃন্দাবন দাস এইরূপে তাহা বর্ণনা করিতেছেন,—

"হরি নাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পাতুলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।
ধনকষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥
* * নাবামানে যুগধর্ম্ম হরির কীর্ত্তন।
দোষবিনা গুণ কার না করে গ্রহণ॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তাসবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতিবড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমনে এ জীবসব হইবে উদ্ধার।
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার॥"

চৈতন্য ভাগবত।

শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য্য ও নবদ্বীপের শ্রীবাস প্রভৃতি যে কএক জন ভক্ত তৎকালে নবদ্বীপে বাস করিতেন, তাঁহারা সংসারের এই ধর্ম্মহীন অবস্থা চিন্তা করিয়া অতি বিষণ্ণ হৃদয়ে শ্রীবাসের গৃহে নিশাকালে একত্র হইয়া নানাবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেন। তাঁহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে দেখিয়া ধর্ম্মদ্বেষী পাষণ্ডগণ নানা প্রকারে ঘৃণা উপহাস ও ভয়প্রদর্শন করিত। ইহার কিছু দিন পরে ১৪০৭ শকে শ্রীমচ্চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর চৈতন্যদেব যখন ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া বঙ্গদেশে আচণ্ডালে ভগবানের নাম প্রচার করেন, তখন নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ সহ হরিদাসও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইহার পরই ইনি বঙ্গদেশে "হরিদাস ঠাকুর" নামে প্রসিদ্ধ হয়েন।

শান্তিপুর প্রদেশের "বূঢ়ন" গ্রামে কোন ভদ্র বংশীয় যবনের গৃহে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। কিরূপে ঈশ্বরভক্তি ও তাঁহার নাম কীর্ত্তনে অনুরাগ ও জাতীয় ধর্ম্মে বিরাগ উপস্থিত হয়,—কত বয়সে ইনি কুলধর্ম্ম ত্যাগ করেন—এবং কেইবা ইহাঁকে হরিদাস নাম প্রদান করেন—এ সকল বৃত্তান্ত নিশ্চয়রূপে অবগত হইবার কোন উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে এইমাত্র লিখিত আছে, হরিদাস সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। খুব সম্ভব যে তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষী পিতা মাতা পুত্রকে হিন্দুর ধর্ম্মে অনুরাগী দেখিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ ইহাঁর পূর্ব্বজীবনের ইতিবৃত্ত অবগত হইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

হরিদাস প্রথমতঃ গৃহ হইতে বাহির হইয়া শান্তিপুরের সন্নিহিত বেণাপোলের নির্জ্জন বনমধ্যে একটী সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগি-

লেন। ব্রাহ্মণগণের গৃহে গৃহে ভিক্ষা দ্বারা তিনি জীবন ধারণ করিতেন। কথিত আছে, হরিদাস সর্ব্বদা কেবল নাম সংকীর্ত্তনে মগ্ন থাকিতেন, দিবারাত্রির মধ্যে তিন লক্ষ নাম জপ করা তাঁহার নিয়ম ছিল। তাঁহার এপ্রকার কঠোর সাধন ও পবিত্র প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিত। অনেকে প্রতিদিন প্রভাতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিত।

এই প্রদেশে রামচন্দ্র খান নামে এক জন ধর্ম্মদ্বেষী পাষণ্ড জমিদার বাস করিত। হরিদাসের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা অনুরাগ সে সহ্য করিতে পারিত না। হরিদাসকে অপমানিত করিবার জন্য সে ব্যক্তি নানা উপায়ে তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইত। অবশেষে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া একজন রূপবতী বারাঙ্গনা দ্বারা হরিদাসের ব্রতভঙ্গ করিতে কৃতসংকল্প হইল। রামচন্দ্র নিয়োজিতা সেই বেশ্যা সদর্পে বলিল যে, সে তিন দিনের মধ্যে হরিদাসকে মতিভ্রষ্ট করিয়া ধরিয়া আনিবে। অনন্তর সেই বারনারী বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া হরিদাসের সাধনাশ্রমে উপনীত হইল, এবং নানা রূপ হাবভাবে হরিদাসকে আপনার মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিল। হরিদাস বলিলেন, তোমার যাহা বক্তব্য থাকে পরে শুনিব। এখন তুমি এই কুটীরদ্বারে বসিয়া ভগবৎ প্রসঙ্গ ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন শ্রবণ কর।

অনন্তর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তখন সেই কুলটা রমণী ভগ্নোদ্যম হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দুর্ব্বৃত্ত রামচন্দ্র খানের কুমন্ত্রণায় সেই বেশ্যা দ্বিতীয় রাত্রিতে আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদাস তাহাকে মিষ্টবাক্যে বলিলেন,কাল আমার বিন্দুমাত্রও অবসর ছিল না, তজ্জন্য তোমার কোন কথা শুনা হয় নাই। এক্ষণে আমার কোন অপরাধ লইও না। তুমি এইখানে বসিয়া ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ও নাম কীর্ত্তন শ্রবণ কর, নাম শেষ হইলেই তোমার যাহা মনোবাঞ্ছা থাকে আমায় বলিবে। ইহা শুনিয়া বেশ্যা কুটীরদ্বারে বসিয়া নাম শুনিতে লাগিল এবং নিজেও দুই একবার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া গেল। দেখিয়া বেশ্যা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। হরিদাস তখন বলিলেন, একমাসে এক কোটি নাম জপ করিব এইরূপ ব্রত লইয়াছি, মনে করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা সাঙ্গ হইবে, সমস্ত রাত্রি প্রাণপণে ঈশ্বরের নাম করিলাম, তবুও শেষ হইল না; কল্য নিশ্চয় ব্রতপূর্ণ হইবে। বেশ্যা ফিরিয়া গিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাপমতি রামচন্দ্রকে জানাইল এবং তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার ঠাকুরের তপস্যাকুটীরে আগমন করিল। সে এই দিন আশ্রমপদে উপনীত হইয়াই হরিদাসকে নমস্কার পূর্ব্বক কুটীরদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় নাম কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল এবং নিজেও বোধ হয় কপটভাবে নাম জপ করিয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু ভগবানের নামের কি আশ্চর্য্য শক্তি! সাধুসঙ্গের কি অমোঘ প্রভাব! সাধুর কণ্ঠস্বরে কণ্ঠস্বর মিলাইয়া পতিতপাবন কলুষনাশন হরির সুমধুর নাম করিতে করিতে পাপীয়সী বারনারীর মনপরিবর্ত্তিত হইল। নিশার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ের কলুষান্ধকারও দূর হইয়া গেল এবং পবিত্র উষার স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণমালার

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ক্ষেত্রও পুণ্য কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তখন সেই রমণী আপনার ঘৃণিত পাপাচরণ স্মরণ করিয়া অনুতাপিতচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিল। এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাসের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা চাহিল ও রামচন্দ্র খানের কুমন্ত্রণার বিষয়ও আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।

হরিদাস বলিলেন,রামচন্দ্র খানের কথা আমি সমস্তই জানি। সে অতি অজ্ঞ, সে যে আমার প্রতি এই অত্যাচার করিয়াছে, সে জন্য আমি দুঃখিত হই নাই। আমি সেই দিনই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম, কেবল তোমার উদ্ধারের জন্যই তিন দিন এখানে রহিয়াছি। তখন সেই বেশ্যা করযোড়ে কহিল, এখন আমার কি কর্ত্তব্য—কি উপায়ে আমার পরিত্রাণ হয়, তাহার উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করুন। হরিদাস বলিলেন, তোমার যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, সমুদায় দীনদুঃখী সজ্জনকে বিতরণ করিয়া এই কুটীরে আসিয়া নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্ত্তন কর,অচিরাৎ তাঁহার চরণাশ্রয় লাভ করিবে। হরিদাস এই উপদেশ দিয়া উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সেই বেশ্যা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া আপনার যথাসর্ব্বস্ব দীন দুঃখীদিগকে দান করিল এবং মস্তকমুণ্ডন করতঃ এক-বস্ত্রা হইয়া সেই কুটীরে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইল। নানারূপ কষ্টসাধ্য তপস্যা অবলম্বন করিয়া ভগবৎকৃপায় সে অচিরে ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থা হইয়া ভক্তমতী বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিল। ক্রমে সেই অঞ্চলের প্রধান প্রধান ভক্তগণও তাহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। বেশ্যার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া হরিদাস ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

প্রসঙ্গক্রমে নীচমতি রামচন্দ্র খানের বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। এ ব্যক্তি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের নিন্দা এবং সাধু ভক্তগণের অবমাননা করিত। ইহার উপহাস বিদ্রূপ ও অত্যাচারে নিরীহ ভক্তগণ অতিশয় কষ্ট অনুভব করিতেন। উপরি উক্ত ঘটনার অনেক দিন পরে অবধূত নিত্যানন্দ যখন বঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই সময়ে তিনি একদিন বহুলোকজন সঙ্গে লইয়া এই দুরাত্মার দুর্গামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। রামচন্দ্র অন্তঃপুর হইতে এই সংবাদ অবগত হইয়া ভৃত্য দ্বারা বলিয়া পাঠাইল যে, গোসাঞি যেন কোন গোপের প্রশস্ত গোশালায় গমন করেন, এখানে তাঁহাদের স্থান হইবেক না। ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সদলে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নিত্যা-নন্দ যেস্থানে বসিয়াছিলেন, এই দুরাত্মা সেই স্থানের মাটী কাটিয়া ফেলিয়া সমুদায় প্রাঙ্গণে গোময় লেপন করিতে আদেশ করিল। এ ব্যক্তি নবাবকে নির্দ্দিষ্ট কর না দিয়া সমস্তই আত্মসাৎ করিত। পরে নবাব-সরকার হইতে মুসলমান উজির আসিয়া তাহার চণ্ডীমণ্ডপে তিন দিন পর্য্যন্ত অবধ্য বধ ও অভক্ষ্য ভোজন করে, এবং গৃহ ও গ্রাম লুঠ করিয়া স্ত্রীপুত্রসহ তাহাকে বান্ধিয়া লইয়া গিয়া জাতিধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

> মহান্তের অপমান যেদেশ গ্রামে হয়।
> একেজনার দোষে সবদেশ উজাড়য়॥
>
> চৈঃ চঃ অন্ত্যখণ্ড।

বুদ্ধোৎসব।

বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির যেরূপ দুর্গোৎসব, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুস্থানীদিগের যেরূপ দেবালী ও হোলী, মহারাষ্ট্রীয়দিগের যেরূপ গণেশপূজা এবং মুসলমানদিগের যেরূপ মহরম, বৌদ্ধদিগেরও সেইরূপ বুদ্ধোৎসব। বুদ্ধদেব বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য এই উৎসব উক্ত দিবস অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দৈনিক পূজা ব্যতীত ইহাঁরা যে প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের পূজা করিয়া থাকেন তাহা এ প্রস্তাবের আলোচ্য নহে বলিয়া উল্লেখ করিলাম না। জাপান, চীন, তিব্বত, শ্যাম, বর্ম্মা, সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান দেশে কিছু কিছু স্থানগত আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। হইলেও ধর্ম্মে মূলগত অনেকটা ঐক্যই দেখা যায়। এস্থলে তিব্বতের ব্যাপার লিখিত হইতেছে। তদ্দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে যে, তথাকার ধর্ম্মই বল, সমাজনীতিই বল, যাহা কিছু সমস্তেরই আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং তিব্বতীয়েরা যে বঙ্গদেশের প্রতিমাপূজার অনুরূপ বুদ্ধোৎসবের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অবাধে বলা যাইতে পারে। এবং নিম্নলিখিত বিবরণেও তাহা সম্যক প্রতিপন্ন হইবে।

তিব্বতের স্থানে স্থানে বিস্তর দেবালয় আছে, তন্মধ্যে কুম্বমের দেবালয় সর্ব্বপ্রধান। এখানে অনেক লামা বাস করেন। উৎসবের বহুদিন পূর্ব্বে ইহাঁরা কোন এক সভায় সমবেত হইয়া তাহার আয়োজনার্থে যাহা যাহা আবশ্যক, যে বিষয়গুলি স্থির করেন। যে যে ব্যক্তি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে, তাহাদিগকে মনোনীত করেন। পরে জনৈক উক্ত শিল্পবিশারদ লামার হস্তে তাহার তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার ন্যস্ত করেন। মাখন সংগ্রহের জন্য চারিদিকে লোক প্রেরিত হয়। এই সংগৃহীত মাখন রাশিতে প্রতিমা প্রস্তুত হইবে। আমাদিগের দেশে মৃত্তিকায় প্রতিমা প্রস্তুত হয়। বড় বড় ধনীদিগের আলয়ে স্বর্ণ, রৌপ্যাদি ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি বোধ হয় বিরল নহে। এখন জিজ্ঞাস্য তিব্বতে মৃত্তিকায় প্রতিমা নির্ম্মাণ কেন না হয়। তদুত্তরে বলি যে, তিব্বত পার্ব্বত্য প্রদেশ। তথায় মৃত্তিকা তত সুলভ ও সুন্দর নহে। সকল মৃত্তিকাতেও মূর্ত্তি হইতে পারে না। যে মূর্ত্তি ধাতু বা প্রস্তরে নির্ম্মিত তাহা গৃহে সংরক্ষিত হয়; আর যাহা মৃত্তিকায় নির্ম্মিত তাহা জলে বিসর্জ্জিত হয়। আরও আমাদিগের দেশে যেরূপ তণ্ডুল সাধারণের খাদ্য, তিব্বতীয়দিগের সেইরূপ মাখন। ইহারা যবচূর্ণ চা ও মাখন দ্বারা সাম্বা নামে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে। ইহা দ্বারা তথাকার লোকের জীবন ধারণ হয়। সুতরাং উত্তম মৃত্তিকার অভাবে কেবল মাখন দিয়া ইহারা বিসর্জনীয় বুদ্ধপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, কিন্তু একটি সর্ব্বপ্রধান ও প্রকাণ্ড। ইহা ঊর্দ্ধে বিশ বা পঁচিশ ফিট। বুদ্ধদেব যে ভাবে দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ঈষদবনত মস্তকে শিষ্যমণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করিতেন ইহা সেই ভাবে নির্ম্মিত। ইহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ প্রকার সুন্দর সুন্দর তৃণ লতাদি উদ্ভিদ, এবং সরীসৃপাদি প্রাণিগণের প্রতিকৃতি। ঐ সমুদায় দেখিলে কে তাহা শিল্প বলিবে? স্বভাব এমনই সুন্দররূপে অনুকৃত হয় যে দেখিলেই তাহা

জীবত বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে প্রতিমায় এমন অসামান্য শিল্পচাতুরী দৃষ্ট হয় না। আমরা তিব্বতীয়দিগকে অপেক্ষাকৃত অসভ্য ও পার্ব্বতীয় জাতি মনে করি কিন্তু তাহারা শিল্পকার্য্যে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা এই বুদ্ধপ্রতিমায় সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। ইহা শুধু মাখনের শ্বেতমূর্ত্তি নহে। ইহাতে মনুষ্যের সুন্দর বর্ণ আছে, শিরা উপশিরা প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পের পারিপাট্য আছে। আমাদিগের দেশে যেমন প্রতিমার কাঠামা হয় তিব্বতেও সেইরূপ। এই বৃহৎ উচ্চ কাঠামায় বুদ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। ইহার সম্মুখে দীপাবলী। আবার দীপগুলির সম্মুখে নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব এক মঞ্চ থাকে। ঐ মঞ্চ বস্ত্রে মণ্ডিত। ইহাতে উচ্চ বংশীয়েরা উপবেশন পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া থাকেন। অপর সাধারণে ভূতলে বসেন। পূজায় নৈবেদ্য ও ধূপাদির আয়োজন থাকে। অন্যান্য লামা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রধান লামা পূজাকার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সময় ঘোর রবে নানারূপ বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে। পূজা সমাপ্ত হইলে সমবেত উপাসকমণ্ডলী স্বস্ব গৃহে প্রত্যাগমন করে। পরে অগণ্য দীপালোকে ঐ মাখনমূর্ত্তি গলিতে আরম্ভ হইলেই উহা সমারোহে লইয়া গিয়া এক গিরিগহ্বরে বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম কালের হস্তে যে এরূপ হইবে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বুদ্ধদেব তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি জ্ঞান ও কঠোর সাধনের উপর ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া যান। এই জন্যই ইহা আজিও সভ্য জগতে সমাদরের সহিত গৃহীত হইতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বৌদ্ধ পৌত্তলিকতা দাঁড়াইয়া প্রকৃত ধর্ম্মকে যে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে অগ্রে ইহা কে বুঝিয়া ছিল।

কাতরে করুণা।

অতি পূর্ব্বকালে গোদাবরী তীরে এক তাপস বাস করিতেন। নাম সিদ্ধিনাথ। তাঁহার মস্তকে কৃষ্ণপিঙ্গল জটাভার, সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম, গলে শঙ্খাস্থির মালা এবং পরিধান দ্বীপিচর্ম্ম। তদ্দেশীয় রাজা নির্ঋতি তাঁহার শিষ্য ছিল। একদা তিনি নির্ঋতিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, বৎস, তুমি ঐ অদূরবর্ত্তি চণ্ডালপল্লীতে গিয়া একটী অষ্টম বর্ষীয় বালক লইয়া আইস। অদ্য অমা নিশা, তাহার রক্তে দেবী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর শোণিত পিপাসা নিবৃত্ত করিয়া কোন এক শান্তি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। কিন্তু দেখিও এ কথার বিন্দু বিসর্গও যেন কেহ না জানিতে পারে। তান্ত্রিক কার্য্য যত গোপনে হয় সাধন করা আবশ্যক।

নির্ঋতি গুরুদেবের আজ্ঞামাত্র চণ্ডালপল্লীতে প্রবেশ করিল। ঐ পল্লী বেণুবনের অভ্যন্তরস্থ, চণ্ডালেরা মৃগজীবি, কুক্কুর ও বাগুরা লইয়া মৃগবধ করিবার জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। পল্লীর সর্ব্বত্র বসা রুধিরের কর্দ্দম, এবং জীর্ণ পর্ণশালার ছাদ ভেদ করিয়া দগ্ধ মাংসগন্ধী ধূম উত্থিত হইতেছে। স্থানে স্থানে মৃগয়ালব্ধ নিহত জীব জন্তুর কঙ্কালরাশি। নির্ঋতি তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যথোচিত মূল্য দিয়া একটী বালক ক্রয় করিয়া লইল। বালক পিতা মাতার নিকট জন্মের মত বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

এদিকে অমা নিশার গাঢ় অন্ধকার। সমস্তই যেন অঞ্জনপুঞ্জে লিপ্ত। দিক বিদিক

কিছুই লক্ষ্য হয় না। নদীতটে কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় তমাল বন। দেখিলেই বোধ হয় যেন তমোরাশি ঘন সন্নিবেশে এক স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সমস্তই নিঃস্তব্ধ ও অসাড়। অরণ্যের ইতস্তত শয়ান ভীমকায় অজগরের বিষাক্ত নিশ্বাস যেন অনল উদগার করিতেছে। সমস্তই অতি ভীষণ ও লোমহর্ষণ। তখন নির্ঋতি অবসর বুঝিয়া ঐ চণ্ডাল বালককে কহিল, গুরুর আদেশ, আমি এই নিভৃতে এখনই তোর মুণ্ডপাত করিব। আজ তোর রক্তে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর শোণিত পিপাসা শান্তি হইবে। শুনিবামাত্র বালকের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে কম্পিত দেহে বাষ্পাকুল লোচনে প্রাণভয়ে কহিল হা!

পিতরৌ ধনলুব্ধৌ চ রাজা খড়্গধরস্তথা
দেবতা বলিমিচ্ছন্তি কোমে ত্রাতা ভবিষ্যতি।

বালকের এই কাতর বাক্যে নির্ঋতির মনে অতিমাত্র করুণার সঞ্চার হইল। তাহার পাষাণ হৃদয় ভেদ করিয়া দুইটী চক্ষে নিরন্তর জলধারা বহিতে লাগিল। অন্তর্দ্দেশ যেন শত বৃশ্চিক জ্বালায় অস্থির। সে কিয়ৎক্ষণ কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ঘন ঘন ঐ বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এবং স্নেহে অতিশয় বিহ্বল হইয়া ভাবিল, আহা! এই বালক মৃত্যুভয়ে কাতর হইয়া কি মর্ম্মভেদী কথাই কহিল। পিতা মাতা সকলেরই সর্ব্বাংশে রক্ষক হইয়া থাকে কিন্তু তাহারা অর্থলোভে ইহাকে বিক্রয় করিয়াছে। পিতা মাতার ব্যতিক্রমে দেশের রাজা অসহায়ের রক্ষক হন, কিন্তু আমি স্বহস্তেই ইহার মুণ্ডচ্ছেদে উদ্যত। রাজা নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর হইলে লোকে দেবতার শরণাপন্ন হয় কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী স্বয়ংই ইহার রক্তপিপাসু হইয়াছেন। এই জন্যই এই বালক আজ করুণকণ্ঠে কহিল, হা! এখন কে আমায় রক্ষা করিবে। দেবি! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তো তোমার উদরে, ইহাতেও কি তোমার শোণিত পিপাসার নিবৃত্তি নাই। বিশ্বজননি! সকলেই তো তোমারই সন্তান, আজ তুমিই কি এই শিশুর রক্তপান করিবে। না না একথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। দেবি, তুমি তো করুণাময়ী, আজ এই বালকের কাতর ক্রন্দনে এই অশ্মসার হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়াছে আর তোমার পদতলে প্রসারিত এই বিশাল বিশ্ব-আসন কি বিন্দুমাত্রও টলে নাই। দেবি! তোমার তত্ত্ব, তোমার ধর্ম্ম তুমিই আমাকে বুঝাইয়া দেও। যে ধর্ম্মের উপকরণ মনুষ্যের নির্দ্দোষ শোণিত আজ আমি তাহাতে যার পর নাই সন্দিহান হইলাম। বালক নির্ভয় হও, বুঝি না তোর কি পাপ, যে তজ্জন্য তোর প্রাণদণ্ড হইবে।

এদিকে গুরুর আদেশ। সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শিষ্যের তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নির্ঋতি তাহা স্মরণ করিয়া আরও বিচলিত হইয়া উঠিল। কহিল, হা! আজ এই বালককে রক্ষা করিয়া গুরুদেবকেই বা কি বলিব। যদি বলি আমি কৃপাপরবশ হইয়া আপনার আদেশ পালন করি নাই তিনি নিতান্ত রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্য উপহত দেখিয়া কুপিত মনে আমাকে অভিসম্পাত করিবেন। ফলত গুর্ব্বর্থ সাধন শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য, অন্যথায় ঘোর নরক। দয়ার উদ্রেকে ধর্ম্মসাধনে উপেক্ষা করা বীরব্রতীর উচিত নহে। এই ভাবিয়া নির্ঋতি বালকবধার্থ খড়্গ উদ্যত করিল। খড়্গ উদ্যত হইবা মাত্র তাহা মুষ্টিচ্যুত হইয়া

পড়িল। তখন মহাত্রাসে নির্ঝতির সর্ব্ব-শরীর কণ্টকিত ও অবশ এবং মুখ শুষ্ক। সে অন্তশ্চক্ষে দেখিল সম্মুখে কে যেন এক বজ্রোদ্যতকর অতিভীষণ অব্যক্ত মূর্ত্তি। তিনি আসিয়া এই দারুণ কার্য্যের অন্তরায় হইয়াছেন। তদ্দৃষ্টে নির্ঝতি স্তম্ভিত হইয়া ভয় ও বিস্ময়ে কহিল,

কস্যেদং ব্যাততং চক্ষুঃ জ্বলদঙ্গারভাস্বরং,
ব্যক্তং হি বারয়তি মাং ব্যবসায়াৎ সুদারুণাৎ।

কার এই প্রসারিত জ্যোতিষ্মান চক্ষু এই দারুণ দুর্ব্যবসায় হইতে আমায় নিবৃত্ত করিল। এই দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ কে। এমন জ্যোতির্ম্ময় রূপ তো কখন দেখি নাই। তিনি এককটাক্ষে এই পাষাণ হৃদয় করুণার প্লাবনে দ্রবীভূত ও শতধা চুর্ণ করিয়া পলকের মধ্যে কোথায় অন্তর্ধান করিলেন। হা! যাঁহাকে দেখিয়াই আমার মন প্রাণ স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইয়াছে এখন তিনি কোথায়। কোন্ স্থানে গমন করিলে আবার তাঁর দর্শন পাই এবং এই দগ্ধ হৃদয় সুশীতল করি। হা! এই নির্জন বনে এমন কে আছে যে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিবে। অন্ধকার! তুমি কি আমাকে ছলনা করিবার জন্য তাঁকে লুকাইয়া রাখিয়াছ? তরু লতা গুল্ম! সেই দিব্য পুরুষ কোথায় অন্তর্ধান করিলেন তোমরা কি দেখিয়াছ? অনন্ত আকাশ! তুমি তো সর্ব্বত্রই প্রসারিত, সেই জ্যোতিকে কি তোমার গাঢ় নীলিমায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছ? হা! কেহই তো কিছুই কহিল না। এখন কোথায় যাই, কিরূপেই বা তাঁর সন্ধান পাই। বালক! পিতা মাতার স্নেহে তোমায় বঞ্চিত করিয়া আমি নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি। তুমি এক্ষণে অক্ষত দেহে প্রস্থান কর। বুঝিলাম মনুষ্যরক্তে দেবতার তৃপ্তি নাই।

অনন্তর নির্ঝতি গুরুর নিকট কাতর মনে প্রত্যাগমন করিল। দেখিল, তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে সমিধ নিক্ষেপ করিতেছেন। হোমধূমের পবিত্র আহুতিগন্ধ, জ্বলন্ত অগ্নির চট চটা শব্দ, বেদমন্ত্রের মধুর স্বর এবং মধ্য রাত্রির নিঃস্তব্ধতা ও গাম্ভীর্য্য দর্শকের মনে কোন এক অলৌকিক ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতেছে। নির্ঝতি যেন কোন অভীষ্ট বস্তুর বিয়োগে নিতান্ত কাতর। তাহার দুইটী চক্ষু নির্নিমেষ ও নির্লক্ষ্য। দেখিবামাত্র তাহাকে উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় অনুমান হয়। সে গুরুর পাদ বন্দন করিয়া সভয়ে কহিল, ভগবন্, আমি আপনার আদেশে বালকবধার্থ উদ্যত হইয়াছিলাম। যখন তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলাম তখন সে করুণ কণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। আমিও তাহার কাতর ক্রন্দনে যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইলাম। তখন ঐ নিরপরাধের উপর খড়্গাঘাত করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা রহিল না। পরিশেষে আপনারই সংকল্পসিদ্ধির উদ্দেশে কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া যেমন খড়্গ উদ্যত করিলাম তদ্দণ্ডেই কে যেন আসিয়া আমার দেহ হইতে শক্তিসংহার করিয়া লইলেন। এই দুইটী চর্ম্মচক্ষু তাঁহার দর্শন পাইল না কিন্তু অন্তর তাঁহার সেই বজ্রগম্ভীর অশব্দ বাক্যে চকিত হইয়া উঠিল। এই অসম্ভাবিত আকস্মিক ব্যাপারে আমি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছি। ভগবন্, এক্ষণে বলুন ঐ অরূপী পুরুষ কে? এবং কি জন্যই বা আমার কার্য্যে অন্তরায় হইলেন।

শুনিয়া গুরু ভক্তিগদগদ স্বরে কহিলেন, বৎস, বুঝিলাম ভূতপতি ভগবান্ তোমার কাতরতায় প্রসন্ন হইয়া চকি-

তের ন্যায় একবার দর্শন দিয়াছিলেন। তুমি ধন্য, তোমার মনুষ্য জন্ম সফল হইয়াছে। আজ এই ব্যাপারে আমারও দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। বুঝিলাম জ্ঞানই অজ্ঞাননাশে সমর্থ। এতকাল যে সমস্ত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলাম তাহার তন্নাশকতা নাই। অন্ধকার কি অন্ধকারনাশে সমর্থ হইতে পারে কখনই না। জ্ঞানে তাঁহাকে অনুসন্ধান কর তিনি সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ হইবেন এবং কাতর হইয়া তাঁহাকে ডাক তিনি অশব্দ বাক্যে তোমায় সান্ত্বনা করিবেন। বৎস! কাতরেই তাঁহার করুণা।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় নমস্তে!

আমার ভ্রাতৃপুত্রের উপনয়ন সংস্কারোপলক্ষে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি লইয়া বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসী পণ্ডিতবর শ্রীস্বামী অচ্যুতানন্দজীকে বহুসম্মান পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া জেলা দরভাঙ্গার অন্তর্গত মৌগ্রামে আমার বাটীতে লইয়া গিয়াছিলাম। এই কার্য্যোপলক্ষে আর্য্য সমাজের পণ্ডিতবর শ্রীভীমসেন শর্ম্মা, শ্রীস্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী, পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ মিশ্র ও শ্রীপ্রভুদত্ত পণ্ডিতাদি উপস্থিত ছিলেন। আমি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, এ জন্য আমার মূর্ত্তিপূজক ভ্রাতৃগণ সর্ব্বদাই আমার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করেন। তাঁহারাও তজ্জন্য উপনয়নকালে মহারাজ দরভাঙ্গার প্রধান রাজপণ্ডিত দলাধ্যক্ষশিরোমণি শ্রীচিত্রধর স্বামী সমস্তিপুরের পণ্ডিত শ্রীবিহারীলাল পাঠক ও ত্রিহুত জিলার অন্যান্য খ্যাতনামা মূর্ত্তিপূজক পণ্ডিতগণকে একত্রিত করিলেন। উভয় পক্ষের পণ্ডিতগণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা আমাদিগের বেদ উপনিষদাদির অনুমোদিত কি না এবং মূর্ত্তিপূজা বাস্তবিক ধর্ম্মের অঙ্গ কি না এ বিষয়ে বিচারকরণে মনস্থ করিলেন। স্বামী অচ্যুতানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী, পণ্ডিত শ্রীভীমসেন শর্ম্মা ও শ্রীপণ্ডিত শিবনাথ মিশ্র নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সমর্থন করিলেন। এই সমস্ত পণ্ডিতগণ অতিধীর ও গম্ভীরভাবে বেদ ও উপনিষদাদির সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণকে তথা দেশীয় ও বিদেশীয় প্রায় দুই হাজার শ্রোতৃগণকে বুঝাইয়া দিলেন। প্রথম বাদানুবাদ কালে শ্রীচিত্রধর ও অপরাপর পণ্ডিতগণ মিছামিছি কুতর্ক আরম্ভ করিলেন ও কেবল মাত্র ব্যাকরণের কূটতর্ক করিতে লাগিলেন; পরে যখন স্বামীদ্বয় ও পণ্ডিত ভীমসেন শর্ম্মা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন তখন অগত্যা পৌরাণিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে বেদ উপনিষদ্ ও দর্শন শাস্ত্র মতে মূর্ত্তিপূজা নাই ও পূর্ব্বকালে আর্য্য ঋষিগণ মূর্ত্তিপূজা করিতেন না। তৎপরে "কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ" লইয়া পৌরাণিক পণ্ডিতগণের সহিত বিশেষ বিচার আরম্ভ হইল। এই বাদানুবাদকালে স্বামী অচ্যুতানন্দ ও পণ্ডিত শ্রীভীমসেন শর্ম্মা বলিলেন যে যদি পরাশরকেই একমাত্র কলিযুগের প্রামাণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তবে "নষ্টেমৃতে" আদি পঞ্চ আপদকালে কি জন্য হিন্দু ভ্রাতা ও পণ্ডিতগণ বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর্য্য পণ্ডিতগণ ও স্বামী অচ্যুতানন্দ আরও প্রমাণ দিলেন যে উপনিষদ্ ও বেদ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে আধুনিক পুরাণ ও তন্ত্রের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণ ইহাঁদিগের প্রমাণ খণ্ডন করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎপরে আর্য্য পণ্ডিতগণ প্রায় দুই হাজার সমাগত লোককে উপদেশ দিলেন যে আমরা আজ কাল যেগুলি আমাদিগের একান্ত প্রয়োজনীয় ও যাহা বাস্তবিক ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র অনিষ্টকর বিষয় ও ধর্ম্মের বাহ্যাঙ্গ লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি। ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহ্যাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখাই আর্য্যাবর্ত্তের অবনতির কারণ। ধর্ম্মবিষয়ে উন্নত না হইলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। উপরোক্ত বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃগণ যার পর নাই আহ্লাদিত ও কৃতকৃত্য হইলেন। তৎপরে মনুষ্যমাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান ও সকলেরই ঈশ্বরোপাসনা বা ধর্ম্মযাজন তথা বেদ ও উপনিষদাদি পঠন পাঠনের অধিকার আছে, তদ্বিষয়ে স্বামী অচ্যুতানন্দ ও আর্য্যপণ্ডিত ভীমসেন বক্তৃতা করিলেন। ইহাঁরা স্পষ্টই বুঝাইয়া দিলেন যে আধুনিক স্বার্থপর পৌরাণিক গ্রন্থকারেরা স্বার্থহানির ভয়ে অশাস্ত্রীয় ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত প্রচার করণে ত্রুটী করেন নাই। পাছে সর্ব্ব সাধারণে বিদ্যাশিক্ষা করিলে তাহাদিগের মিথ্যা প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা কপোলকল্পিত মত প্রচার করিয়া, আর্য্যাবর্ত্তের বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যার লোপ করাইলেন। যে আর্য্যাবর্ত্ত পুরাকালে সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মশিক্ষক বলিয়া বিখ্যাত ছিল সেই আর্য্যাবর্ত্তই কতিপয় স্বার্থী উপধর্ম্মাচার্য্য মহাশয়দিগের মোহজালে পতিত হইয়া জড়োপাসক হইয়া পড়িয়াছেন। এই সমস্ত বিষয়ে বক্তৃতার পর গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণব্যবস্থা যে পুরাকালে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে পুনরায় পৌরাণিক পণ্ডিতগণের সহিত বিচার হইল। এই বিচারেও পৌরাণিক পণ্ডিতগণ পরাস্ত হইলেন। এইরূপ বিচার ও বক্তৃতা দুই দিবস পর্য্যন্ত চারি পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া হইয়াছিল। পরে চিত্রধর পণ্ডিত শরীর অসুস্থতার ভান করিয়া সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চিত্রধর সভা পরিত্যাগ করিলে অপরাপর পৌরাণিক পণ্ডিতগণ,আর্য্য পণ্ডিতগণ ও স্বামী অচ্যুতানন্দের সহিত আর বিচার করিতে সাহস করিলেন না। কাজেই বিচার

বন্ধ হইল। সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে বেদও উপনিষদে মূর্ত্তিপূজা নাই। মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে স্বামী অচ্যুতানন্দ ও পণ্ডিত ভীমসেন শর্ম্মা বেদ উপনিষদ, মনুসংহিতা ও দর্শন শাস্ত্রের অনেক প্রমাণ উল্লেখ করিলেন যাহা বিস্তারিত লিখিত হইলে প্রসঙ্গ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, তথাপি আমি এস্থলে দুই চারিটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিব যথা—

"ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থো না প্যুচ্যতে।
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে।
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে।
তমিদং নিগতং সহঃ স এব এক একবৃদেব এব।
সর্ব্বে অস্মিন দেবা একবৃতা ভবন্তি।
অথর্ব্ব কাং ৩ অনু ৪ মং ১৬—২১

যোন্যাং দেবতামুপাস্তে ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাম্। শতপথ ব্রাহ্মণ।

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যোঽসংভূতিমুপাসতে, ততোভূয় ইব তে য উ সংভূত্যাংরতাঃ। যজুঃ অং ৪০ অং ৯।
সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ংভূর্য্যাথাতথ্যতোঽর্থান ইত্যাদি।

যজুর্ব্বেদ।

নতস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ইত্যাদি।

ঋগ্বেদ।

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যেপ্রজাপতিম্
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম॥

মনু সংহিতা।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমা
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥"

যজুর্ব্বেদ।

উপরোক্ত মন্ত্র ও শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে দুই তিন বা চারি বলা যায় না। তাঁহাকে পাচ ছয় বা সাত এরূপ কিছুই বলিতে পারা যায় না। তিনি আট নয় বা দশ নহেন। তিনি অতীব শান্ত। তিনি কেবলমাত্র এক এবং তিনি একই। তিনিই কেবলমাত্র এক যিনি সকলকে ভরণপোষণ করেন এবং যাঁহাতে সকলে স্থিত রহিয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই সত্তাতে সৃষ্ট হইয়া তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে এবং কেবলমাত্র এক তাঁহাতেই স্থিত।

যাহারা সেই একমাত্র পরমাত্মার উপাসনা ও পূজা ত্যাগ করিয়া অপরাপর দেবতার পূজা করে বিদ্বান মনুষ্যগণ তাহাদিগকে পশুবৎ জ্ঞান করেন।

প্রকৃতি বা পরমাণুকে যে লোক ঈশ্বরস্থানে উপাসনা করেন তিনি মহান্ মোহান্ধকারে পতিত হন। পরন্তু যে লোক পার্থিব পদার্থকে ঈশ্বর স্থানে উপাসনা করেন তিনি আরও অধিক অন্ধকূপে পতিত হইয়া অধিকতর কষ্টপ্রাপ্ত হয়েন।

সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক, শীঘ্রকারী ও অনন্তবলবান, তিনি শুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামী, সর্ব্বোপরি বিরাজমান, সনাতন ও স্বয়ংসিদ্ধ: তিনি আকার অর্থাৎ শরীর রহিত বা নিরাকার, তিনি ছিদ্র ও নাড়ী রহিত ইত্যাদি।

সেই পরমাত্মা যাঁহাকে মহৎযশ বলা যায় অর্থাৎ যাঁহার যশ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ রহিয়াছে তাঁহার প্রতিমা নাই।

কেহ তাঁহাকে অগ্নি (সকলের পূজনীয় অথবা সমস্ত জগতের কারণ) কেহ তাঁহাকে মনু কেহ তাঁহাকে প্রজাপতি, কেহ তাঁহাকে ইন্দ্র কেহ তাঁহাকে প্রাণ কেহ তাঁহাকে শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন। সেই পরমাত্মা জগতের কারণ বলিয়া অগ্নি শব্দে কথিত হন। তাঁহার নাশ নাই বলিয়া তাঁহাকে আদিত্য বলা যায়। জগতের ধারণকর্ত্তা তথা তিনি অত্যন্ত বলবান হেতু বায়ু শব্দ বাচ্য হয়েন। তিনি আনন্দস্বরূপ তথা স্ব সেবকের আনন্দবর্দ্ধন করেন এ জন্য তাঁহাকে চন্দ্রমা বলা যায়। তিনি চেতনস্বরূপ ও জগৎকর্ত্তা এজন্য তাঁহাকে শুক্র বলে। তিনি সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ চেতন ও সর্ব্ব ব্যাপক এ জন্য তাঁহাতে অপশব্দ প্রয়োগ করা যায়। তিনি প্রজাদিগের পতি এ জন্য তাঁহাকে প্রজাপতি বলে।

উপরোক্ত ও অপরাপর অনেক প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা স্বামী অচ্যুতানন্দ ও পণ্ডিত ভীমসেন শর্ম্মা দুইজনে মিলিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার বিষয় সকলকে অতি সহজে বুঝাইয়া দিলেন। পর দিবস অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী আর্য্যাবর্ত্তের উন্নতির বিষয় একটী সারগর্ভ উপদেশ দেন। প্রায় ১॥ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্বামীজীর বক্তৃতা হয়। পরে সকলে পুনরায় স্বামী অচ্যুতানন্দকে উপদেশ দিতে অনুরোধ করায়, "তিনি ধর্ম্ম কাহাকে বলে ও সেই ধর্ম্ম কিরূপে যাজন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে এক সুদীর্ঘ ও সুমধুর বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাতে তিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করাই যে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ও সাধন তাহা প্রায় দুই হাজার লোককে বুঝাইয়া দিলেন। পরে ধর্ম্মের দশ লক্ষণ অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য অক্রোধ এই গুলি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। পরিশেষে সভা ভঙ্গ হইল। সকলেই প্রার্থনা করিলেন যে অচ্যুতানন্দ ও ভীমসেন প্রতি বৎসর ত্রিহুতে আসিয়া জনসাধারণকে যেন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। এদেশের সাধারণ লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। স্বামী অচ্যুতানন্দ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মই যে আমাদিগের পুরাতন আর্য্য ঋষিগণের অনুমোদিত ধর্ম্ম তাহা শ্রোতৃগণকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কৃপাতেই আমরা তাঁহার শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসী শ্রীঅচ্যুতানন্দ স্বামীকে প্রাপ্ত হইয়া যে কি পর্য্যন্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা লেখনীদ্বারা ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহি। স্বামী অচ্যুতানন্দ ও পণ্ডিত ভীমসেনের কৃপাতেই ত্রিহুতে নিরাকার উপাসনা বিষয়ে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দীর্ঘায়ু করিয়া তাঁহার (মহর্ষির) দ্বারা পুরাতন ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করুন। ইতি। তারিখ ২রা আষাঢ় ১৩০১ সাল।

শ্রীহরবন্ধু লাল।
মৌগ্রাম জেলা দরভাঙ্গা।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৬৪৯ ৫১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১০০৲
সমষ্টি	৩৭৪৯ ৫১৫
ব্যয় ...	৬২৯॥৵১৫
স্থিত ...	৩১১৯।৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪৬৲

নববর্ষের দান।

প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের পারিবারিক দান	১৬৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
„ „ বলাইচাঁদ পাইন	৮৲
„ „ আশুতোষ ধর	২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
	৪৬৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৫৮॥৶১০
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়,	কলিকাতা	১২৲
„ „ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	৩৲
„ „ বিপিনবিহারী ঘোষাল	হড়া	৩৲
„ „ গজেন্দ্রনাথ ভুঞা,	গেঁওখালি	৩৲
„ „ দ্বারকানাথ ঘোষ,	কলিকাতা	৩৲
„ „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	৩৲
„ „ কুলদাকিঙ্কর রায়	ঐ	১৲
„ „ ব্রজগোপাল মতিলাল,	ঐ	১৲
„ „ হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
„ „ চক্রধর সাহা,	ঢাকা	৩।৶০
„ „ রাইচরণ দাস,	চেরাপুঞ্জি	১৸৶০
„ রাজা রামেশ্বর মালিয়া,	হাবড়া	৩৲
ডাক্তার পি, কে, রায়,	বালিগঞ্জ	৩৲
সম্পাদক "হরিসেনা মণ্ডলী,"	কলিকাতা	১॥০
„ নিবধই যুবক পাঠাগার		৸৶০
রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর,	তাহেরপুর	।১০
শ্রীমতী ধর্ম্মদাসী দেবী,	শ্রীবাটী	৸০
শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী,	চুঁচুড়া	৩।৶০
„ „ গোপালচন্দ্র দে,	কলিকাতা	১৲
„ „ হরিমোহন নন্দী,	ঐ	২।০
„ „ উমাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ,	ঐ	২।০
সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজ	রামপুরহাট	১৸৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১০ খণ্ড নগদ বিক্রয়		৩৸০
		৫৮॥৶১০

পুস্তকালয়	১৭।৵৫
যন্ত্রালয়	৫০৯৵১০
গচ্ছিত	১৩॥১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩৸০
পুস্তক বিক্রয়ের কমিসন ..	॥৶০
সমষ্টি	৬৪৯ ৫১৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	১৬৬৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪৮৶১৫
পুস্তকালয় ...	২৩৵১০
যন্ত্রালয় ..	৩১৭৶৫
গচ্ছিত ...	৫৩৸৵৫
সেভিংসব্যাঙ্ক	২১।০
সমষ্টি	৬২৯॥৵১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

তপস্যা ও ব্রহ্মদর্শন।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ; যিনি জগতের সকল ঘটনাই জানিতেছেন এবং যিনি জগতের প্রত্যেক ঘটনা জানিতেছেন; যাঁহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না; যিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকিয়া এবং আমাদের চিরসঙ্গীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অনিমেষ আঁখিতে সকল ঘটনাকে মঙ্গলের পথে নিয়মিত করিতেছেন; যাঁহাকে ছাড়িয়া কাল দাঁড়াইতে পারে না "নহি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে," সেই পরব্রহ্মকে একাগ্রচিত্তে জানিতে ইচ্ছা কর "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।"

ব্রহ্মজ্ঞানই আমাদের চরম পুরুষার্থ। একবার ভাবিয়া দেখ, সমস্ত জীবন পৃথিবীকে লইয়া কাল কাটাইলে, একবারও সেই পরম পুরুষের দিকে চক্ষু ফিরাইলে না—তোমার হৃদয় কি ঘনঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর সহিত চির আবদ্ধ থাকিলে আমাদের হৃদয় কি শান্তি পাইতে পারে? কখনই নহে, কেবলই অশান্তির আলয় হইয়া উঠে। কতকগুলি বৃথা কর্ম্মে দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। যে সকল বিষয়াসক্ত ব্যক্তি এইরূপ চিন্তাতে প্রাণমন ঢালিয়া দেয়, তাহাদের উন্নত ভাব সকল এতদূর চাপা পড়িয়া যায় যে তাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারা কত অবনত হইয়াছে। তাহাদের সততই এই চিন্তা যে, অপরে তাহার কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং সে অপরের কত সর্ব্বনাশ করিবে। একবার অন্তরে দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যাইবে যে, সে অবস্থায় আমাদের সুখও থাকিতে পারে না, শান্তি তো দূরের কথা। পরমেশ্বর পৃথিবীর এই প্রকার কঠোর জীবদিগেরও পক্ষে তাঁহাকে জানিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন; তিনি তাহাদেরও লৌহকবাট ভেদ করিয়া তাহাদের সমক্ষে প্রকাশ হয়েন—ইহাই তাঁহার করুণা। যখন বজ্রাঘাতে তাহাদের গৃহ ভগ্ন হইতে থাকে; যখন প্রবল বন্যা আসিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া লইয়া যায় অথবা যখন মৃত্যু সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়, তখন তাহাদের হৃদয় মুহ্যমান হইয়া পড়ে—তখন

তাহারা বুঝিতে পারে যে পৃথিবীই কেবল সর্ব্বস্ব নহে, পৃথিবীর উপরেও এমন এক পুরুষ আছেন, যাঁহার ক্ষমতা কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। এইরূপে তাহারা বিপদের কঠোর মূর্ত্তির মধ্যে ঈশ্বরের রুদ্রদণ্ড দেখিয়া ভীত হয়। বিপদের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরকে দেখে, তাহারা তাঁহাকে বাহিরেই দেখে। তাহারা তাঁহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পায় না।

আত্মজ্ঞানীরাই ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেন। আত্মজ্ঞানীরাই ঈশ্বরকে আত্মস্থ—নিকটস্থ করিয়া জানেন। তাঁহারা আপনাদের প্রেম, আপনাদের জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রেমরূপ দেখিতে পান এবং জ্ঞানরূপ জানিতে পারেন। আত্মজ্ঞানীরাই যে ঈশ্বরকে অধিকতর রূপে জানিতে পারেন, এ কথাটী অতি পুরাতন; কিন্তু ইহা নিতান্ত সত্য এবং সত্য বলিয়াই ইহা পুরাতন। ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন

"তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদোবিদুঃ"

সেই পরব্রহ্ম জ্যোতির জ্যোতি এবং তাঁহাকে আত্মজ্ঞানীরাই জানেন; আর আজ বহুশতাব্দী পরে আমাদেরও আত্মা হইতে এই কথার পূর্ণগম্ভীর প্রতিধ্বনি উত্থিত হইতেছে। চেতন আত্মা অবলম্বনেই ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারা যায়, জড় অবলম্বনে সেইরূপ হয় না।

ঈশ্বরকে যদিও আমরা আত্মার সহজজ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষরূপে আত্মস্থ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিলে তপস্যা অবলম্বন করা আবশ্যক। ঋষিরা তাঁহাকে যেরূপ "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" প্রতীতি করিয়াছিলেন, তপস্যা ব্যতীত আমরা তাঁহাকে সেরূপ বিশেষভাবে জানিতে পারি না। সংসারের মোহমদিরাতে একেবারে মগ্ন হইয়া থাকিব অথচ তাঁহাকে জানিব, সে আশা বৃথা। তপস্যা অবলম্বনে আমরা বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া যখন নির্লিপ্তভাবে সংসারের কার্য্য করিতে থাকিব, যখন পৃথিবীর উপরে উঠিব, তখনি মুক্ত আকাশের ন্যায় মুক্ত আত্মাতেও ঈশ্বরের জ্বলন্ত প্রকাশ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব। তাই ঋষি বলিতেছেন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর।

বরুণপুত্র ভৃগু ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া স্বীয় পিতাকে বলিলেন "অধীহি ভগবো ব্রহ্ম" আমাকে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানশিক্ষা দাও; ভৃগু জিজ্ঞাসা করিলেন যে অন্ন, প্রাণ, বা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহাদিগের কোন্‌টী ব্রহ্ম? বরুণঋষি তাঁহাকে সংক্ষেপে বলিলেন

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম"

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

তপস্যার অভাবে ভৃগু প্রথমে অন্নকেই ব্রহ্ম স্থির করিয়া পিতা বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি অন্নই ব্রহ্ম—কারণ অন্ন হইতে এই জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া অন্ন কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং পরিণামে অন্নেতেই প্রবেশ করে?" পিতার নিকটে যখন তিনি জানিলেন যে অন্ন ব্রহ্ম নহে, তখন তিনি বলিলেন, হে ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানশিক্ষা দাও "অধীহি ভগবো ব্রহ্ম।" বরুণ বুঝিলেন যে তপস্যার বল না থাকিলে বিশুদ্ধ

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও ধারণ করা অসম্ভব, সেই কারণে পুত্রকে উপদেশ করিলেন তপস্যা অবলম্বনে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" ভৃগু পিতার উপদেশানুসারে তপস্যা অবলম্বনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া প্রাণকেই ব্রহ্মস্বরূপ স্থির করিরা পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন তবে কি প্রাণই ব্রহ্ম—প্রাণ হইতে জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া প্রাণ কর্তৃক জীবিত রহে এবং অন্তে জীব সকল প্রাণেতে প্রবেশ করে? এবারেও পিতার নিকটে, প্রাণ ব্রহ্ম নহে ইহা জানিয়া বলিলেন 'হে ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানশিক্ষা দাও—"অধীহি ভগবো ব্রহ্ম।" বরুণ পুনরায় বলিলেন "তপস্যা অবলম্বনে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" গুরুও যে প্রকারে কঠোর, শিষ্যও সেই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভৃগু পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইয়া মনকেই ব্রহ্মের স্বরূপ স্থির করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি মনই ব্রহ্ম—মন হইতে এই জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া জীবিত রহে এবং অন্তকালে মনেতে প্রবেশ করে?" পুনরায় তাঁহাকে বলিতে হইল "অধীহি ভগবো ব্রহ্ম।" বরুণও পুনরায় পুত্রকে বলিলেন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" ভৃগু পুনরায় বিজ্ঞানকেই ব্রহ্মস্বরূপ স্থির করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি বিজ্ঞানই ব্রহ্ম—বিজ্ঞান হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া বিজ্ঞান কর্তৃক জীবিত রহে এবং পরিণামে বিজ্ঞানেই এই সকল প্রবেশ করে?" বরুণ ঋষি স্বীয় পুত্রের এখনও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই বুঝিয়া তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভৃগু পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইয়া জানিলেন যে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম কর্তৃকই জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মতেই গমন করে ও প্রবেশ করে

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

ভৃগু বারম্বার তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ে একাগ্রচিত্তে ধ্যানপরায়ণ হইয়া তবে এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ পূর্ব্বক ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শিণ্টো মত

জাপান সাম্রাজ্যে শিণ্টো নামে এক প্রকার মত প্রচলিত আছে। ইহা একটী কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত নহে; আমরা সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমত বলি, শিণ্টো তাহা নহে। কোনও শিণ্টো মতাবলম্বী কোনও এক বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারেন, কিন্তু কখনও কোনও এক বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীকে শিণ্টো মতাবলম্বী হইতে শুনা যায় নাই। যথা, একজন শিণ্টো বৌদ্ধ কাংফোচ হইতে পারেন, কিন্তু কোনও বৌদ্ধ বা কাংফোচকে শিণ্টো হইতে দেখা বা শুনা যায় না। ইহার কারণ এই যে শিণ্টো মতে এমত কোনও বিরুদ্ধ ভাব নাই যাহা উক্ত কোনও ধর্ম্ম মতের বিরোধী হইতে পারে। ক্রমশঃ তাহা বিবৃত হইতেছে।

'শিণ্টো' এই কথাটি দুইটি কথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একটি 'শিন'

অর্থাৎ দেবতা অপরটি টো অর্থাৎ মার্গ। সুতরাং শিণ্টো অর্থে 'দেবমার্গ' বুঝায়। আরও একটু বিশদ রূপে বলিতে হইলে এই বলা যায় যে, দেবলোকস্থ পূর্ব্ব পুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ। ইহা জাপান দ্বীপপুঞ্জবাসীমাত্রেরই অবলম্বনীয়। তথাকার অতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে এইরূপ প্রকটিত আছে যে,সৃষ্টির প্রারম্ভে একটি দেববংশের অভ্যুদয় হইয়া, তদ্দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃষ্টি হয়। ইহাতে সমস্ত সচেতন পশুপক্ষী, অচেতন ও উদ্ভিদের এবং মানবেরও সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত সৃষ্ট মনুষ্যই জাপান নিবাসীদিগের পূর্ব্ব পুরুষ। আমাদের প্রাচ্য দেশ সমূহে বড় রাজবংশ সূর্য্যাদি দেবতা সম্ভূত বলিয়া অন্ততঃ তৎতৎ বংশধরগণ কর্ত্তৃক অনুমিত হয়, জাপানেও সেইরূপ। জাপানে রাজার কথা দূরে থাকুক তত্রত্য নিবাসিগণ দেবকুলোদ্ভব বলিয়া ভান করিয়া থাকে। জাপান রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থিতি, জাপাননিবাসীর চরিত্রগত বিশেষত্ব শিণ্টো মতের ঐতিহাসিক মূল। এই সমস্ত লইয়া বিচার করিয়া জাপান নিবাসিগণ বলেন যে, এই দেবপ্রদর্শিত মার্গ বা মত তাহাদিগের নিকট সংরক্ষিত হইতেছে, ইহা তাহাদিগেরই জন্য চির কাল থাকিবে; ইহাতে তাহাদিগের সম্রাটের ও তাঁহার প্রজাবর্গের সমান অধিকার। তাহাদিগের পূজ্য দেবতাদিগের মধ্যে 'ইজানাগি-ন-কামি' ও ইজানামি-ন-কামি (পুরুষ ও প্রকৃতি) এই দুয়ের প্রথমে সৃষ্টি হইয়া ইহাঁদিগের হইতে অসংখ্য দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। এস্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক হইয়াছে। তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে না। তাহা এই। মহাত্মা কংফুচ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত রাজনীতি ও রাজমর্য্যাদাপ্রধান ধর্ম্ম মতেও এইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতিবাদের বিলক্ষণ প্রাধান্য আছে। এই সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষবাদ ভারতবর্ষ হইতে উক্ত সাম্রাজ্যদ্বয়ে প্রচলিত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জাপানে ভিন্ন ভিন্ন সম্রাটের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বৌদ্ধ মত, কংফুচের মত ও খৃষ্টীয় মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু রাজা প্রজা সকলেরই মধ্যে শিণ্টো সর্ব্বসমাদৃত। এই নিমিত্ত ইহাকে তথাকার রাজধর্ম্ম বলিলেও বলা যাইতে পারে এবং সভ্য জগতে ইহা তথাকার রাজধর্ম্ম বলিয়াও বিদিত আছে। ইহার প্রক্রিয়া সকল আবহমান কাল অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে। রাজপ্রাসাদে পূর্ব্ব (দেব) পুরুষ হইতে প্রাপ্ত দৈব ত্রিরত্ন পরম পবিত্র দেবরত্ন, ইসির বৃহৎ মন্দিরে দেব দর্পণ এবং অৎসুতার মন্দিরে দেব-অসি সুরক্ষিত হইতেছে। এই মন্দিরত্রয়ের উদ্দেশে একদিন অতি সমারোহে উৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে সমস্ত জাপানবাসী যোগদান করিয়া থাকে। জাপান যেরূপ সাম্রাজ্য শিণ্টো মতও তদনুরূপ। অন্যত্রে ইহা প্রচলিত হইবার নয়, হয়ও নাই। সে যাহাই হউক ইহার একটী সম্প্রদায় আছে তাহার নামেই উহা ধর্ম্মজগতে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের নাম জিবেন। ইহার অর্থ আনুষ্ঠানিক। হাসিগওরা কাকুজিও ইহার প্রবর্ত্তক। ইনি নেগাসেকি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর মতে দেবাদিদেব আমি-নো-মিনাক নসী-নো-কামি স্বয়ম্ভূ। ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহাঁ হইতে অপর দেবতাদ্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারা পুরুষ ও প্রকৃতি। এই দেবতাত্রয় সৃষ্টির ত্রিদেব। হিন্দুদিগের যেরূপ বিন্ধ্যাচল হিমাচল ও নীলাচল, বৌদ্ধদিগের যেরূপ রাজ-গৃহের

নিকটবর্ত্তী শৈল-গিরি, জৈনদিগের যেরূপ পরেশনাথ পর্ব্বত, তদ্রূপ ফুজি আগ্নেয় গিরি শিণ্টোদিগের পবিত্র স্থান। শিণ্টো-মতাবলম্বিগণ ইহকাল ও এই নশ্বর জগতের উপর অধিকতর আস্থাবান। ইহাঁরা দেশের শান্তি ও রাজার পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য উপাস্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন। মিতাচার ও পরিশ্রম দ্বারা ইহাঁরা সাধারণের মঙ্গল ব্রতে ব্রতী। দেশের হিতের নিমিত্ত ইহাঁরা দায়ী। জগতের সমস্ত ধর্ম্মমত ইহাঁদিগের আদরণীয়। আমার বন্ধুবর মাননীয় শ্রীযুক্ত এইচঃ ধর্ম্মপাল যখন জাপানে পরিভ্রমণ করেন তিনি শিণ্টো পুরোহিতকে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যেন কাহাকে আহ্বান করিয়া হৃদয়ে তুলিয়া রাখিতেছে এই ভাবে প্রার্থনা করিতে দেখিয়াছেন। পুরোহিতের পরিচ্ছদ অন্যান্য জাপান-নিবাসী হইতে কিছু স্বতন্ত্র। পদদ্বয়ে কোনও প্রকার পাদুকা নাই; মস্তকে এক প্রকার টুপি আছে, ইহা একটি ফিতে দিয়া গ্রীবার অধোদেশে সংলগ্ন ও উপরিভাগটা কতকটা স্তম্ভের মত উচ্চ। শিণ্টো দেবালয় কতকটা জাপানের বৌদ্ধ দেবালয়ের মত গঠিত।

শিণ্টো মত অতি সংক্ষিপ্ত ও সরল। কাংফুচ ও তেও প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের ন্যায় ইহাতে ঈশ্বরপ্রাধান্য নাই।

••

হরিদাস ঠাকুর

২)

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হরিদাসের ভক্তিবিগলিত নাম সংকীর্তন শ্রবণে ও তাঁহার অশ্রু রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব সন্দর্শনে দুর্ম্মতি রামচন্দ্র খানের প্রেরিত সেই বেশ্যার অন্তঃকরণে অনুতাপের সঞ্চার হয়, এবং হরিদাস তাহাকে সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভগবানের নাম রসাস্বাদন করিতে উপদেশ দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন।

অনন্তর তিনি সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামের অন্তর্গত চান্দপুর গ্রামে আগমন করিয়া বলরাম আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বলরাম আচার্য্য সপ্তগ্রামের সুবিখ্যাত ধনী ও ধর্ম্মপরায়ণ জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের কুলপুরোহিত ছিলেন। ইনি অতিসদাশয় ও ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। নিজে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইয়াও যবনকুলোদ্ভব হরিদাসকে নিজগৃহে আশ্রয় দিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। হরিদাস ইহাঁর আশ্রয়ে একটী নির্জ্জন পর্ণকুটীরে বাস করিয়া নিরন্তর নাম কীর্ত্তনে নিমগ্ন থাকিতেন। গোবর্দ্ধন মজুমদারের অল্পবয়স্ক পুত্র রঘুনাথ এই সময়ে বলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়নার্থ আসিয়া হরিদাসকে দর্শন করিতেন। হরিদাসের মুখে ধর্ম্মমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াই রঘুনাথ বৈরাগ্য ও ভক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হন, পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইনি "দাস গোস্বামী" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

হরিদাস ঠাকুর এখানে আচার্য্যগৃহে নির্জ্জন কুটীরে কিছু দিন বাস করেন। একদিন বলরাম আচার্য্য হরিদাসকে জমিদার হিরণ্য মজুমদারের সভায় লইয়া গেলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতা হরিদাসকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সভাস্থ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সাধুসজ্জনেরা হরিদাসের সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে ও সুমিষ্ট আলাপে মুগ্ধ

হইয়া সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ করেন শুনিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ নাম মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। কোন পণ্ডিত বলিলেন, নামে পাপক্ষয় হয়; কেহ বলিলেন, নাম করিলে জীবের মোক্ষলাভ হয়। শেষে হরিদাস বলিলেন, "এ দুইয়ের কোনটীই নামের ফল নহে। ভক্তিসহকারে নাম সাধনে জীবের যে নির্ম্মল প্রেমানুরাগ উৎপন্ন হয়, তাহাই নামের প্রকৃত ফল। পাপক্ষয় অথবা মুক্তি নামসাধনের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মনে করুন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন অন্ধকার বিনাশ হয় এবং দস্যু চোর ও নিশাচর রাক্ষস প্রভৃতির আর ভয় থাকে না; পক্ষান্তরে সূর্য্য উদয় হইলে জগৎ প্রকাশিত হয় ও সকলেই গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ জগন্মঙ্গল ভগবানের নাম কীর্ত্তনের প্রারম্ভেই অজ্ঞানান্ধকার ও পাপ বিনষ্ট হয়, এবং ক্রমশঃ নামে অনুরাগ জন্মিলে ভগবানে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। মুক্তি অতি তুচ্ছ বস্তু, নামাভাসেই তাহা লাভ হয়। দেখুন, অজামিল মৃত্যুকালে অবশচিত্তে স্বীয় পুত্রের নামে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভাগবতে আছে সালোক্য সাযুজ্যাদি পাঁচ প্রকার মুক্তি ভগবান ভক্তগণকে দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাঁহার সেবাময় বিশুদ্ধ প্রেম ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না।" *

হরিদাসের মুখে এইরূপ নাম মহিমা শ্রবণ করিয়া সভাসদগণ পুলকিত হইলেন। কেবল গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রাহ্মণ যৌবনসুলভ চপলতা বশতঃ হরিদাসকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। এ ব্যক্তি মজুমদারদিগের সংসারে আরিন্দাগিরি করিত। প্রতি বৎসর বার লক্ষ টাকা সদর খাজানা গৌড় নগরে নবাবকে প্রদান করা ইহার কার্য্য ছিল। এই উদ্ধত যুবক নামাভাসে মুক্তিলাভ হয় শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে বলিল, পণ্ডিতগণ! এই ভাবুক লোকটার অদ্ভুত কথা একবার শুনুন, কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে যে মুক্তি পাওয়া যায় না, ইনি বলিতেছেন নামাভাসে অনায়াসেই তাহা লাভ হয়। ব্রাহ্মণের উপহাস বাক্য শুনিয়া হরিদাস বিনীত বচনে বলিলেন, আপনি অনর্থক সন্দেহ করিতেছেন কেন? নামাভাস মাত্রে মুক্তিলাভ হয়, ইহা শাস্ত্রের উপদেশ। প্রেমভক্তির নিকট মুক্তি অতি তুচ্ছ বস্তু, এই জন্য প্রেমিক ভক্তগণ তাহা কখনও ইচ্ছা করেন না।" ইহা শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, যদি নামাভাসে মুক্তি হয়, তাহা হইলে আমি নাক কাটিয়া ফেলিব! হরিদাসও দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন, যদি না হয়, তবে নিশ্চয় আমার নাক কাটিব!!

"হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয়॥
ভক্তি সুখ আগে মুক্তি অতিতুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি না ইচ্ছয়॥
বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি হয়।
তবে আমার নাক কাটি করহ নিশ্চয়॥
হরিদাস কহে যদি নামাভাসে নয়।
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয়॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্যখণ্ড।

হরিদাসের এই প্রকার অবমাননা দেখিয়া সভাস্থ সকলেই হাহাকার করিয়া

---

* "সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"
শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ।

উঠিলেন, এবং ব্রাহ্মণকে ধিক্কার দিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। বলরাম আচার্য্য তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "রে মূর্খ! তুই মুক্তির কি জানিস্? তুই যে হরিদাস ঠাকুরের অপমান করিলি এই অপরাধে তোর সর্ব্বনাশ হইবে।" হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া বাটী প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। হরিদাস সভা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, সভাস্থ সকলে করযোড়ে তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হরিদাস সহাস্যমুখে মধুরবচনে বলিলেন, আপনারা কিছু মনে করিবেন না, আপনাদের কোনও দোষ নাই, আর এই ব্রাহ্মণও অতি অজ্ঞ, ইহার তর্কনিষ্ঠ মন, নামমহিমা কখনও তর্কের গোচর নয়, ইহার দোষ কি? ভগবান আপনাদের কল্যাণ করুন, আমার দ্বারা যেন কাহার অনিষ্ট না হয়।

"তোমা সবার দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সবতত্ত্ব॥
চৈঃ চঃ, অন্ত্যখণ্ড।

কথিত আছে, এই ঘটনার অল্পদিন পরেই এই ব্রাহ্মণ যুবক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। হরিদাস তাহা অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিতচিত্তে চান্দপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিপুরে গমন করেন।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্ম ব্যাধ।

তাপসপ্রবর কৌশিক বরবর্ণিনী পতিব্রতা রমণীর হিতগর্ভ উপদেশ বাক্য শ্রেয়ঃসাধন জ্ঞান করিয়া অনুতাপ করিতে করিতে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি উক্ত-নারীর উপদেশে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসার নিমিত্ত মিথিলানগরবাসী ধর্ম্মের নিগূঢ়মর্ম্মজ্ঞ পিতামাতার সেবাপরায়ণ ধর্ম্ম ব্যাধ সন্নিধানে গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন, এবং নিবিড় অরণ্য ও জনপদসমূহ অতিক্রম করিয়া যজ্ঞোৎসবাবতী মহৈশ্বর্য্যসম্পন্না শোভনা মিথিলানগরীতে প্রবেশ করিলেন।

কৌশিক মিথিলায় উপনীত হইয়া তত্রত্য বিপ্রগণকে ধর্ম্মব্যাধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের নিদেশ ক্রমে মৃগ মহিষাদির মাংসবিক্রেতা ব্যাধের বিপনীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ক্রেতাগণের সম্বাধ বশত নিকটস্থ হইতে না পারিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্যাধ কোনও রূপে ব্রাহ্মণের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং অভিবাদন করিয়া বিনয় বচনে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিল, হে দ্বিজোত্তম! আপনার শোভন আগমনে আমি আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছি। এই অপবিত্র পশুবধস্থলে অবস্থান করা আপনার অনুচিত। অতএব যদি অভিরুচি হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক মদীয় ভবনে আগমন করিয়া কৃতার্থ করুন। অনন্তর কৌশিক ব্যাধের বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া তাহার রমণীয় ভবনে সমুপস্থিত হইলেন।

পরে প্রীতিবচনে ব্যাধকে বলিলেন, শুনিয়াছি তুমি যথার্থই ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, আমার বিবেচনায় মাংসবিক্রয়রূপ গর্হিত আচরণ কদাপি তোমার উপযুক্ত নয়; তোমার এই ভয়ঙ্কর অনুষ্ঠান চিন্তা করিয়া আমি অতিশয় পরিতাপিত হইতেছি। ব্রাহ্মণের বাক্যাবসানে ব্যাধ বলিল, হে ভগবন্! মাংসবিক্রয় করা আমার পিতৃপিতামহ প্রচলিত কৌ-

লিক ধর্ম্ম, আমি স্বীয় কুলোচিত অনুষ্ঠানেই নিযুক্ত আছি, অতএব আপনি এজন্য দুঃখিত হইবেন না। আমি বিধিনির্ব্বন্ধে এই কুলধর্ম্ম পালন করিয়া ও অসূয়া পরিশূন্য হইয়া প্রযত্ন সহকারে বৃদ্ধ পিতামাতার শুশ্রূষাতে সতত নিযুক্ত থাকি, যথাশক্তি দান করি এবং সর্ব্বদা সত্যবাক্য উচ্চারণ করি। আমি দেবতা অতিথি ও ভৃত্যগণকে যথাযোগ্য প্রদান করিয়া অবশিষ্ট বিত্ত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি। ক্ষুদ্র অথবা বলবত্তর কর্ম্মের দোষোদ্ঘোষণে বিরত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনেই প্রবৃত্ত থাকি। হে ব্রাহ্মণ! আমি স্বয়ং কোন প্রাণীর হিংসা করি না, অন্য কর্ত্তৃক হত মৃগ মহিষ বরাহাদি বিক্রয় করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা কখনও নিজে ভক্ষণ করি না। আমি গৃহস্থ হইয়াও ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত আছি। দিবসে উপবাস করিয়া নিয়ত রাত্রিকালে ভোজন করি। হে বিপ্র! দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহ কখনও অতিক্রম করিতে পারে না এই জন্যই আমি ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পুরুষ দুরাচার হইয়াও শীলসম্পন্ন হইতে পারে, জীবহিংসায় নিরত হইয়া ধার্ম্মিক হইতে পারে। রাজা স্বেচ্ছাচারী হইলেই প্রকৃতিপুঞ্জ অধর্ম্মাচারী হয় এবং মহান ধর্ম্ম সংকীর্ণ হইয়া যায়। আমাদের রাজা জনক ঋষিতুল্য ধর্ম্মাত্মা। ইনি অতি ন্যায়নিষ্ঠ, দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকেও ইনি ক্ষমা করেন না। ইহাঁর ধর্ম্মানুগত শাসনে প্রজাগণ সতত ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত রহিয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! যাহারা আমার প্রশংসা এবং যাহারা আমার পরিবাদ করে, তাহাদের সকলকেই আমি সাধু অনুষ্ঠান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকি।

হে দ্বিজসত্তম! সর্ব্বপ্রযত্নে মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ করিবে; প্রার্থনা না করিয়া অন্যের প্রিয় কার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইবে; কাম ক্রোধ ও রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া কখনও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না; প্রিয় সমাগমে অতিমাত্র আনন্দিত ও অপ্রিয় বিষয়ে অতিমাত্র সন্তাপিত হইবে না; দারুণ অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলেও মোহান্ধ হইয়া কদাপি ধর্ম্মকে অতিক্রম করিবে না; মোহবশতঃ যদি কখনও বিকর্ম্মে পতিত হইতে হয়, তবে পুনরায় তাদৃশ অন্যায় আচরণ করিবে না; যাহা কল্যাণজনক জ্ঞান করিবে তাহাতেই আপনাকে নিযুক্ত করিবে, পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবে না, প্রত্যুত সর্ব্বদা সাধুর ন্যায় আচরণ করিবে; পাপাচারী পামরেরা পাপানুষ্ঠান করিয়া আপনারাই বিনষ্ট হয়। যে সকল শ্রদ্ধাহীন নাস্তিক ব্যক্তি "ধর্ম্ম নাই" বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মশীল সাধুগণকে উপহাস করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে; অভিমান গর্ব্বিত মূঢ়েরা বিশাল ভস্ত্রার ন্যায় অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া থাকে, ইহারা নিতান্তই অসার; মানব পাপাচরণ করিয়া তন্নিমিত্ত অনুতাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে পরিমুক্ত হয়, 'পুনরায় আর এরূপ করিব না' এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পবিত্র হয়, এবং শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাও পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। হে ভগবন্! ধর্ম্মোৎপত্তি সম্বন্ধে উক্তরূপ শ্রুতিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্মশীল মানব প্রমাদবশতঃ পাপে পতিত হইলে ধর্ম্মই তাহাকে তাহা হইতে বিমুক্ত করেন। দুর্ব্বলতা বশতঃ পাপাচরণ করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য সমুৎসুক হইলে জলদজালবিনির্ম্মুক্ত পূর্ণকল চন্দ্রমার ন্যায় মানব সমুদায় দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত

হইয়া শোভা পাইতে থাকে। প্রভাকর আকাশে সমুদিত হইয়া যেমন সমস্ত অন্ধকার বিনাশ করেন সেইরূপ পুরুষ কল্যাণে শ্রদ্ধান্বিত হইলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! লোভই পাপের আশ্রয়-স্বরূপ, লোভের অধীন হইয়াই অজ্ঞ ব্যক্তিরা পাপাচরণে উদ্যত হয়। তৃণস্তোমাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় অধর্ম্মাচারী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের কপটবেশ ধারণ করিয়া থাকে। তাহারা বাহিরে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পবিত্রতা ও সতত ধর্ম্মালোচনারূপ আবরণে আপনাদিগকে আবৃত রাখে; কিন্তু প্রকৃত শিষ্টাচার ইহাদিগের মধ্যে অতিদুর্লভ।

কৌশিক ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে ধার্ম্মিকপ্রবর! তোমার কল্যাণ হউক। শিষ্টাচারের লক্ষণ কি, কি উপায়ে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা যথার্থরূপে বর্ণন করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। ব্যাধ বলিলেন, হে ভগবন্! দান, তপস্যা শ্রুতি চতুষ্টয় এবং সত্য, এই কএকটীই শিষ্টাচার বিষয়ে নিয়তই পবিত্র। শিষ্ট পুরুষেরা কাম ক্রোধ লোভ দম্ভ এবং কুটিলতার বশীভূত না হইয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মেতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন এই সাধুগণ প্রাচীন মহাপুরুষদিগের সুদাচারই অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের নিজের স্বতন্ত্র আচরণ কিছু নাই। ফলতঃ প্রাচীন মহাত্মাদিগের সাধু আচার প্রতিপালন করা শিষ্ট ব্যক্তির দ্বিতীয় লক্ষণ। হে দ্বিজোত্তম! গুরুশুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ ও দান, শিষ্টাচার পরায়ণ মহাত্মারা এই চারিটী বিষয় নিত্য অবলম্বন করেন, ইহাই শিষ্টাচারের প্রধানতম লক্ষণ। শ্রুতির সার সত্য, সত্যের সার দম, দমের সার ত্যাগ; শিষ্টাচারে এগুলি নিত্য প্রতিষ্ঠিত। হে বিপ্র! ধর্ম্মবিদ্বেষী বিমূঢ়বুদ্ধি নাস্তিকগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি জ্ঞানাবলম্বন পূর্ব্বক শিষ্টাচারসমন্বিত শ্রুতি ও ত্যাগশীল আচার্য্যগণের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করুন। যেহেতু সত্যনিষ্ঠ শিষ্ট ব্যক্তিরাই পরমা বুদ্ধির নিয়ন্তা স্বরূপ। বুদ্ধিযোগময় মহান ধর্ম্ম শিষ্টাচারের সহিত সম্মিলিত হইলেই অতীব শোভমান হয়। অহিংসাও সত্যভাষণ এই দুইটী সর্ব্বভূতের পরম হিতকর। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম তাহা সর্ব্বথা সত্যমূলক। সাধুগণ সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই যাবতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করেন সুতরাং শিষ্টাচারের অনুষ্ঠানে সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা অতি গুরুতর। শিষ্টগণের উপদেশ এই যে, যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহাই ধর্ম্ম, আর যাহা ন্যায়বিরুদ্ধ তাহাই অনাচার ও অধর্ম্ম। যাঁহারা ন্যায়সঙ্গত আচার সমন্বিত, তাঁহাদিগকেই সাধু শিষ্টাচারপরায়ণ বলা যায়। যাঁহারা ক্রোধশূন্য অসূয়াশূন্য নিরহঙ্কার মাৎসর্য্যশূন্য সরল স্বভাব ও অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নশীল, তাঁহারাই শিষ্টাচারী। শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত পরম ধর্ম্ম এবং শিষ্টগণের অনুষ্ঠিত সাধু আচার, ধর্ম্মের এই দ্বিবিধ লক্ষণ। কি বেদবিদ্যালোচনা, কি কি তীর্থাবগাহন, কি সত্য সরলতা ক্ষমা ও পবিত্রতা, সকল বিষয়েই সাধুগণের সদাচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা মিষ্টভাষী সর্ব্বভূতে দয়াযুক্ত এবং হিংসাশূন্য তাঁহারাই শিষ্ট-সম্মত শিষ্ট পুরুষ। যাঁহারা ন্যায়ানুগত, বিবধ সদ্গুণযুক্ত সর্ব্বলোকহিতানুরত আত্মম্ভরিতাদি দোষশূন্য তাঁহারাই শিষ্টানুমত শিষ্ট পুরুষ। সাধুস্বভাব মহাত্মাগণ লোকযাত্রা ধর্ম্ম এবং আত্মহিত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক উপরিউক্ত

শিষ্টসম্মত সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করেন। সৎপাত্রে দান, সদা সত্য বাক্য এবং অদ্রোহ, এই তিনটীই সাধু-সজ্জনগণের পরম সিদ্ধান্ত। অহিংসাদি গুণযুক্ত কাম-ক্রোধাদি বিবর্জ্জিত সাধু ব্যক্তিগণ লোক-সমুদায়ের সাক্ষী-স্বরূপ। তাঁহারা প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা বিচিত্র লোক চরিত্র অবগত হইয়া মহদ্ভয় হইতে বিমুক্ত হন। হে ব্রাহ্মণ! আমি সাধুমুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, এবং এ বিষয়ে আমার যাদৃশ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তদনুসারে আপনার নিকটে শিষ্টাচারের গুণকীর্ত্তন করিলাম।

ব্রাহ্ম সন্ন্যাসী।

গীতায় উক্ত হইয়াছে যিনি নিরগ্নি ও অক্রিয় বাস্তব পক্ষে তিনি সন্ন্যাসী নহেন যিনি সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন তিনিই সন্ন্যাসী। এই গীতাপ্রমাণে ইহাই নির্ণীত হয় যে, সংসারীর পক্ষেই এই সন্ন্যাসবিধি। তুমি ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর, নিজের নিমিত্ত তাহার কিছুমাত্র অবশেষ রাখিও না তাহা হইলেই তোমার কর্ম্মসন্ন্যাস হইল। কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলেই একটী ধ্যাননিরত নিরুদ্যম ও নিষ্কর্ম্মা পুরুষ আজ কাল অনেকেই বুঝিয়া থাকেন। ফলত ইহা বড় ভ্রান্ত সংস্কার। কোনও প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ কথার বিশেষ প্রমাণ নাই। যাহাই হউক উল্লিখিত রূপ কর্ম্মসন্ন্যাসীরাই দেশের উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই মোক্ষশাস্ত্র ও ব্যবহার শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাঁরা রাজবিধি ও প্রজার দুঃখ দুইই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রোগীর রোগমুক্তি, বিপন্নের উদ্ধার, অজ্ঞানের মোহবিনাশ ও দুরাচারের চরিত্রশুদ্ধিকল্পে ইহাঁরাই ব্যগ্র থাকিতেন। দেশহিতকর যা কিছু কার্য্য সকলেতে ইহাঁদেরই হস্ত ছিল। ইহাঁরা স্ত্রীপুত্রে পরিবেষ্টিত ও সংসারধর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিয়া যাবদীয় কর্ম্ম ব্রহ্মেই অর্পণ করিতেন তজ্জন্যই ইহাঁরা সন্ন্যাসী। বর্ত্তমানে ব্রহ্মপিপাসু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এইরূপ সন্ন্যাসীর শ্রেণী থাকা আবশ্যক। যোগ ও কর্ম্ম ইহাঁদিগের প্রধান পরিচায়ক লক্ষণ হইবে। এক্ষণে কিরূপে তাহা সাধন করিতে হইবে এই প্রবন্ধে তাহারই দুই একটী ইঙ্গিত মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

লোকপ্রীতিই কর্ম্মের নিদান। তদ্ব্যতীত কর্ম্ম ফলপ্রসূ হয় না। এদিকে সংসারী মনুষ্য মায়ামোহে আত্মীয় স্বজনেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সে চেষ্টা করিলেও পরার্থকে সহজে স্বার্থ করিয়া লইতে পারে না। কিন্তু পরার্থপ্রতিপাদনই প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মসাধন। এই মহান উদ্দেশ্যে আপনাকে প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রে সম্যকদর্শী হওয়া চাই। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে দেখাই সম্যক্‌দর্শন। যিনি ঈশ্বরকে এইরূপে সর্ব্বভূতস্থ না দেখেন তাঁহার হৃদয় কখন প্রসারিত হয় না। কাজেই নির্বিশেষ উদার লোকপ্রীতি তাঁহা হইতে বহু দূরে থাকে। বলিতে কি, একমাত্র এই সম্যক্‌দর্শনই বিশ্বপ্রেমের মূল। সর্ব্বভূতে প্রিয়তম ঈশ্বরের স্ফূর্ত্তি দেখিলে সহজে সকলেই প্রিয় হইয়া যায়; মনে বিরাট বিশ্বপ্রেমের আবির্ভাব হয়। ইহার প্রভাবে কেবল মনুষ্য নয়, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তরুগুল্মাদি পর্য্যন্ত সকলেই আপনার

হইয়া থাকে। ইহার বলেই তপোবন-লালিতা কণ্বদুহিতা শকুন্তলা বৃক্ষমূলে জলসেচন করিবার কালে কহিয়াছিল এই সমস্ত জড় মূকের সেবায় আজ আমার নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন করা হইবে। পূর্ব্ব-কালের কথা কেন এখনও এক জন ধর্ম্মিষ্ঠ হিন্দু নির্ব্বিশেষে সমস্ত মনুষ্যকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন, চতুষ্পথে পশু পক্ষ্যাদির জন্য পূজোপহার প্রদান করেন, কীট পতঙ্গাদির উদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ ভুক্তাবশেষ রাখিয়া থাকেন, বাস্তু বৃক্ষের কথা কি, ফলফুলে পুষ্ট কোন বৃক্ষই তাঁহার ছেদ্য নয় এবং প্রতিদিন চরাচরের সমস্ত জীবের উদ্দেশে এক গণ্ডুষ জল না দিয়া নিজে কদাচ জলস্পর্শ করেননা। ফলত পূর্ব্বোক্তরূপ সম্যকদর্শনই এইরূপ প্রসারিত প্রীতির মূল। ইহা দ্বারা সকলে সহজেই আপনার হইয়া যায়। তখন সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করে এবং মনুষ্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত কর্ম্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত অহঙ্কারলোপ। অহং ইত্যাকার জ্ঞান হইতেই মনুষ্যের স্বপর-সম্বন্ধ ও ফলাকাঙ্ক্ষা দুইই দাঁড়াইয়া যায়। কাজেই সে স্বার্থপ্রবণ হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ সম্যকদর্শনেই আত্মবিলোপ সম্পূর্ণ সম্ভব। যিনি সর্ব্বভূতে এবং তদন্তর্গত আপনাতে সকল শক্তির মূলশক্তি, চেতনের চেতন এবং প্রাণের প্রাণরূপে কেবল মাত্র ব্রহ্মকে দেখেন এবং সকল ঘটনা সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ ও নিয়ামকরূপে কেবল তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন তাঁহারই সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। ফলত এইরূপে আত্মলোপ না হইলে মনুষ্যের স্বপরসম্বন্ধ ও ফলাকাঙ্ক্ষা ঘুচে না এবং সে পরার্থকে স্বার্থ জ্ঞান করিতে পারে না। দেখিতে পাই আজ কাল জনসমাজে লোকহিতকর এমন অনেক কার্য্যেরই সূত্রপাত হইতেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি অঙ্কুরোদ্গমেই কোন কোনটা বা অর্দ্ধ সমাপ্তির অবস্থাতেই নষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল প্রত্যেক কার্য্যের মূলে প্রবল অহংভাব। ইহা দ্বারা তৎ তৎ কার্য্যের ফলাকাঙ্ক্ষা দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং লোকের হিত-সাধন প্রকৃত উদ্দেশ্য নয় কেবল নিগূঢ় আত্মহিত। ফলত নিরাকাঙ্ক্ষ ও নিরাশী না হইলে ঈশ্বরপ্রসাদে কোন কার্য্যই সুফল প্রসব করে না। প্রায়ই অঙ্কুরোদ্ভেদে তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। চৈতন্য বুদ্ধ প্রভৃতি মহাজনেরা অগ্রে আত্মবলি দিয়াই প্রচারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের কার্য্য ফলপ্রসূ হইয়াছিল। দূরের কথা কেন, বর্ত্তমানেই ইহার নিদর্শন আছে। পূর্ব্ববয়সে বিষয়বিরাগী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেবল এদেশের ভাবী মঙ্গলের জন্য মুক্তিপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন। লোকের মঙ্গল ভিন্ন তাঁহার স্বার্থাভিসন্ধি আদৌ ছিল না। তাই আজ তাঁহার স্বহস্তবর্দ্ধিত সেই সুমহান বৃক্ষ শাখাপ্রশাখায় এদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এবং অনেকেই তাহার আশ্রয়ে আসিয়া আপনার তাপিত হৃদয় সুশীতল করিতেছে।

তৃতীয়ত সমদর্শিতা। মানুষ যখন একাকী থাকে তখন তাহার নিজের সম্বন্ধে একটা বৈশিষ্ট্য বুদ্ধি জন্মিতে পারে না। অন্যের সঙ্ঘর্ষেই ইহার উৎপত্তি। সুতরাং জনসমাজে থাকিয়া সমদর্শী হওয়া মনুষ্যের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ধনমান পদমর্য্যাদা বংশগৌরব প্রভৃতি দ্বারা সাধারণ্যে একটা স্বাভাবিক উচ্চ নীচতা দাঁড়া-

হইয়া আছে। এই বিষম বাধা ভগ্ন করিয়া সমদৃষ্টিতে সকলকে দেখা যার পর নাই কঠিন কথা। আবার সমদর্শী না হইলেও স্বকার্য্যে ঔদার্য্য রক্ষা করা কখন সম্ভবপর হয় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রূপ সম্যকদর্শন হইতেই সামাজিক এই উচ্চনীচতার ভাব দূর হইবে। যিনি প্রত্যেকের অন্তরে কেবল এক নির্ব্বিশেষ জ্ঞানময় কারণের স্ফূর্ত্তি দেখেন তাঁহার নিকট আর কোন ও রূপ উচ্চ নীচতা স্থান পায় না। কারণ জগতে যত প্রকার ব্যবধান আছে সমস্ত নষ্ট করিয়াই সম্যকদর্শিতা সিদ্ধ হয়। যিনি সম্যক্‌দর্শী সমভাবে সকলকে দেখা একমাত্র তাঁহারই ঘটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সমদর্শিতা একটা অলীক ও অমূলক কথা মাত্র। বলিতে কি, এক সময়ে হিন্দুর অস্থিমজ্জায় এই মহৎ ভাব প্রবিষ্ট ছিল। তাহারই প্রভাবে সে আজিও কোনও ধর্ম্ম বা সামাজিক উৎসবে সকল ব্যবধান দূর করিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আগন্তুক মাত্রেরই সৎকার করিয়া থাকে। তৎকালে স্বপরভেদ তাহার আর কিছুমাত্র থাকে না।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি লোকপ্রীতি, আত্মবিলোপ ও সমদর্শিতা এই তিনটী না থাকিলে কর্ম্ম সহজসাধ্য হয় না। ব্রাহ্ম সন্ন্যাসীর অন্যান্য ব্যবহারিক সদ্গুণের মধ্যে মুখ্যত এই কএকটী অনন্যসাধারণ গুণ থাকা বিশেষ আবশ্যক। এতৎ ব্যতীত তাঁহাকে আরও একটী কঠিন ও কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা সমস্ত বল পৌরুষের মূল ব্রহ্মচর্য্য। হিন্দুশাস্ত্রে গৃহীর পক্ষেও তাহার সম্যক্ বিধান আছে। ফলত তেজোধাতু নিরুদ্ধ করিতে না পারিলে কর্ম্মক্ষেত্রে বলবুদ্ধি কিছুই আসিবে না। জগতে যত কিছু কল্যাণ আছে সমস্তেরই পৃষ্ঠবংশ এই ব্রহ্মচর্য্য। ঐ দেখ আজিও একজন জরাজীর্ণ অশীতিপর বৃদ্ধ কুরুপিতামহ ভীষ্মের ন্যায় বসিয়া আছেন। তিনি প্রকৃত কর্ম্মসন্ন্যাসী। বিপুল ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে এরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসের নিদর্শন বর্ত্তমানে আর পাইবে না। তাঁহাকে আদর্শস্থলে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও এবং পৃথিবীর জন্য যা কিছু করিবে প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরেরই জয় ঘোষণা কর।

উপসংহারে কর্ম্মস্বরূপ বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় জগতে দুঃখেরই ভাগ অধিক। তৎসমস্তেরই মূল মোহ। যাহা বাস্তবিক অসৎ এই মোহপ্রভাবে তাহাতে সদ্বুদ্ধি স্থাপন করিয়া লোকে নিরর্থক কষ্ট পায়। এই মোহনিরাসেই লোকের সমস্ত দুঃখের বিনাশ হইবে। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত ইহা কিছুতেই নিরস্ত হইবার নয়। সূর্য্যপ্রকাশই অন্ধকার দূর করিতে পারে। অতএব উদ্যমী হইয়া লোকের গৃহে গৃহে পার্থিব সম্বন্ধের অনিত্যতা রটনা কর। এই সমস্ত অস্থায়ী ও অনিত্যের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মই যে স্থায়ী ও নিত্য এই ভাব প্রত্যেকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করাইয়া দেও, দেখিবে কোনও রূপ দুঃখের উপাদান আর তাহাকে ব্যথিত করিতে পারিবে না। পার্থিব ক্ষতিলাভ সকলই তার সমান জ্ঞান হইবে এবং সে সর্ব্বাবস্থায় আত্মতুষ্টি লাভ করিবে। এই মোহবিনাশই ব্রাহ্ম সন্ন্যাসীর সকল কার্য্যের মধ্যে মুখ্য কার্য্য। এইরূপে চলিলে তাঁহার যোগ ও কার্য্য উভয়ই সুসিদ্ধ হইবে।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মে মর্ম্মে অবতারবাদ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া

চৈতন্যদেব পর্য্যন্ত অবতার-শ্রেণীর অন্তর্গত। অবতারগণ স্বয়ং ব্রহ্ম তাঁহাদের পার্থিব ক্রিয়াকলাপের নাম লীলা। শাস্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণের লীলার যেরূপ আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, অন্যান্য অবতারের তত নহে। এই সকল দেবতা ও তাঁহাদের লীলার বহিরাবরণ ভেদ করিয়া মূলে পৌঁছান সহজ না হইলেও সম্ভবপর বটে। বিশেষতঃ একই অবতারের বিষয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাস্ত্রকারগণের দ্বারা সংরচিত হওয়ায় কোন্‌টা কবিকল্পনা কোন্‌টা প্রকৃত, কোন্‌টা অপ্রকৃত, তাহা সহজেই স্থিরীকৃত হইতে পারে। এই জন্য আমরা রামচরিত্রের মৌলিক অবস্থা হইতে তাঁহার অবতারত্ব সংস্থাপনা পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলি আলোচনা করিব এবং শাস্ত্রকারের হাতে পড়িয়া মনুষ্য চরিত্র কেমন করিয়া দেবতা চরিত্রে অবতারবাদে সহজে পরিণত হইতে পারে তাহারও আভাস দিব। কাশীরামদাস বা কীর্ত্তিবাসের হস্তে, অথবা কথকের রচিত পুঁথিতে রামচরিত্র যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে; তাহা আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিব না। সে গুলি সম্যক শাস্ত্রমূলক নহে, মূল গ্রন্থই আমাদের গ্রাহ্য।

রামচরিত্র আমাদের দেশীয় জনগণের মধ্যে বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলে জাতীয় চরিত্র গঠনে যেরূপ আনুকূল্য ও সাহায্য প্রদান করিয়াছে, তাহাতে রামকে সহজেই দেবতা বলিতে ইচ্ছা হয়। অপরিসীম পিতৃভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, প্রজাবৎসলতা, ভ্রাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম, ধৈর্য্যবীর্য্য, সকল গুলিই এত অধিক পরিমাণে তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয়, যে তাঁহাকে মনুষ্যের মধ্যে স্থান দিতে মনের মধ্যে বিষম সঙ্কোচ আইসে। একদিকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার জন্য সকল আয়োজন, অন্যদিকে কৈকেয়ীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের বনগমন, একদিকে রাজকুমার হইয়া দুর্গম ভীষণ অরণ্যে অবস্থিতি, অন্যদিকে রাক্ষসাধিপতি কর্ত্তৃক সীতাপহরণ, একদিকে লঙ্কার মহাসমর, তাহার উপরে শক্তিশেলে আবদ্ধ লক্ষ্মণের মুমূর্ষু কাল, একদিকে রাবণবধান্তে সীতাকে লইয়া রাজ্যপালন অন্য দিকে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রজাসাধারণের পরীবাদ রটনা; একদিকে কঠোর কর্ত্তব্য আর একদিকে মনুষ্য হৃদয়ের কমনীয়তা—এই সকল উপাদান লইয়া রামচরিত্র সংরচিত। যে সকল গুরুবিপদের কোন একটি ঘটিলে মনুষ্যকে এককালে ধরাশায়ী করে, রামের জীবনে তাহার শত শতটি ঘটিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্বাভাবিক সত্যনিষ্ঠা ও গাম্ভীর্য্যের খর্ব্ব হয় নাই। ইহারই জন্য রামের পবিত্র নাম আমাদের প্রতি হৃদয়ে জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত, ইহারই জন্য পশ্চিমাঞ্চলের সত্যনিষ্ঠ বীরজাতির হৃদয় রামের নামে এত পুলকিত। পশ্চিমাঞ্চলের বীরজাতি যদি একাধারে ধৈর্য্য বীর্য্য, সারল্য, প্রজাবৎসলতা প্রভৃতি এতগুলি দেবোপম সদ্‌গুণ না পাইত, তাহা হইলে তাহাদের পরিণাম যে কি হইত তাহা ভাবিলে গাত্র শিহরিয়া উঠে। তন্ত্রের বন্ধন, পুরাণের নিগড় কোন মতেই তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিত না। এক ভয়াবহ নাস্তিকতা সমস্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রাজত্ব করিত। এক রামের নামে তাহাদের চক্ষু হইতে দরদরধারায় অশ্রুধারা বিগলিত হয়, এক রামের নামে তাহাদের বীরহৃদয় নাচিয়া উঠে, এক রামের নামে তাহাদের পতিপত্নীপ্রেম সজীব হইয়া উঠে, এক রামের নামে রাজভক্তি ও প্রজাবৎসলতা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, এক রামের নামে কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া পড়ে, এক রামচন্দ্রে তাহারা দেবত্ব ও আদর্শ মনুষ্যত্ব উভয়ই দেখিতে পায়। ইহারই জন্য তুলসীদাসের গাথা তাহাদের এত প্রিয় এবং তুলসীদাসের রামায়ণ তাহাদের এত তৃপ্তিপ্রদ।

যাঁহারা রামের দেবত্ব সংস্থাপনে সমুৎসুক, তাঁহাদের নিকটে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে অতি পূর্ব্বতন রামায়ণাদি গ্রন্থে সেরূপ একটা বিশেষ উদ্যোগ বা চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। যতই সময় অতিবাহিত হইয়া আসিযাছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রামা-

বতার পরিস্ফুট হইয়া আসিয়াছে। বাল্মীকীয় রামায়ণে যাহা আছে অধ্যাত্ম রামায়ণে তাহার আতিশয্য, যাহা আবার তাহাতে নাই তাহা কাশীদাস ও কীর্ত্তিবাস বিরচিত রামায়ণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার তাহাতে যাহা নাই তাহা কথকের মুখে শ্রুত হওয়া যায়। এইরূপে রামাবতারের পূর্ণ অভিব্যক্তি ক্রমেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কাশীদাসী বা কীর্ত্তিবাসী রামায়ণের অথবা কথকের কল্পনার আমরা নিন্দাবাদ করিতেছি না। প্রত্যুত ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে যখন সংস্কৃত চর্চ্চা এদেশে ম্লানভাব ধারণ করিল, উপর্য্যুপরি রাজবিপ্লবে অজ্ঞানান্ধকার অজ্ঞাতসারে সমস্ত বঙ্গের মুখ আবৃত করিয়া ফেলিল, যখন তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপের প্রহেলিকা সে অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর করিয়া তুলিল, সে সময়ে বঙ্গভাষায় প্রণীত রামায়ণ সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সুখতারা হইয়া জ্বলিতে লাগিল। গৃহস্বামী গৃহকার্য্য সমাপনান্তে স্ত্রী পুত্র পরিবৃত হইয়া কাশীদাসী বা কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ পড়িতেছে, কখন বা হর্ষে উৎফুল্ল হইতেছে, পরক্ষণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, কখন বা রামের সারল্যে সত্যনিষ্ঠায় স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে, পণ্যব্যবসায়ী ক্রয় বিক্রয় করিবার মধ্যে যতই অবসর পাইতেছে, অমনি রামায়ণ লইয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে, এ দৃশ্য বাস্তবিকই নিরতিশয় প্রীতিকর। এই সকল গ্রন্থের প্রভাবে বঙ্গীয় সমাজের চরিত্র গঠনের যে বিশেষ আনুকূল্য হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মধ্যে নাটকাদি প্রকাশিত হওয়ায় যদিও সে ভাবের কতকটা অন্তরায় ঘটিয়াছিল, তথাপি ধর্ম্মপুস্তক পাঠে সাধারণের অনুরাগ আবার দেখা দিয়াছে। অভিনয় ক্ষেত্রে কল্পনা প্রসূত নাটক প্রভৃতির পরিবর্ত্তে শাস্ত্রমূলক গ্রন্থ বা সাধুচরিত্র অভিনয়ে সাধারণের আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে এবং এদেশীয় প্রকৃতিতে যে তাহাদের বিশেষ উপযোগিতা আছে, সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

ক্রমশঃ।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

(শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য)

(জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকার পর)

বিকাও তাঁহার পদে, হও তাঁর দাস।
তাঁহার নিকট ভৃতি না করিও আশ।
সেবা কর প্রাণপণে, তিনি আসি সঙ্গোপনে,
দিবেন তোমারে হৃদি তাঁর সহবাস॥

তাঁর সুধা সহবাস, প্রসন্ন নয়ন।
তাঁহার আশ্বাস বাণী, অমিয় বচন।
এই তাঁর ভৃতি ল'য়ে, থাক তাঁর দাস হ'য়ে,
এ ভৃতি নহে কি তব মনের মতন?

তিনি যে পরম গতি পরম সহায়।
তরান আশ্রিত জনে দিয়া পদ ছায়।
তিনি বন্ধু সখা হন, জীবনের রসায়ণ,
জনম সফল হবে তাঁহার সেবায়॥

স্বাধীন করিয়া তিনি আত্মারে সৃজন।
থাকেন প্রহরী রূপে তাহে অনুক্ষণ।
মজিয়া বিষয় মদে, পড়িয়া পাপের হ্রদে,
পাছে মোরা সারা হই—করেন রক্ষণ॥

যে জন আপনা জানি পাপেতে প্রবণ।
কাতরে তাঁহারে করে আত্ম সমর্পণ॥
বলে "নাথ! পাপ তাপ নাশহ আমার।
তুমি বিনা পাপ নাশে হেন সাধ্য কার?
এস হে হৃদয়-নাথ! হৃদয়ে আমার।
আমারে করিয়া লও একান্তে তোমার॥"
দয়াময় তার হৃদি করি অধিষ্ঠান।
তাঁহার অমৃত পথে তারে লয়ে যান॥
দেন বল প্রলোভনে করিতে দলন।
মলিনতা ক্ষুদ্রভাব করিতে বর্জ্জন॥
ভক্তের হৃদয় তাঁর চির বাস স্থান।
আপনারে ভক্তে তিনি করিছেন দান॥
ভক্তের হৃদয়ে কিবা আনন্দ লহরী।
দশ দিকে হেরে সেই প্রেমময় হরি॥
ভক্তে দেন দয়াময় তাঁহার প্রসাদ।
ভক্তের ঘুচায়ে দেন সকল বিষাদ॥
স্বর্গের এখানে তারে দেন আস্বাদন।
ভক্তের হৃদয়ে প্রভু বলেন বচন॥

স্বর্গ হ'তে স্বর্গে তারে যাবেন লইয়া।
তুষিবেন সদা তারে প্রেম-অন্ন দিয়া॥

যে জন চাহে না তাঁরে—পাপেতে মগন।
তারেও না ত্যাগ তিনি করেন কখন॥
কভু অনুতাপে বিদ্ধ করেন তাহারে।
দণ্ডদেন কভু ফেলি যন্ত্রণা পাথারে॥
ক্লেশ হ'তে ক্লেশে যবে হয়ে উচাটন।
পাপ ত্যাগ করে সেই হইয়া চেতন॥
কান্দিয়া তাঁহারে ডাকে করিতে উদ্ধার।
দয়াময় ঢালি দিয়া কৃপা বারি ধার॥
তাহার মলিন আত্মা করেন শোধন।
প্রকাশেন তাহে তাঁর প্রসন্ন বদন॥
হে জীব! তাঁহার দয়া বলা নাহি যায়।
মহা পাপী তরে যায় তাঁহার কৃপায়॥
আত্মার ভেষজ তিনি সন্তাপ হরণ।
অমৃতের বিন্দু তিনি করিয়া প্রেরণ॥

আত্মার সকল রোগ করেন বিনাশ।
স্বরগের বল তাহে করেন বিকাশ॥
যে বল পাইয়া আত্মা লৌহ-দণ্ড প্রায়।
সংসার-কণ্টক দলি তাঁর পথে ধায়॥
তিনি মুক্তি বরাভয় লইয়া হাতেতে।
ডাকিছেন সবে যেতে তাঁহার পথেতে॥
তাঁর পদতল ছায়া কিবা প্রাণারাম।
চল সবে তথা গিয়া করিগে বিশ্রাম॥
সে ছায়ায় তপ্ত গাত্র সুশীতল হবে।
সংসারের জ্বালা তথা আর নাহি রবে॥
ভজ তাঁরে তিনি তোমা দিবেন সুমতি।
অন্তে করিবেন তিনি তোমার সুগতি॥
আপন অমৃত ধামে লইয়া তোমারে।
দিবেন কতই সুখ কে বলিতে পারে॥

ইতি দ্বিতীয় প্রকরণের প্রথম ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

সাংখ্য স্বরলিপি।

স্বররাজ্যে যোগ।

স্বররাজ্যে যোগ সাধারণ সম্পত্তি। বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল স্বর সমূহ নানারূপে যুক্ত হইয়া সঙ্গীতরাজ্যে মহাকার্য্য করিতেছে। ছেদ-যোগ, টানযোগ, খণ্ডযোগ, গুণযোগ প্রভৃতি নানা প্রকার যোগসাধনের দ্বারা সুর সকল সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছে।

ছেদ-যোগ।

ছেদ-যোগই স্বররাজ্যে সাধারণ ও স্বাভাবিকযোগ। ইহা সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বা পৃথকভাবে অবস্থিত স্বরসমূহের ছিন্নপ্রাণকে সাধারণ যোগসূত্রে আবদ্ধ করে।

টান-যোগ।

দুই বা ততোধিক একই সুর পর-পর থাকিয়া যদি মিলিয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের সেই মিলনকে অথবা যখন একটী সুর পর-পর সুর সমূহকে পরে-পরে বা ক্রমে ক্রমে স্বীয় করিয়া লয় তখন সেই স্বরের স্বী-করণকে অথবা যখন কোন একটী স্বর পরবর্ত্তী মাত্রাসমূহে স্বীয় সুর-প্রবাহ বিশেষরূপে যোগ করিয়া দেয় তখন স্বরের সেই যোগকে সুরের বিশেষযোগফল বা টানফল অথবা বিশেষযোগ বা টান কহা যায়।

খণ্ডযোগ।

যখন একটি সুর হ্রস্ব মাত্রিক ভাবে যাইয়া অপর একটি মুখ্য সুরকে আলিঙ্গন বা স্পর্শ করে তখন সেই যে যোগ তাহাকে সুরের খণ্ডমাত্রিক বা হ্রস্বমাত্রিক অথবা সংক্ষেপে খণ্ড বা হ্রস্বযোগ কহা যায়।

গুণযোগ।

যখন দুইটি স্বরগুণ বা স্বরধর্ম্ম যুগপৎ যুক্ত হইয়া যায় তখন তাহাদের সেই যে যুগপৎযোগ তাহাকে স্বরগুণযোগ বা স্বরগুণন কহা যায়।

ছেদযোগের চিহ্ন= (—) বা (,) বা (পরিমিত বা নিয়মিত ব্যবধান)। পূর্ব্বে এইছেদ যোগের চিহ্ন ও টানযোগের চিহ্ন তেমন বিশেষ- রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয় নাই এখন ভিন্ন ভিন্ন যোগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপ ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া দেওয়া হইল।

এই ছেদযোগ চিহ্নকে যোগাত্মক বিয়োগচিহ্ন বা সাধারণতঃ সংক্ষেপে গৌণভাবে স্বরবিয়োগ চিহ্ন ও কহিতে পারা যায়।

টানযোগের চিহ্ন= (+) শুদ্ধযোগচিহ্ন রহিল। কারণ টানযোগটী শুদ্ধ-যোগচিহ্ন। এই শুদ্ধযোগচিহ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায় ইহা কিরূপ অর্থব্যঞ্জক; ইহা যেন ছেদযোগের উপর বিরক্ত হইয়া যোগের ছেদটী কর্ত্তন করিতেছে—যোগের ছেদশনির উপর অশনি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ছেদটুকুর হীনতা জাগাইয়া পর-পর শুদ্ধযোগ রক্ষা করিতেছে। এই কারণে এই শুদ্ধযোগ চিহ্নকে সংস্কৃত বজ্র চিহ্ন নামেওঅভিহিত করা যাইতে পারে।

খণ্ডযোগের চিহ্ন=লুপ্তস্বরের সহিত হসন্তচিহ্ন।

গুণযোগ বা গুণনের চিহ্ন=(×)। এই চিহ্নটী গুণনের প্রথম ও প্রধান চিহ্ন। এই চিহ্নের ভাব যেন যুগপৎ পরস্পরের আলিঙ্গন বা স্পর্শভাব।

ছেদযোগে স্বরের অবস্থা।

ছেদযোগে স্বর সকল কেমন পর-পর মধুরভাবে এবং যেন ঈষৎ কম্পিত আন্দোলিত বা তরঙ্গায়িতভাবে চলিয়া যায়। একই স্বরের ছেদযোগে স্বরসকলের গতিভাব প্রায় টানাভাবের কাছাকাছি যায় সেই কারণে একই স্বরের বেলায় ছেদযোগ যেন টানা ভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া প্রায় অনেক সময় কেমন অনায়াসে, তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসে।

নদীর জল যখন মৃদু তরঙ্গায়িত বা মৃদুকম্পিত থাকে তখন আমরা যেমন সচরাচর তাহাকে প্রায় স্থিরই বলিয়া থাকি, তাহার সেই মৃদু সরল কম্পিত ভাব তেমন বক্তব্যের মধ্যেই আসে না সেইরূপ একই স্বরের ছেদযোগে মৃদু-কম্পন বা মৃদুতরঙ্গ তাহাদের টানাভাবের তেমন ক্ষতিকর নহে, প্রত্যুত অনেক সময়ে টানাভাবের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য উদ্রেককারী হয়।

একাক্ষর বা একাঘাতের বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া স্বর সমূহ প্রকাশ করিবার সময় আশচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই একাক্ষর বা একাঘাতের স্বর সমূহের বন্ধনেই যাহা আশের বিশেষত্ব তাহা না হইলে আশের আর কি আবশ্যক? সাংখ্য স্বরলিপির ছেদযোগেই আশের যোগাত্মক বিয়োগ ভাবের কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়া যায়। একাক্ষর বা বা একাঘাতের আকর্ষণে স্বরসমূহকে আকৃষ্ট রাখিবার জন্য আশেরচিহ্নের যথার্থ আবশ্যক তাই আশের জন্য বিশেষ চিহ্ন করা গেল:—তাহা আশের পূর্ব্বের চিহ্ন কসি চিহ্নই কেবল প্রভেদ, এখন তাহা আকার কসি (অর্থাৎ সমতল-ভাবে স্থাপিত আকার); ইহাতে সুবিধাই হইল—ইহা আরও আশব্যঞ্জক হইল। কিন্তু গানের বেলায় গানের সঙ্গে সঙ্গে কথা থাকিলে কথার অক্ষর ও তাহার মাত্রাসমূহ দ্বারাই বস্তুত আশের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং সে স্থলে আশের চিহ্ন না দিলেও চলে।

আশের অতিরিক্ত চিহ্ন ⌣ বা ⌢ অর্থাৎ ন্যুব্জ বা কুব্জ বন্ধনী চিহ্ন রহিল।

ঘনস্বর।

যখন তিনটী সর্ব্বতোভাবে তুল্যস্বর গুণিত হয় তখন তাহাদের সেই গুণফলকে ঘনস্বর কহে। ঘনস্বরের চিহ্ন=স্বরের ঠিক পার্শ্বে ঈশানকোণে তিনসংখ্যা। কিম্বা স্বরের ঠিক পার্শ্বে তিনসংখ্যার উপরে বিন্দু বা ফুট্‌কি। যথা

সা৩ = সা৩ = সা × সা × সা।

রাগিণী দেওগিরি—তাল সুরফাঁকতাল।

দেবাধিদেব মহাদেব
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা
মহাসভা অনন্ত আকাশে
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে।

তালি। ১ঃ (স্থা, স্ত আরম্ভ)। ২। ৩।
মাত্রা। ৪ । ২। ৪।

(স্থা) গা গা গা মা। গা রে। গা রে সা২। সা নি ন্‌রে২। রে২। সা½ নি½ রে সা সা।
২.... ২
(স্থা) দে বা — ধি। দে —। — — ব। ম হা দে। —। — — — ব —।

২...
। সা গা২ গা। গা২। গা গা গা গা। গ্মা রে গা মা। ম্পা মা। গা রে সা সা। (স্ত) সা সা স্‌সা২।
। অ সী ম। স। ম্প দ অ সী। ম — ম হি। মা —। — — — —। (স্ত) ম হা স।

। সা২। সা সা সা সা। সা সা সা সা। সা নি। রে সা সা সা। গা গা গা গা। গা২।
। ভা। ত — ব অ। ন — স্ত আ। কা —। — — শে —। কো টি ক ণ্ঠ। গা।

। গ্মা রেঁ গা গা। গ্মা রে গা গা। গা মা। পা মা গা রে½ সা½। গাঃ
। হে — জ য়। জ য় জ য়। হে —। — — — — —। দে

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৫।

৬১৪ সংখ্যা,   ১৮০৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তপস্যা ও ব্রহ্মদর্শন।

এখন আমাদিগের দেখিতে হইবে যে, তপস্যা বস্তুটা কি? ইতিপূর্ব্বে যে বৈদিক কালের কথোপকথন উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বে তপস্ শব্দে গভীর চিন্তা বা একাগ্রচিত্তে আলোচনা এইরূপ কোন অর্থ বুঝাইত। পরে যখন পাতঞ্জলাদি দর্শনের কাল আসিল, তখন তপস্ শব্দের অর্থে ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, মৌন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, দ্বন্দ্বসহন ও মিতাহারাদি হইল। ক্রমে পৌরাণিক কালে তপস্যার অন্তর্নিহিত ভাব সকল বিকৃত আকার ধারণ করিয়া শারীরিক ক্লেশসহন ও ক্ষয়করণে পর্য্যবসিত হইল। এই পৌরাণিক সময়ে তপস্যা এরূপ বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছিল যে গীতাকার ইহার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রকৃত তপস্যা কি, তাহাও তিনি সুন্দররূপে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি তপস্যাকে শারীর, বাঙ্ময় ও মানস, এই ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শারীর তপস্যা কি?—

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৭ম অ।

দেব, ব্রাহ্মণ, গুরু ও পণ্ডিতদিগের পূজা, শুচিতারক্ষা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা এই সকল শারীরিক তপস্যা বলিয়া কথিত হয়। ইহার মধ্যে শরীরকে বলহীন করিবার কথা কোথায়? বাঙ্ময় তপস্যা কি?—

"অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৭ম অ।

লোকের অভয়জনক বাক্য, সত্য বাক্য ও লোকের মনোরঞ্জক অথচ হিতকর বাক্য এবং বেদাদি পাঠ, ইহাই বাঙ্ময় তপস্যা। মানস তপস্যা কি?—

"মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, অযথা প্রলাপ না করা, আত্মসংযম এবং অন্তরে সাধুভাবকে স্থান দেওয়া, এই সকল মানস তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

গীতাতে আমরা তপস্যার যে ভাব দেখিতেছি, তাহার কোথায় পৌরাণিক বিকৃত ভাব আছে—কোথায়ও নাই।

গীতাতে যেভাবে তপস্যাচরণ করিবার কথা আছে, তাহা কেমন স্বাভাবিক এবং সুতরাং কেমন সত্য। গীতা রচিত হইবার কালে তপস্যার অর্থ এতদূর বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে সাধারণে বুঝিত শরীরকে ক্লেশ প্রদান করিয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হওয়ার নামই তপস্যা। গীতাকার সেই কারণে শরীরশোষক কুতপস্বীদিগকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, যে সকল ব্যক্তি দম্ভাহঙ্কার প্রভৃতি যুক্ত হইয়া মূর্খতাবশতঃ শরীরকে ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক কঠোররূপে অশাস্ত্রবিহিত তপস্যা করেন, তাহারা আসুর সংকল্প। গীতাকার দেখিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানকালের ন্যায় তখনও অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী প্রকৃত ধর্ম্মপথে না গিয়া অনাহার প্রভৃতি রূপ মিথ্যা তপস্যা অবলম্বন করিয়া জনসাধারণকে প্রতারণা করিত। তাই তিনি ইহাদিগকে এরূপ কঠোর বাক্য বলিয়াছিলেন।

গীতাতে ত্রিভাগে বিভক্ত তপস্যাপ্রণালীর প্রত্যেক বিভাগ আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত তপশ্চরণ করেন, তাঁহারাই সাত্ত্বিক তপস্যা করেন।

"শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষ্যতে॥

আর আমি তপস্যা করিলে লোকে আমাকে ধার্ম্মিক বলিবে, সাধু বলিবে, কি আমার লাভ হইবে এইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া যাঁহারা তপশ্চরণ করেন, তাঁহারা রাজস তপস্বী। এইরূপ তপস্যার ভাব সকল সময়ে থাকিবে না—আপনার স্বার্থসিদ্ধি যদি না হয়, তাহা হইলে রাজস তপস্বীগণ কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে তপশ্চরণ করিবেন না। তাই গীতাকার রাজস তপস্যাকে অধ্রুব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবং॥

আর যাহারা তামস তপস্বী, তাহাদিগের তপস্যা তপস্যা নামেরই উপযুক্ত নহে—কেবল কতকটা ভাবসাদৃশ্য বশতঃ তাহাকে তপস্যার মধ্যে ধরা হইয়াছে। পরের বিনাশ সাধনার্থে জপ প্রভৃতি এইরূপ তপস্যার অঙ্গ। এইরূপ তপস্যাকে আমরা আসুর তপস্যা বলিয়াও উল্লেখ করিতে পারি এবং বোধ হয়, এইরূপ তপস্যাই গীতার সময়ে সমধিক প্রচলিত ছিল।[১] গীতাকার তামস তপস্যার বিষয় বলিতেছেন—

"মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতং॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরীরের ক্ষয় করিয়া বা পরের বিনাশ সাধনার্থ তপস্যা করে, সে ব্যক্তির তপস্যা তামস তপস্যা।

তপস্যা বস্তুটা কি এবং তপস্যার কত প্রণালী হইতে পারে, তাহা আমরা গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে সুন্দর রূপে দেখিয়াছি। আমরা কিন্তু সাধারণতঃ তপস্যাকে দুই প্রকারে বিভক্ত ক-

১ এখনও এইরূপ তপস্যা ভারতে বহুল প্রচলিত। এইরূপ তপস্যা দ্বারা লোকের প্রকৃত অনিষ্ট হউক বা না হউক, অনেকে তাহা বিচার না করিয়া অনায়াসেই বিশ্বাস করে। এই সেদিন একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে জনৈক শাক্ত ধর্ম্মপ্রচারক হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া অন্যান্য কথার মধ্যে বলিলেন যে এখনও অনেক হিন্দু সন্ন্যাসী বশীকরণ, চাটন মারণ প্রভৃতি বিদ্যা জানেন।

রিতে ইচ্ছা করিতেছি—হেতুবিশিষ্ট ও অহেতুবিশিষ্ট। আমরা ভাল হইব, ধর্ম্ম-পথে না চলিলে অমঙ্গল হইবে, এই সকল ভাবিয়া যখন চেষ্টা চরিত্র করিয়া ধর্ম্মপথে চলি, তখনই তপস্যা হেতুবিশিষ্ট হয়—ইহাকে কতকাংশে রাজস তপস্যা বলিলেও বলা যায়। ইহার মধ্যে অধিকাংশ সময়ে কোন না কোন প্রকারে ফলাকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া থাকে। আর অনেকের তপশ্চরণ যেন কতকটা স্বাভাবিক। এইরূপ ব্যক্তিদিগেরই তপস্যাকে আমরা অহেতুবিশিষ্ট তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। ইহাঁদিগের যেন যত্নপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে হয় না। কেহই ইহাঁদিগকে তপস্যা অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেয় না—প্রত্যুত ইহাঁদের সম্মুখে শত বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু ইহাঁরা পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কেমন সহজভাবে তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ধ্রুব প্রহ্লাদ এইরূপ তপস্যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

ধ্রুব যখন তাঁহার বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া মাতার কাছে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন মাতা তাঁহাকে বুঝাইলেন যে তাঁহার যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। আর যদি তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়া থাকে, তবে তিনি পুণ্য সঞ্চয়ে যত্নবান্ হউন, কারণ জল যেমন নিম্নাভিমুখেই গমন করে, সেইরূপ সকল ঐশ্বর্য্যই সৎপাত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে।

"তথাপি দুঃখং ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি পুত্রক।
যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্॥
যদি বা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব।
তৎপুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফলপ্রদে॥
সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ।

ধ্রুব তাঁহার মাতার কথিত স্বল্প ঐশ্বর্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া একেবারে সকল ঐশ্বর্য্যের মূলাধারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহার মাতাকে বলিলেন,

"অম্ব যৎত্বমিদং প্রাহ প্রশমায় বচো মম।
নৈতৎ দুর্ব্বচসা ভিন্নে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি॥
সোঽহং তথা যতিষ্যামি যথা সর্ব্বোত্তমোত্তমং।
স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতামপি পূজিতং॥
নান্যদ্দত্তমভীপ্সামি স্থানমন্যৎ স্বকর্ম্মণা।
ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম॥

মাতাকে এই সকল বলিয়া তিনি বনপ্রস্থান করিলেন। তথায় কয়েকটী মুনিঋষির নিকটে ভগবানকে উপাসনা করিবার প্রণালী জানিয়া লইয়া গভীর অরণ্যে ধ্যান পরায়ণ হইলেন। ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই বালক ধ্রুবের বল কত হইল! তাঁহার পদভরে পৃথিবী বিকম্পিত হইতে লাগিল; দেবলোক ভয়ে আকুল হইল। দেবতারা তাঁহার যোগভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মায়াপ্রভাবে ধ্রুব দেখিলেন যে তাঁহার মাতা সুনীতি অতি কাতর ভাবে তাঁহাকে এই উৎকৃষ্ট তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। তাহাতেও ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গ হইল না দেখিয়া দেবতারা তাঁহাকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পিশাচরূপ ধারণ করিয়া দলে দলে ধ্রুবের সম্মুখে আসিয়া ভীষণ অস্ত্র সকল ঘুরাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য শৃগাল আসিয়া ভীষণ চিৎকার করিতে লাগিল। সেই সময় তাহাদের মুখ হইতে অগ্নিশিখা সকল নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই বালকের তপস্যা ভঙ্গ হইল না।

তখন ভগবান্ তাঁহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ধ্রুব এই যে তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রথমে একটুখানি রাজসিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু সেটী তাঁহার বাল্যভাব বশতঃ হইয়াছিল। তাঁহার স্বাভাবিক বা অহেতুবিশিষ্ট তপস্যার ভাব থাকাতে তিনি প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে ভগবান্ই সকল ঐশ্বর্য্যের প্রদাতা এবং এইরূপ বুঝিয়া যখন তপস্যার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন ক্রমে রাজসিক ভাব চলিয়া গিয়া একমাত্র সাত্ত্বিক তপস্যার ভাব অর্থাৎ ভগবান্কে পাইবার জন্যই ভগবান্কে ডাকিবার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রহ্লাদের তপস্যার মধ্যে কেবলই সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায়। প্রহ্লাদ গুরুগৃহ হইতে পিতৃসমীপে আনীত হইলে হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি শিখিয়াছ? তাহার সার ভাগ বল।” প্রহ্লাদ বলিলেন “যাহা শিখিয়াছি তাহার সার এই যে, যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, যাঁহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, যিনি অচ্যুত, মহান্ আত্মা, সর্ব্ব কারণের কারণ, তাঁহাকে নমস্কার।” ইহার পর প্রহ্লাদের উপর পিতা কত অত্যাচার করিলেন, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়। তথাপি তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার তপস্যার মধ্যে কিছুমাত্র স্বার্থভাব বা রাজসিক ভাব ছিল না। কথিত আছে হিরণ্যকশিপুর আজ্ঞানুসারে তাঁহার আজ্ঞাবহ ব্রাহ্মণেরা অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাতে মূর্ত্তিমতী অভিচার ক্রিয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিয়া বিফলকাম হইল। তখন সে ব্রাহ্মণদিগের ধ্বংশসাধনে অগ্রসর হইল। তখন প্রহ্লাদ দহ্যমান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। তিনি ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন “হে সর্ব্বব্যাপিন্ হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর। তুমি সকল ভূতে সর্ব্বব্যাপীরূপে আছ, তাহারই প্রভাবে এই ব্রাহ্মণেরা জীবিত হউক। তুমি সর্ব্বগত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শত্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমনি—ইহারাও জীবিত হোক। যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল * * আমি তাহাদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের বলে এই পুরোহিতেরা জীবিত হউক।” তখন ঈশ্বরকৃপায় পুরোহিতেরা জীবিত হইয়া প্রহ্লাদকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল। প্রহ্লাদের এইরূপ দৃঢ়ভক্তি দেখিয়া ভগবান তাঁহাকে দেখা দিলেন। তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা ছিল যে, ভগবানের প্রতি তাঁহার যেন অচলা ভক্তি থাকে।

পূর্ব্বে যাহা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতেছি যে তপস্যার প্রকৃত ভাব শরীর, বাক্য ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করা। সংসারের মধ্যে থাকিয়া পবিত্রতা হইতে পবিত্রতা বাছিয়া লইতে হইলে জ্ঞানের আবশ্যক। জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া পবিত্রভাবে থাকিতে পারিলেই আমাদিগের ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে। তাই ঋষিবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াছেন,

“জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।”

জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। “জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান

দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহাকে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। যাগ-যজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান কিম্বা অনশন অগ্নিসেবাদি তপস্যা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ সকল পথ তাঁহার প্রাপ্তির পথ নহে। জ্ঞানরূপ পথই তাঁহার পথ।"

রসায়ন বিজ্ঞানের উপকারিতা।*

(রবিবার ২রা বৈশাখ, ১৭৯৫ শক।)

আজি আমাদের বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম দিন, এই জন্য সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষকে প্রণাম করিয়া শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। যদি ঈশ্বরের রাজ্যে এমন কোন বস্তু থাকে, যাহাতে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব লাভ হয়, তাহা কেবল একমাত্র জ্ঞান। জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের সত্য সকল অবগত হইয়া ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করি। সেই ঈশ্বরকে বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য এবং তাঁহার প্রতি স্বচ্ছ প্রেম প্রবাহিত করিবার জন্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করা আবশ্যক। যাহা দ্বারা পদার্থের গঠনতত্ত্ব, কার্য্যতত্ত্ব, কার্য্যনিয়মতত্ত্ব, পারম্পরিক সম্বন্ধতত্ত্ব এবং কারণ অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম বিজ্ঞানশাস্ত্র। প্রকৃত বিজ্ঞানশাস্ত্র এই জগৎ; তাহার অধ্যাপক ঈশ্বর; দেবমনুষ্য অধ্যেতা; সজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ অধ্যয়ন। বিশ্ববিজ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে —জড় অথবা ভৌতিকতত্ত্ববিজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান। মৃত্তিকা, জল, বায়ু, তড়িত, তাপ, আলোক পশুপক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যের শরীর পর্য্যন্ত, যাহা বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, সে সকল ভৌতিকতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত; আত্মা প্রভৃতি যে সকল বিষয় অন্তরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহা আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানের অন্তর্ভূত। আবার এই দুই বিজ্ঞানের বিশেষ কোন ভাগ আলোচনা করিবার নিমিত্ত ইহাদের উপবিভাগ করা যাইতে পারে।

বিশ্ববিজ্ঞানের এক একটী তত্ত্ব এত অসীম ও দুরবগাহ্য, যে কেহই তাহার তলস্পর্শ করিতে পারে নাই এবং পারিবে যে, তাহাও আশা করা যায় না। যাহার মন বিক্ষেপশূন্য হয় এবং যিনি মনকে বশীভূত করিয়া এক বিষয়ে বিনিয়োজিত করিয়া রাখিতে পারেন ও বৃত্তিসকল সংযত করিতে পারেন, তিনিই স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা দ্বারা তত্ত্বলাভ করিতে পারেন; ইহাতে কঠোরতা চাই। এই কঠোরতার লাঘবার্থে সাধারণে পররচিত গ্রন্থপাঠ দ্বারাই জ্ঞানার্জ্জন করিতে ভাল বাসেন কিন্তু তাহা বিজ্ঞানের প্রতিবিম্বমাত্র; আর ইহাতে আপনার পুরুষত্ব প্রকাশ পায় না। নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে মনুষ্যরচিত গ্রন্থের ভ্রমপ্রমাদ দোষেরও নিরাকরণ হয় না—একই ভুল বরাবর চলিয়া আসিয়া সকলকে ভ্রান্ত করিয়া তুলে।

মনুষ্য ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা বিশ্ববিজ্ঞান আলোচনা করিতে গিয়া ভ্রমপ্রমাদদোষে দূষিত হয় বলিয়া বিশ্ববিজ্ঞান যে ভ্রান্ত, তাহা নহে। বিশ্ববিজ্ঞানের প্রতিবিম্বমাত্র যে মনুষ্যরচিত বিজ্ঞান, তাহাতে সত্যও থাকিতে পারে মিথ্যাও থাকিতে পারে; এই জন্য বিজ্ঞান-প্রতিবিম্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না

* লোকান্তরগত শ্রদ্ধাস্পদ বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবদ্দশায় এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। বহুকালের পর আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরম সমাদরে পত্রিকারূঢ় করিলাম। সং

পাওয়া পর্য্যন্ত ক্ষোভ নিবারণ হয় না, এই জন্যই বিজ্ঞান-প্রতিবিম্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া নিজের নিজের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। তাহা হইলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব যে, পরমেশ্বর-রচিত বিশ্ব-পুস্তকে কিছুমাত্র ভ্রান্তি নাই; যাহা কিছু ভ্রান্তি, তাহা আমাদের পড়িবার ও বুঝিবার ভ্রান্তি।

পূর্ব্বে যে দুইটী বিজ্ঞানের কথা বলা হইল, তন্মধ্যে রসায়নশাস্ত্র জড়তত্ত্ববিজ্ঞানের একটী উপশাখা মাত্র। প্রাকৃতিক জগতে যে সকল সংযোগ বিয়োগ হয়, তদ্ভাবতের নিগূঢ় তথ্যানুসন্ধান করা রসায়ন শাস্ত্রের বিষয়; যে সকল ভৌতিক পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, সেই সকলের মূলান্বেষণ করাই এই বিদ্যার বিষয়। সংযোগ ও বিয়োগের নিয়ম নির্দ্ধারণ, সংযোগবিয়োগ হইয়া যে সকল ভূত উৎপন্ন হইল তাহাদের ও তাহাদের উপাদান সকলের পরিমাণ ও গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করাও রাসায়নের প্রধান কার্য্য। রসায়ন শাস্ত্রের সহকারী সেই সকল শাস্ত্র, যে সকল শাস্ত্রে তাপ, তড়িৎ, আলোক, সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণ বিকর্ষণ, জল, বায়ু প্রভৃতির তত্ত্ব সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই সকল শাস্ত্র জানা নিতান্ত আবশ্যক।

প্রকৃত বিজ্ঞান কি? বিজ্ঞানের পুস্তক বিজ্ঞান নহে। পরমেশ্বর জগতে যে সকল ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে যাহা বুঝিতে পারিয়াছে, সে তাহাই লিখিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের কথাতেই বিশ্বাস না করিয়া পর্য্যবেক্ষণ-পরায়ণ হইয়া সেই সকল দেখিতে হইবে, তবে তাহা ঠিক জানা হইবে; অন্যের কথা শুনিয়া জানিলেও তেমন আনন্দ হয় না। যেমন, যে লবণ আমরা আহার করি, তাহা যেন দেখিতে এক পদার্থ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহা দুই পদার্থের সংযোগে প্রস্তুত হয়—এক, ক্লোরীন্ (হরিতন) নামক উগ্রগন্ধযুক্ত বায়বীয় পদার্থ, আর সোডিয়ম্ (সর্জ্জ) নামক ধাতবীয় কঠিন পদার্থ, এই উভয়ের সংযোগে উপাদেয় সামগ্রী লবণ প্রস্তুত হয়; যে ব্যক্তি আপনার স্বাধীন চেষ্টায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহা জানিতে পারে, তাহার যেমন আনন্দ হয়, অন্যের চর্চ্চিত বিষয় পড়িয়া আমাদের তেমন আনন্দ হয় না। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, ত্বক প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা এই দ্রব্য পরীক্ষা করিতে হইবে; আবার অন্য বস্তুর সংযোগে ঐ বস্তুর কিরূপ সংযোগ বিয়োগ ও কিরূপ গুণ হয়, তাহাও দেখিতে হইবে।

পরীক্ষার যত উপায় আছে, তদ্দ্বারা পরীক্ষা করিলে তবে তথ্য অবগত হওয়া যায় এবং তাহা আপনার বলিয়া বোধ হয়। নিজে যে সবই করিতে পারি তাহা নহে, তবে মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিয়া যতদূর সাধ্য তাহা করা উচিত। এবং সেই আপনার কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য, নিজের সহায়তার জন্য, অমুক অমুক জ্ঞানী ব্যক্তি অমুক অমুক বিষয়ে কি কি বলিয়াছেন তাহা জানিলে আপনার কার্য্যের অনেক সহায়তা হয়। নিজের কার্য্য করিবই; তাহার জন্য অন্যান্য জ্ঞানীদের নিকটে সহায়তা লইব—ইহাতে অন্যের ভ্রম দেখিয়াও আপনার কার্য্যের সুবিধা হয়। আমরা অন্যের নিকট হইতে দুই রকমে উপদেশ লইতে পারি—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, আর অ-সাক্ষাৎ সম্বন্ধে; এক, অন্যের সত্য সংস্করণ দেখিয়া শিক্ষা করা যায়; আর এক, অন্যের ভুল দেখিয়া জ্ঞানলাভ করা যায়—ঐ ব্যক্তির এই কার্য্যে এই

ভুল হইয়াছে, অতএব আমি ঐ পথে গিয়া ঐভুল করিব না।

এই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব ঈশ্বর। বিজ্ঞানতত্ত্ব জানিবার লক্ষ্য, এই সকল তত্ত্বপরম্পরা দ্বারা মূলতত্ত্ব ঈশ্বরকে জানা। যে ঈশ্বরকে জানে, এই সকল তত্ত্ব তাহার পক্ষে নিম্নতলে পড়িয়া গেল। বিজ্ঞান-তত্ত্ব মূলতত্ত্বের সোপান। যেমন—এই কাগজ রহিয়াছে, ইহাকে ছিঁড়িয়া দশখণ্ড করিলাম, তাহার একটিকে আবার বিশ খণ্ড করিলাম, তাহার একটীকে আবার চল্লিশ খণ্ড করিলাম; এইরূপে এত সূক্ষ্ম ভাগ করিলাম যে চক্ষে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার উপর কি ভাগ হইবে না?—বরাবর ভাগ হইবে; অনন্তকাল ভাগের দিকে চলিল। দেখ, একখণ্ড কাগজ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে মন অনন্তের দিকে ধাবিত হইল। ঈশ্বরের অনন্ত ইচ্ছা হইতে কাগজের উপকরণ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া একখণ্ড কাগজও অনন্তের চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। আমরা অনন্ত ঈশ্বরকে কাগজের কণার মধ্যে যেমন দেখিতে পাইতেছি, অনেক বিদ্বান্ লোকেরা মহান্ সূর্য্য চন্দ্রের মধ্যেও হয় তো ঈশ্বরকে তেমন দেখিতে পান না।

যেমন এই বড় বাড়ী আছে, এই বাড়ীকে বিশেষ করিয়া জানিতে হইলে ইহার প্রতি গৃহকে আগে বিশেষ করিয়া জানিতে হয়, তেমনি বিশ্ববিজ্ঞানকে বিভক্ত না করিলে সম্যক্ জানা যায় না; একবারেই সমস্ত ধারণ করিব কি প্রকারে—চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে, মন অবসন্ন হইয়া পড়িবে। এক একটী বিষয় এক এক সময়ে লইয়া আলোচনা করা উচিত। আমরা এখন লইলাম কি—পৃথিবীর ভিতরে যে সকল সংযোগ বিয়োগ হইতেছে তাহাই লইলাম। এই দেওয়াল রহিয়াছে, ইহাঁকে যদি বিয়োগ করা যায়—রাসায়নিক বিয়োগ নহে—যদি ইহাকে ভগ্ন করা যায়, চূন, সুরকী, ইট, বালি, এই সকল উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু চূনকে যদি রাসায়নিক বিয়োগ কর, তাহা হইতে দুইটী জিনিস বাহির হইবে—অক্সিজেন (অম্লজান) বায়ু ও ধাতবীয় ক্যালসিয়ম (চূর্ণসার); বালিতে অ-ধাতবীয় সিলিকন (শিলিক) পদার্থ ও অম্লজান বায়ু পাওয়া যাইবে; তেমনি ইটে ও সুরকীতে অম্লজান বায়ু ও লৌহ প্রভৃতি কতকগুলি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যাইবে; তাই বলিয়া ক্রমশই যে ঐ সকল দ্রব্য অধিক পাইতে থাকিব তাহা নহে। তিন চারি পদার্থের বিভিন্ন সংযোগে ঐ সকল প্রস্তুত হইয়াছে; যেমন সপ্তাশ্ব সূর্য্যের সাত প্রকার রশ্মি, যাহা সূর্য্যের আগে আগে দৌড়ায়, সেই সাত বর্ণের বিভিন্ন মিশ্রণে এত প্রকার বর্ণ আমরা দেখিতে পাই—কখন গোলাপ ফুলের বর্ণ হইতেছে, কখন চাঁপাফুলের বর্ণ হইতেছে। কিন্তু সাতটা রঙের বেশী কোন কিছুতেই নাই; ঐ সাত বর্ণের মধ্যে কতকগুলি বর্ণ এক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একপ্রকার বর্ণ হইল; আর এক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আর এক প্রকার বর্ণ হইল; ইহাতেও সাতটা রঙের অতিরিক্ত কিছুই নাই, উহাতেও সেই সাতটা রঙের অতিরিক্ত কিছুই নাই। সেইরূপ কতকগুলি পদার্থের বিভিন্ন সংযোগে ইট, সুরকী চূন, প্রভৃতি হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগকে বিয়োগ করিলে গোটাকয়েক মাত্র বস্তু পাওয়া যায়, যাহাদিগকে আর ভাগ করিতে পারি না; তাহাদিগের নাম মৌলিক পদার্থ বা রূঢ়িক পদার্থ। আবার ঐ বিয়োজিত বস্তু সকলকে সংযোগ করিয়া

ইট প্রভৃতি যদি প্রস্তুত করিতে পরি, তবেই পরীক্ষা একবারে সম্পূর্ণ হইল—বিয়োগের বেলায় যে প্রকার হইল, সংযোগের বেলায়ও ঠিক তাঁহাই হইল; যেমন দশকে বিভক্ত করিলে দশটা এক হইয়া গেল, আবার ঐ দশটা এককে যোগ করিলে দশ হইল, তবেই আর তাহাতে ভুল রহিল না। এইরূপে একবার বিয়োগ করিতে করিতে যাইতে হয়, একবার যোগ করিতে করিতে যাইতে হয়—উল্টাপাল্টা করিয়া দেখিতে হয়।

এইরূপে মূল অনুসন্ধান করিতে করিতে চৌষট্টি বস্তু পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার সংযোগে পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু হইয়াছে এবং যত কিছু কার্য্য চলিতেছে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে আনিয়া ফেলিল চৌষট্টি অক্ষরে!—যেমন, একটা পুস্তকে কতকগুলি লাইন থাকে, প্রতি লাইনে কতকগুলি কথা থাকে, সেই সব কথাতে কতকগুলি অক্ষর থাকে;—মনে কর, একটা বইয়েতে দশলক্ষ অক্ষর আছে, যদি তাঁহা ইংরাজী পুস্তক হয়, সেই অক্ষর সকল আসিয়া মিলিবে ছাব্বিশ অক্ষরে; যদি তাহা বাঙ্গলা পুস্তক হয়, অক্ষর সকল আসিয়া মিলিবে পঞ্চাশ অক্ষরে। যেমন এই কয়টী অক্ষরের মধ্যে বিভিন্নরূপ সংযোগ দ্বারা সমস্ত পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, তেমনি সমস্ত পৃথিবীকে বিয়োজিত করিলে তড়িৎ, তাপ, আলোক, আকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি এবং চৌষট্টী ভৌতিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

যে এইরূপে আপনার অঙ্গুলির গণনার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীকে আনিয়া ফেলিল, সে মুটার ভিতরে জগতকে আনিল এবং তাহার মধ্যে বিচিত্রশক্তি অনন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে লাগিল। পরমাণুর মধ্যে, ঈশ্বরের সত্তা ও সহায়তা ভিন্ন সংযোগ বিয়োগ সাধিত হইতে পারে না। ঘড়ির কলে দম দিলে, দম দিবার সময় যত পরিমাণ শক্তি তাহাতে গচ্ছিত করা হইয়াছিল, যতক্ষণ সেই শক্তি থাকিল ততক্ষণ ঘড়ি বেশ চলিতে লাগিল; যেই তাহা ফুরাইয়া গেল অমনি ঘড়ি অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। ফলত ঘড়ির আমরা স্থষ্টি-কর্ত্তা নহি; পরমেশ্বরের স্থষ্ট বস্তুর গুণাগুণ অবগত হইয়া এরূপে তাহাদিগকে রচনা করিলাম যে তাহারা কোন বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করিতে লাগিল; কিন্তু পরমেশ্বর স্রষ্টা, স্নুতরাং তাঁহার অধিষ্ঠানেই প্রতি পরমাণু কার্য্য-তৎপর রহিয়াছে। একটা কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলাম; তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল। সেই কাগজ পচিয়া অণুতে বিভক্ত হইয়া গেল; হয় তো তাহার পরে সারমাটির সঙ্গে গিয়া তাহা কোন গাছের শাখায় বা ফলে প্রবেশ করিল; তাহাকে আবার জন্তু খাইল; হয় তো তাহা আবার ঘর্ম্মাদির সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল, আবার অন্য স্থলে চলিল। কোন পরমাণু এক মুহূর্ত্তও স্থির নাই; ক্রমাগত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা কি নিজে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে?—ইহারা তো জড় পদার্থমাত্র। ইহাদের তৎপরতা ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা নিয়োজিত হইয়াই। এক ক্ষুদ্র পরমাণুর চেষ্টা হইতে,সেই পরমাণুর মধ্যে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বরের যে কি অসীম চেষ্টা, তাহা উপলব্ধি করি। সমস্ত জগৎ এইরূপ অনিমেষ চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কি নিজের শক্তি আছে?—তাহা নহে; তাহাদের ভিতরে যে শক্তি আছে, তাহাই তাহাদিগকে চালাইতেছে। ঈশ্বরের মহাশক্তি

সেই সকলের মধ্যে বিরাজ করিয়া যাহা করাইতেছেন, তাহাই করিতেছে। পরমেশ্বর যদি সেই সকলে না থাকিতেন, তবে ঐ সকল বস্তু নিস্তব্ধ হইয়া যাইত; ঘড়ি বন্ধ হইলে যেমন হয়, তাহা অপেক্ষাও নিস্তব্ধ হইত—এমন কি, কিছুই থাকিত না। এইরূপে বিজ্ঞান অতি অল্প আলোচনা করিয়াই ঈশ্বরের শক্তি কেমন নিগূঢ়ভাবে বুঝিতে পারি; তাঁহার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট অনুভব করি; ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত আছি, তাঁহা হইতে কণামাত্র বিচ্ছিন্ন নহি, ইহা হৃদয়ে কেমন বিনিবিদ্ধ হয়।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

যাঁহারা পবিত্র মনুষ্যচরিত্রকে দেবচরিত্রে পরিণত করিবার জন্য সবিশেষ ব্যগ্র, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী অনুমোদনীয় হইতে পারে না। দেবলোক ও মনুষ্য লোকের মধ্যে এত বড় একটা ব্যবধান রহিয়াছে, যে তাহা দুরতিক্রমণীয়। যখন আমরা সাধু ব্যক্তিগণকে বা আদর্শ-চরিত্রকে আপনার মধ্যে স্থান দিই, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে অবতার করিয়া না তুলি তখন তাঁহারদের সঙ্গে আমারদের হৃদয়ের সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকে। যাহা মনুষ্যে পারিয়াছে তাহা বিশেষ চেষ্টা পাইলে আমরাও করিতে পারিব, মনের মধ্যে এরূপ একটা উৎসাহ আইসে, অনুকরণবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু যদি তাঁহাদিগকে অবতার বা দেবতা বলিয়া মনুষ্য সমাজের উপরিতন স্তরে স্থান দিই, তাহা হইলে অনুকরণবৃত্তি ভগ্নোদ্যম হইয়া যায়, দেবের কার্য্য অবতারের কার্য্য অননুকরণীয় বলিয়া সহজেই মনে উদিত হয় এবং সে ভাব ক্রমে দৃঢ় হইয়া আইসে। দেবচরিত্রের অনুকরণ করিতে গিয়া যখনই আমারদের যত্ন চেষ্টা ক্ষীণবল হয়, অমনি মনে হয় জানিয়া শুনিয়া অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, হীনবল হইয়া যে পড়িব তাহা ত পূর্ব্ব হইতে জানিতাম। কিন্তু যদি আদর্শ পুরুষকে মনুষ্য বলিয়া তাঁহার কার্য্যের অনুকরণ করিতে চেষ্টা পাই, দুই একবার অকৃতকার্য্য হইলেও নিরাশা আইসে না, মনে হয় ক্রমে সফলকাম হইতে পারিব। সেই জন্যই বলিতেছিলাম আদর্শ চরিত্র গুলিকে মনুষ্যসমাজের গণ্ডী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া অবতার করিয়া তোলা কোনমতেই শ্রেয়স্কর নহে।

এইরূপ আমরা প্রকৃত আদর্শ মনুষ্যচরিত্রের অভাব বিলক্ষণ অনুভব করিয়া আসিতেছি। মনুষ্য সাধারণতঃ যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সামান্যত মনুষ্যের যেরূপ বলবুদ্ধি থাকে তদপেক্ষা সমধিক শক্তি সামর্থ্য ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের উন্মেষ দেখিলেই আমরা তাঁহাকে দেবপদবীতে বা অবতারশ্রেণীতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেই। মনুষ্যজাতির আদিম সময়ে তাহারদের নবীন চক্ষে চন্দ্র সূর্য্য বায়ুবৃষ্টি মেঘবজ্রের রহস্য থাকিতে পারে, কল্পনা আসিয়া যুক্তিতর্কের স্থান অধিকার করিতে পারে কিন্তু যখন বিজ্ঞান জ্যোতিষ কল্পনার যবনিকা ভেদ করিয়া দিল, ষড়দর্শনের আলোচনা বুদ্ধিবৃত্তির জড়তা অপসারিত করিয়া ফেলিল, তখনও কেন যে অবতারবাদের রাজত্ব-কল্পনার প্রতাপ অক্ষুন্ন রহিল, তাহা বুঝা যায় না। যাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, যে হয়ত শাস্ত্রকার ঘোর বৈদান্তিক, প্রভূত মনীষাসম্পন্ন অথচ তাঁহারা প্রচলিত ভ্রান্ত

মত বা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তুমুল কোলাহল উত্থাপিত করেন নাই। বরং ঐ সকল মত বা বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া বিশাল গ্রন্থ সমুদয় রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভাগবতের মর্ম্মে মর্ম্মে বৈদান্তিক মত অনুপ্রবিষ্ট, প্রকৃত পক্ষে তাহারই জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে ভাগবতের এত আদর, অথচ গ্রন্থকার রাসলীলা, গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি ঘোর আপত্তিকর বর্ণনা স্বীয় পুস্তকে নিবদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বরং যাহা মহাভারতে নাই, তদপেক্ষা অনেক নূতন কথা লিখিতেও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। কিন্তু ভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণের বয়স এই সকল লীলার সময় বার বৎসরের অধিক নহে, সেই জন্য তিনি চরিত্রদোষের দায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি, ব্রজলীলার বিশদ বর্ণনা সাধুগণের মনকেও বিচলিত করে। সাধারণ পাঠকবর্গের কথা দূরে থাকুক ইহা পরবর্ত্তী কৃষ্ণচরিতলেখকগণকেও উন্মার্গগামী করিতে ত্রুটি করে নাই। যাঁহারা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, আধুনিক বৈষ্ণবগ্রন্থ ও জয়দেবের কবিকীর্ত্তি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন অল্প সূচনার কি ভয়ানক পরিণাম ঘটিতে পারে। এই সকল গ্রন্থের প্রভাবে গৌণত জনসমাজের সম্প্রদায় বিশেষের নৈতিক অবস্থা যে কলুষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

অনেকে বলেন ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শাস্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখাই ভাল, সমধিক স্পষ্ট রাখা কিছুই নহে। ভাগবতের গোপী শব্দ প্রকৃত সাধকের নামান্তর মাত্র। সাধারণকে নারীভাবে বর্ণনা না করিলে ভগবৎপ্রেমের পূর্ণ মাধুর্য্য প্রদর্শন করা যায় না। কিন্তু গোপীগণের অবতারণায় দাঁড়াইল কি? ভাগবৎ ও পরবর্ত্তী শাস্ত্র সমূহের বহুল অংশ পিতাপুত্র, গুরুশিষ্য, ভ্রাতা ভগিনীর একত্রে বসিয়া পাঠ করিবার অযোগ্য হইল। ইহা ত গেল পুরাণের কথা, তন্ত্রের মধ্যে পঞ্চ মকারের যে উল্লেখ আছে, অনেকে বলেন উহার অন্তঃস্থানে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু কিরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে যে পঞ্চমকারের সেবা আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, তাহার সবিশেষ পরিচয় নিস্প্রয়োজন। সেই জন্যই বলিতেছি যে আমরা ধর্ম্মগ্রন্থে রূপক বর্ণনার পক্ষপাতী নহি। গোপীলীলার অভ্যন্তরে পঞ্চমকারের মর্ম্মস্থলে শাস্ত্রকারগণের গূঢ় কথা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বুঝিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। আমাদের ক্ষমতা বুঝিয়া সে সব কথার বিধান থাকিলে অন্ধের ন্যায় আমাদিগকে দিশাহারা হইয়া বেড়াইতে হইত না। বিশেষতঃ যখন সমধিক প্রাচীনতম শাস্ত্রের মধ্যে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল সরল ও সহজভাবে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে, তখন পরবর্ত্তী গ্রন্থে নিগূঢ় রহস্যের সমাবেশে কোন বিশেষ আবশ্যকতা ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। জ্ঞানোন্নত সময়ে কবিত্বপূর্ণ রূপক বর্ণনা প্রকৃত জ্ঞানবান সাধকের নিকট আদরণীয় হইতে পারে; কিন্তু যখন অজ্ঞানের রাজত্ব, তৎকালে সাধারণের পক্ষে তাহা একেবারেই দুষ্প্রবেশ্য এবং নিতান্ত অর্থহীন হইয়া পড়ে। আমাদের মধ্যে আধুনিক অনেক শাস্ত্রের অবস্থা ঠিক এইরূপ।

যাঁহারা গতানুগতিকের ন্যায় নির্ব্বিচারচিত্তে নতমস্তকে নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান চালাইয়া আসিতেছেন, পিতৃ পিতা-

মহগণের পদানুসরণ যাঁহারদের জীবনের চরম লক্ষ্য, তাঁহারদের কথা বলিতেছি না। কিন্তু যাঁহারা ইংরাজি সাহিত্য বিজ্ঞান আধুনিক প্রথামত অভ্যাস করিয়া আসিতেছেন অথবা যাঁহারা যুক্তিমার্গে স্বাধীন-চিন্তা করিতে ভাল বাসেন যদি বা কখন তাঁহারা অবসর মত ঈদৃশ শাস্ত্র উদ্ঘাটন করেন, তবে তাঁহাদের মস্তক ঘুরিয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণোল্লিখিত লীলাদি পাঠে ঘোর আত্মগ্লানি আসিয়া তাঁহাদিগকে মর্ম্মাহত করিতে থাকে, তাঁহারা যে প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছেন ইহাতেও সন্দেহ জন্মে।

পুরাণতন্ত্রের সহজ অর্থ সরল ভাবে গ্রহণ করিতে গেলে মনের মধ্যে সঙ্কোচ আইসে, ইহারই জন্য বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দ্বারাই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সূচনা হইয়াছে। কালভেদে লিখিত একই অবতারের ভিন্ন ভিন্ন জীবনীর মধ্য দিয়া প্রকৃত সত্য নিরূপণের চেষ্টা চলিতেছে, প্রক্ষিপ্ত অংশ সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ আভ্যন্তরিক আন্দোলনে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু রূপকোক্ত ঘটনাগুলি এতই অতিরঞ্জিত যে সকল স্থানে মূলসূত্র খুজিয়া পাওয়া যাইবে না। অঙ্গারের উপর যে ভস্মের আচ্ছাদন পড়িয়াছে তাহা সকল পক্ষকেই স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় ফুৎকার যোগে ভস্মকে উড়াইয়া অঙ্গারকে দীপ্তিমান করাই কর্ত্তব্য। ভস্ম কিছু সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও অঙ্গারের মত জ্বলিবে না।

আমারদের দেশের লেখকেরা বিশেষতঃ ইতিহাস লিখনে আপনারদের দায়িত্ব বুঝিয়া চলিতেন না। এদেশের ভাগ্যবশতঃ ঈদৃশ ইতিহাসের সহিত ধর্ম্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ। কোন ঐতিহাসিক রহস্য অবলম্বন না করিয়া তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয় বিবৃত করিতেন না। বেদের সারভূত উপনিষদের কয়েকখানি কেবল এই নিয়মের বহির্ভূত। অপর কয়েকখানি উপনিষদে স্পষ্টত ইতিহাস না থাকিলেও উপন্যাস আছে। পৌরাণিক সময়ে কেবলই ইতিহাস। ইতিহাস পুরাণের নামান্তর মাত্র। গীতার মধ্যে আবর্জ্জনারাশির অল্পতা বলিয়া গীতার এত আদর। অনেকেই বলেন যথাযথ ঘটনার বিবরণ ও কাল নির্দেশ ইতিহাসে না থাকিলে তাহা ইতিহাস হইল না, এবং তদানীন্তন কালের জনসমাজের চিত্র অঙ্কিত না থাকিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিল। আমরা বলি মহাভারতাদি গ্রন্থে এই দুয়েরই কতকটা অভাব আছে। ঘটনাগুলি একেইত অতিরঞ্জিত, তাহার উপরে ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণে বর্ণিত রাসলীলা প্রভৃতি তৎকালিক সামাজিক চিত্র হইলেত সর্ব্বনাশ। এই জন্যই আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন তাঁহারা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাভারতোক্ত মহাজনকে আদৌ ঐতিহাসিক মনুষ্য বলিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে পুস্তকখানি সমস্তই রূপক। এই রূপকত্ব স্থাপনের জন্য আজ কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতায় এক নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও কুরু পাণ্ডবগণের নামের গূঢ় অর্থ সহ এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক এই দলভুক্ত সভ্যগণের মধ্যেই অধীত হইয়া থাকে, বাহিরে তাহার প্রচার নাই। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা এমনই সুব্যক্ত যে তাহা কোন কালে যুক্তিতর্ক বলে অপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই। গীতা

একেইত আধ্যাত্মিক গ্রন্থের আদর্শ স্থানীয়, তাহার উপরে যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুনের নামের কূট অর্থ বাহির করিয়া গীতার সরল অর্থকে জটিল করিয়া তোলা এবং মহাভারতের অনৈতিহাসিকতার উপরে এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা বাতুলতা মাত্র। তন্ত্রে দেবলোকের ইতিহাস। এবং পুরাণের সহিত ইহার প্রকৃতিগত বিভিন্নতা থাকিলেও ইহার উৎপত্তি ও বিকাশ দেশকালের সহিত মিলাইয়া নিরূপণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পুরাণোল্লিখিত যে কয়েকটি চিত্র দেখিয়াছি তাহার মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত রামায়ণে রামচন্দ্রের চরিত্র যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, ও পরবর্ত্তী সময়ে তাহার উপরে যতটুকু অঙ্গরাগ চড়িয়াছে তাহাই আগামী বারে আলোচিত হইবে। এই দুই সংখ্যায় অবতার সম্বন্ধে স্থূল স্থূল কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ হইল মাত্র।*

অলখ নিরঞ্জন

(১৮১৬ শকের ১লা ভাদ্রের তত্ত্ব-কৌমুদী হইতে উদ্ধৃত)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে, 'ভাল ভাল গায়ক সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হয়, অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল এবং নানা ভাবের সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন, 'অলখ নিরঞ্জন গাও' তখন সেই অবধি ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে এতটুকুও তখন কাহারও বুঝা হয় নাই যে, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাইতে হয়।"

"অলখ নিরঞ্জন" এই সঙ্গীতটী রাজা রামমোহন রায়ের জীবন সঙ্গীত ছিল। ইহার প্রত্যেক অক্ষরের সহিত তাঁহার আধ্যাত্মিক রক্তের যোগ ছিল। সঙ্গীতে "অলখ নিরঞ্জন" প্রচারে "অলখ নিরঞ্জন" উপাসনায় ও আলোচনায় সর্ব্বত্র সকল সময় সেই একমাত্র মহামন্ত্র "অলখ নিরঞ্জন।" যখন তিনি পিতামাতার স্নেহ-ক্রোড়ে পালিত হইতেছিলেন, সেই ষোড়শানূর্দ্ধ বয়সে ভাগবত ও ইসলাম গ্রন্থ পাঠের সময় হৃদয়ে যে ভাব-কুসুম অঙ্কুরিত হইয়াছিল, অলখ নিরঞ্জনে তাঁহারই বিকাশ। তিনি চির জীবন সেই একই ভাব সাধন, একই ভাব আলোচনা ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রাণের অতি প্রিয়তম স্থানে যে ভাব সংরক্ষিত করিয়া ষোড়শবর্ষের বালক রাধা নগরের সুরম্য বাস ভবন পরিত্যাগ করেন; তিব্বতের বৌদ্ধ মণ্ডলীতে, রঙ্গপুরের কার্য্যক্ষেত্রে, বারানসীর অধ্যয়নে, কলিকাতার আলোচনায় ও সাধনে যে ভাব দিন দিন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রিষ্টল নগরে রোগশয্যায় তিনি ইহলোক লীলা সম্বরণ করেন। শৈশবে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে সেই একই কথা, একই সাধন, একই তত্ত্বান্বেষণ "অলখ নিরঞ্জন।"

চক্ষের উপর দেখিলাম, ব্রাহ্মসমাজে কত জন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইলেন, বক্তৃতায়, আলোচনায়, কত লোককে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট করিলেন, ব্রহ্ম দর্শন করিলেন, ব্রহ্ম দর্শনের কথা বলিলেন, কিছু কাল পর তাঁহারা আবার

* পূর্ব্ববারে অনবধানতাবশতঃ কাশীরাম দাসের রামায়ণ লেখা হইয়াছে। তাহা কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া পঠিত হইবে।

বিপরীত সুর ধরিলেন। এক সময় বজ্র-গম্ভীর নিনাদে যে সকল কথা দেশে প্রচার করিয়াছিলেন, কিছুকাল পরে নিজেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এরূপ চপলতার কারণ কি? কারণ এই যে, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ দাঁড়াইবার কোনই স্থল প্রাপ্ত হন নাই। যিনি সত্য স্বরূপকে ধরিতে পারিয়াছেন, তিনিই আলোকে অন্ধকারে, বিপদে সম্পদে, দুঃখে সুখে একই মন্ত্র জপ করিতে পারেন, এক কথা বলিতে পারেন। যাঁহারা সেই ভূমা পরব্রহ্মের সহিত পরিচিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা কি করিয়া আজীবন এক মন্ত্র জপ করিবেন?

সত্য বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে কেহই এক স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইতে পারেন না। তাঁহাকে নিশ্চয়ই মধ্যে মধ্যে কুপথে যাইতে হইবে। সমাজে তিনি সাধুভক্ত বলিয়া পরিচিতই হউন, শিষ্য-সেবকের স্তুতি দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি-লাভ হউক, তাঁহার সাময়িক মত লোকে গ্রহণ করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সকল আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার চঞ্চলতার চিহ্ন প্রকাশিত হইবেই হইবে এবং হঠাৎ এমন সময় উপস্থিত হইবে যে, যখন তটঘাতিনী পদ্মার তীরস্থ ভূখণ্ডের ন্যায় সেই দল ভগ্ন হইয়া যাইবে। সত্য স্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে বিনাশ নাই, অস্থিরতা চঞ্চলতা থাকে না।

নাবিকগণ কূলশূন্য জলধিতে ধ্রুবনক্ষত্র অবলম্বন করিয়া তরণী চালায়। প্রতি-কূল বায়ুতে, তরঙ্গাঘাতে সময় সময় তরণী পথভ্রষ্ট হয় বটে; কিন্তু নাবিকের লক্ষ্য স্থির থাকায় অবশেষ গম্য স্থানে উপনীত হইয়া থাকে। তদ্রূপ সময় সময় নানা-প্রকার ঘটনা পরম্পরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সাধক পদস্খলিত হইলেও, লক্ষ্য ঠিক থাকিলে কখনও প্রকৃত পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়েন না। পদস্খলিত ও পথচ্যুত এক কথা নহে। বিশ্বাসী নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে সেই দেবাধি-দেবের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া থাকেন। অবিশ্বাসী চঞ্চলচিত্ত মানব ঘুরিয়া ফিরিয়া অন্ধকারের মধ্যেই বাস করে। অবিশ্বাসী এক দিন সাকার, আর একদিন নিরা-কার, একদিন কালী দুর্গা আর একদিন ব্রহ্মা এইরূপ অস্থিরতাতেই বাস করে। বিশ্বাসী ব্রাহ্ম চিরদিনই এক কথা বলেন "অলখ নিরঞ্জন।"

মহাত্মা রামমোহন রায় এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের শেষ নিগূঢ় মীমাংসাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, একমাত্র নিরা-কার সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা পরমেশ্বরই মানবের উপাস্য। এই উপাসনাই তাঁহার আজীবনের সম্বল ছিল। তিনি যে মহা-মন্ত্র সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মগণ সেই মহামন্ত্র দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ করিবেন। চঞ্চলতা, অস্থিরতাতে ধর্ম্ম হয় না বরং কুপথে গিয়া জনসমাজের ও নিজের অম-ঙ্গল সাধন করা হয়।

পারসীকদিগের উদ্বাহ প্রথা।

পারসীকদিগের বিবাহ প্রণালী অনেক অংশেই হিন্দুদিগের ন্যায়। পাশ্চাত্য-দিগের ন্যায় উহাদিগের মধ্যে স্বয়ং নির্ব্বা-চন করিয়া লইবার প্রথা নাই বটে কিন্তু হিন্দুদিগের ন্যায় বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র কন্যার মধ্যে পরস্পর একেবারে অদর্শনও হয় না। অভিভাবকেরা প্রথমত কন্যা পাত্র নির্ব্বাচন করেন। পরে উভয়ের সম্মতি

লওয়া হয়। যদি কন্যাপাত্রের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের মনোনীত না হয় তাহা হইলে সে বিবাহ হয় না।

সন্ধ্যার সময় বর স্বপক্ষীয় লোক জন সমভিব্যাহারে কন্যাগৃহে উপস্থিত হয়। পারসীকদিগের বিবাহ-লগ্ন হিন্দু প্রথানুরূপ প্রায় সন্ধ্যার পরেই হইয়া থাকে। শুভ ক্ষণে শুভ লগ্নে বর ও কন্যাকে বিবাহ স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় উভয়ে পাশাপাশি পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করে। পাত্র ও কন্যা ভিন্ন আর কাহারও বিবাহ স্থানে উপবেশন করিবার অধিকার নাই। পুরোহিত বরকন্যার সম্মুখে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান থাকেন। অন্যান্য বন্ধুবর্গ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কেহবা নারিকেল কেহ বা দাড়িম্ব কেহবা রক্তবর্ণ বস্ত্র প্রভৃতি মাঙ্গলিক পদার্থ লইয়া, আবার কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য হিন্দুদিগের ন্যায় অক্ষত (আল চাউল) হস্তে পাত্রকন্যাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।

পারসীকদিগের বিবাহের বয়স পাত্রের অন্যূন ২১ ও পাত্রীর অন্যূন ১৫। আমাদের ন্যায় কন্যাকে সালঙ্কারা সবস্ত্রা দান করিবার প্রথা তাহাদের আছে কিন্তু সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া পণ দিবার রীতি নাই বরং অধিকাংশ স্থলেই অগ্রে কন্যাকে নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার দিয়া পাত্রপক্ষীয় লোকে বিশেষ সৎকার করিয়া থাকেন।

সকলে যথাযথ স্থানে আসীন হইলে পুরোহিত ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করেন। আমাদের ন্যায় উহাদেরও প্রত্যেক কর্ম্মে ঈশ্বর (অহুর-মজদা) স্মরণ করিবার প্রথা আছে। পুরোহিত ঈশ্বর স্মরণ করিয়া এই প্রকারে আশীর্ব্বাদ করেন :—

"সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরমজ্‌দা তোমাদিগকে বহু পুত্র পৌত্র ইত্যাদি দান করুন; যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য, নয়ন-প্রাণ-প্রীতিকর বন্ধু এবং সার্দ্ধ শতাধিক পরমায়ু তোমরা প্রাপ্ত হও।"

অনন্তর পুরোহিত কন্যার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

"তুমি, পৃথিবী ও স্বর্গ সাক্ষী করিয়া, এই কন্যাকে স্বামীর সহিত একদেহ এক-আত্মা, স্বামীর গৃহের কর্ত্রী ও গৃহলক্ষ্মী হইবার জন্য সম্প্রদান করিলে? তুমি বিধি পূর্ব্বক স্বামীকে সকল কর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য তোমার কন্যাকে সম্প্রদান করিলে?"

প্রত্যুত্তরে অভিভাবক বলেন "আমি তত্ত্বদভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কন্যা সম্প্রদান করিলাম।" অনন্তর পুরোহিত বরকে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি, তোমার আত্মীয়গণের অনুমতি ক্রমে স্বইচ্ছায়, সজ্ঞানে, নিজের উন্নতি কামনায় চির জীবনের জন্য এই বিবাহ বন্ধনে সম্মত হইলে?"

বর উত্তর করেন "আমি সম্মত হইলাম।"

পরে পুরোহিত বর কন্যা উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

"তোমরা উভয়ে পরস্পরের উন্নতি কামনায় চির জীবনের জন্য এই দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইলে?"

বর কন্যা উভয়ে বলেন "হইলাম।"

এই সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা বিবাহ হইয়া গেলে পুরোহিত বর ও কন্যাকে আবার আশীর্ব্বাদ করেন। এই আশীর্ব্বচনে পারসীকদিগের সমস্ত কর্ত্তব্য, নীতি ও ধর্ম্ম-শিক্ষা হইয়া থাকে। এই মন্ত্র হইতেই উহাদের শাস্ত্রানুমোদিত চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। পুরোহিত যেমন আশীর্ব্বাদ

করিতে থাকেন, বন্ধুগণ অমনি সঙ্গে সঙ্গে তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া বর ও কন্যাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। পুরোহিত্ বলেনঃ—

"সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরমজ্দার পবিত্র নাম ও প্রীতি স্মরণ পূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি। তোমরা যশে ও ধর্ম্মে উজ্জ্বল হও; চির দিনের জন্য বর্দ্ধিত হও, তোমাদিগের প্রজাতন্তু অক্ষয় হউক। জয়শালী হও; পবিত্রতা রক্ষা কর, তোমাদের মন সংচিন্তা করুক, রসনা প্রীতিবাক্য উচ্চারণ করুক, কার্য্য সাধারণের উপকারী হউক। তোমাদের পাপচিন্তা লয় প্রাপ্ত হউক, পাপ কথা উচ্চারিত না হউক, পাপ কার্য্য দগ্ধ হউক। সকলে তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করুক, তোমরা মাজদাসনিয়ান (পারসীক ধর্ম্মাবলম্বী) চিন্তাশীল হইয়া সৎকর্ম্ম কর। ধর্ম্মপথে থাকিয়া সম্পত্তি উপার্জ্জন কর; রাজার সহিত সত্যালাপ করিয়া তাঁহার বশীভূত হও। বন্ধুদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদের হিতৈষী হও; নিষ্ঠুর হইও না, ক্রোধী হইও না, লজ্জায় পড়িয়াও মিথ্যা কথনরূপ পাপ কার্য্য করিও না, লোভী হইও না। কাহাকেও পীড়া দিও না, মনোমধ্যে হিংসাকে স্থান দিও না, উদ্ধত হইও না, কাহাকেও তাচ্ছিল্য করিও না, অজিতেন্দ্রিয় হইও না। অন্যের অর্থ অপহরণ করিও না, পরস্ত্রী হইতে দূরে থাকিও। বুদ্ধি সহকারে সৎকার্য্য করিও; প্রতিহিংসাশীল লোকের সংশ্রবে থাকিও না; নিজে ক্ষমাশীল হইও। লোভীর সহচর হইও না, নিষ্ঠুরের সহিত একপথে চলিও না। কুক্রিয়াশালী ব্যক্তির সহিত কোন প্রকার পণে বদ্ধ হইও না। অকর্ম্মণ্য, অনভিজ্ঞ, ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তির সহিত কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। ন্যায়মার্গে থাকিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে, বন্ধুর সহিত বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করিবে। যাহাদের দুর্নাম আছে তাহাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না। সাধারণ সমক্ষে কেবল পবিত্র কথা বলিবে, রাজার সম্মুখে বিনয় সহকারে কথা বলিবে। পিতৃপুরুষ হইতে সুনামের অধিকারী হও। কোন প্রকারে তোমার মাতার মনে কষ্ট দিও না। নিজের শরীর নির্ম্মল রাখিবে।"

উল্লিখিত প্রকার উপদেশ দিবার পর পুরোহিত আবার আশীর্ব্বাদ করেনঃ—

"তোমরা কায় খসরুর ন্যায় অজর অমর হও, কাউসের ন্যায় বুদ্ধিমান হও, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান হও, চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হও, জোরস্তার ন্যায় যশস্বী হও, রোস্তমের ন্যায় বীর হও, পৃথিবীর ন্যায় ফলবান হও। যেমন দেহ ও আত্মা চিরকাল অবিচ্ছিন্ন থাকে সেই প্রকার স্ত্রী বন্ধু ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিও। সর্ব্বদা চরিত্র নির্ম্মল রাখিবে ও ন্যায়ানুগামী হইবে। অহুরমজদাকে শাসনকর্ত্তা ও জোরস্তারকে প্রভু বলিয়া মনে রাখিবে।"

আমাদের যেমন সপ্তাহের প্রতিবারের নামানুযায়ী গ্রহ আছে সেইরূপ পারসীকদিগের প্রতিমাসে ত্রিশ দিনের ত্রিশ জন স্বর্গীয় দুত আছেন। পুরোহিত তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম লইয়া পাত্র ও পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করেন।

"অহুরমজদা তোমাকে প্রতিভাশালী করুন; বামান তোমাকে আত্মজ্ঞান দান করুন, এবং আর্দিবিহিস্ত বাকপটুতা, পৃথিবী জ্ঞান, খোরদাৎ মাধুর্য্য ও পুষ্টি আমারদাৎ পুত্র দান করুন।

"অহুরমজদা তোমাকে প্রতিভাশালী করুন; অগ্নি তোমাদিগকে উজ্জ্বল করুন; আর্দ্ধিস্থর পবিত্রতা, সূর্য্য পরাক্রম, চন্দ্র গাভী

সমৃদ্ধ, স্ত্রার স্বাধীনতা ও গশ্ সংযম প্রদান করুন। অহুরমজদা তোমাদিগকে প্রতিভা-শালী করুন; মিথ্র ধনসম্পদ, স্রশ্ বিনয়, রাসন্ সদাচার, ফারভারদিন বাহুবল, বেহ্রাম জয় এবং বাৎ ক্ষমা প্রদান করুন।

অহুরমজদা তোমাকে প্রতিভাশালী করুন; "আশেসভঙ্গ বুদ্ধিজ্যোতি ও প্রভুত্ব, আসতাৎ ধর্ম্ম, অসমান পটুতা, জামিয়াদ দৃঢ়তা, মারেসপান্ত সকল কার্য্যের সন্ধান ও মানেরবান শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রদান করুন।"

এইরূপে স্বর্গীয় দূত ও গ্রহ নক্ষত্রাদির উল্লেখে নানারূপ শুভ কামনা করিয়া পরে বলা হয় "তোমরা এক্ষণে সৎ আছ, আশী-র্ব্বাদ করি আরও সৎ হও। যতদিন না জাওতার ন্যায় উপযুক্ত হও এবং জাওতার ন্যায় পুরস্কৃত হও ততদিন ক্রমাগত সৎ হইতে চেষ্টা করিবে।"

"যাহা উত্তম হইতে উত্তম তাহা তোমাদের হউক, যাহা অধম হইতে অধম তাহা তোমাদের না হউক। আমাদের কাহারও যেন কোন অমঙ্গল না হয়, আমার আশীর্ব্বাদ সফল হউক।"

বিবাহ শেষ হইলে বর, কন্যার গৃহে জলযোগ করিয়া সপত্নীক নিজগৃহে প্রস্থান করেন; উহাদিগের বাসর ঘর নাই।

সংসারী মানবের পক্ষে যাহা কিছু প্রার্থনীয় ও কর্ত্তব্য পারসীকদিগের বিবাহ প্রণালীতে তাহার সমস্ত উল্লেখ আছে। হিন্দুর কুশণ্ডিকায় ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় বিবাহে এরূপ সুগভীর উপদেশপূর্ণ মন্ত্র আছে কি না সন্দেহ।

বিবাহের মন্ত্র প্রথমে জেন্দ ভাষায় ও পরে সংস্কৃতে পাঠ করা হয়। এই প্রকার জনশ্রুতি আছে যে পারসীকেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করিলে পর উহাদের বিবাহ সভায় উহাদের আশ্রয়দাতা হিন্দু রাজা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার অবগতির জন্য বিবাহ মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলা হয়। পরে রাজার সম্মানার্থে কৃতজ্ঞ পারসীকেরা আজিও পর্য্যন্ত বিবাহে সংস্কৃত মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। সংস্কৃতেও উল্লিখিত বিবাহ মন্ত্র ও আশীর্ব্বাদ বচন বলা হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র কোন মন্ত্র ব্যবহার করা হয় না।

সেতারায় ব্রহ্মোপাসনা।

বিগত ২৬ শে আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যা-কালে সেতারার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাঙ্গলায় ব্রহ্মোপাসনা হয়। সেতারার সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। মহিলারাও অনেকে আসিয়াছিলেন। সর্ব্ব-শুদ্ধ শতাধিক লোকসমাগম হইয়াছিল।

বাঙ্গলার একটি প্রশস্ত কক্ষের মধ্যস্থলে বেদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বেদীর পশ্চাতে নারিকেলকুঞ্জ, সম্মুখে ধূপাধান হইতে সুগন্ধ উত্থিত হইতেছে, গৃহের প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে আম্রপত্রসুশোভিত মঙ্গলঘট। বেদীর দক্ষিণ পার্শ্বে মহিলাদিগের এবং বামপার্শ্বে পুরুষদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যথা সময়ে সকলে উপস্থিত হইলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত বেদগীতটি গান করেন।

বেদগান।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।

যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতোবভূব।

য ঈশে হস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।

যস্যেমাঃ প্রদিশো .যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়্বা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।

যো অন্তরীক্ষে রজসোবিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।

যত্রাদিসূর উদিতোবিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫

মানোহিংসীঃ জনিতা যঃ পৃথিব্যাঃ যোবা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান।

যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জ্জান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬

তৎপরে

অর্চ্চনা।

ওঁ পিতা নোহসি পিতা নো বোধি
নমস্তেহস্তু মা মা হিংসীঃ।
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায চ ময়োভবায চ
নমঃ শঙ্করায চ ময়স্করায চ
নমঃ শিবায চ শিবতরায চ।

এইরূপ অর্চ্চনান্তে শুভ্রবস্ত্রপরিহিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাওজী রামচন্দ্র কালে তিন জনে বেদী গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইল।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

সকল-মঙ্গল-নিদান, ভব-মোচন, অরূপ, চেতনরূপে বিরাজো।

তুমি অকৃত, অমৃত, পুরুষ, বিশ্বভুবনপতি, সুন্দর অতি অপূর্ব্ব।

জীব-জীবন; দীন-শরণ, দুখ-সিন্ধুতারণ হে, কৃপা বিতর কৃপাসাগর, তার ভব-অন্ধকারে।

অনুপম, শাশ্বত-আনন্দ তুমি, জগজ্জীবন, আকুল অন্তর তোমারে চাহে।

পরম ব্রহ্ম পরমধাম, পরমেশ্বর, সত্যকাম, পরমশরণ, চরম শান্তি, তুমি সার।

রাগিণী যমন—তাল ত্রিবট।

বিসরুনি ক্ষণভরি বিষয়া, মন প্রভুকডে লাবুং, অনুভবুং আনন্দঘনাসি পরম বিমলাসি পুণ্যরাশি পাবুং। ধ্রু০। ধ্যাউং তো মহারাজ ধ্যাউং প্রণতবৎসল আলবুং প্রেমল প্রভু দীননাথ চির সুখদায়ক তারক ত্যা সাধুং শরণ জাউং ত্যা গডে গাউং। বিসরুনি ॥

ক্ষণকালের জন্য বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া প্রভুর প্রতি চিত্ত সমর্পণ করি। প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করি। বিমল পুণ্যরাশি প্রাপ্ত হই। সেই প্রণতবৎসল মহারাজকে ধ্যান করি। সেই প্রেমস্বরূপ দীননাথ চিরসুখদায়ক তারক প্রভুর সাধনা করি। তাঁর শরণাপন্ন হই। তাঁর গুণগান করি।

উপাসনা।

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

স্তোত্র।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।

নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্॥
বয়স্ত্বাং স্মরামো বয়স্ত্বাম্ভজামো-
বয়স্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

প্রার্থনা।

অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

এইরূপে স্তোত্রপাঠ ও প্রার্থনাদি হইলে শ্রীযুক্ত রাওজী রামচন্দ্র কালে মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহার ব্যাখ্যা করেন।

তদনন্তর নিম্নলিখিত ব্রহ্ম-সঙ্গীতটি হয়।

রাগিণী নারায়ণী—তাল যৎ।

ভজো রে ভজ রে ভবখণ্ডনে, ভজো রে বিশ্বজনবন্দনে,

জগতরঞ্জন ভকত-চিত্ত-বিনোদনে, মোদনে পালনে, তারণে, প্রণত-জন-সৌভাগ্য-জননে।

শুদ্ধ সত্য জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানে, মুক্তি-দাতা জগত-প্রাণে।

অন্তরযামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বত বিভু কৃপানিধানে।

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত-পাতক-নাশনে। সর্ব্বলোকাশ্রয়-প্রভবে, সত্যাত্মনে প্রেমাত্মনে।

গীত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাওজী-রামচন্দ্র কালে মহাশয় উপনিষদ গীতা পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র হইতে বহুতর বচন উদ্ধৃত করিয়া মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করেন। এবং উপদেশের শেষভাগে গায়ত্রী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হয়।

ঝিল্‌হা পিলুঃ—তাল ত্রিবট।

মোকা কা তুং ঢুংঢ়ে বংদে মৈং তো তেরে পাসমেং। না মৈং কোই ক্রিয়া-কর্ম্মমেং না যোগসন্ন্যাসমেং॥ ধ্রু০॥ না মৈং পোথো না মৈং পণ্ডিত না কাশী কৈলাসমেং॥ না রহতা মৈং শ্রী দ্বারক না রহতা জগন্নথমেং॥ মোকা০॥ ১॥ না রহতা মৈং রামেশ্বরমে না রহতা বদ্রিনাথমেং॥ না রহতা মৈং জংগল সহারা মৈং রহতা বিশ্বাসমেং। মোকা০॥ ২॥ কহত কবির শুনো ভাই সাধো সব শ্বাসোংকে শ্বাসমে॥ জো খোজে তো তুরত মিলুং মৈং ছনভরকো তলাসমে॥ মোকাং॥ ৩॥

মিছে কেন খুঁজিয়া বেড়াও—আমি ত তোমার কাছেই আছি। আমি কোন ক্রিয়া কর্ম্মেও নাই, যোগ সন্ন্যাসেও নাই, আমি পুঁথিতেও নাই, পণ্ডিতেও নাই, কাশীতেও নাই, কৈলাসেও নাই, দ্বারকায়ও নাই, জগন্নাথেও নাই। আমি রামেশ্বরেও থাকি না, বদ্রিনাথেও থাকি না; আমি জঙ্গলেও থাকি না, সহরেও থাকি না; আমি বিশ্বাসেই অবস্থিতি করি। কবীর বলিতেছেন, শুন ভাই সাধু, তিনি ভক্তের বিশ্বাসেই আছেন। যে তাঁর সন্ধান করে সেই তাঁকে সদ্য প্রাপ্ত হয়।

পরে তুকারামের এই অভঙ্গটি পঠিত হয়।

অভঙ্গ

প্রথম ভাব শুদ্ধ কর, আংগে বৈরাগ্যাচা ভর, ভক্তি পাহীজে শিরজোর, পাহুনি যোগ কোণতা ॥ ১ ॥ নকো ত্যজুং স্ত্রয়া পোর, বাংধো সাপ মাড্যা ঘর, আল্লা আয়োতা আদর। পাহুনি ধর্মকোণতা ॥ ২ ॥ করো নামাচা গজর, জাণে সংতাংচো কদর, তুকা ভণে তাচি নর, ব্রহ্মজ্ঞানো পূরতা ॥ ৩ ॥

প্রথমে ভাব শুদ্ধ কর। ইহাপেক্ষা যোগ আর কি আছে? স্ত্রী পুত্র গৃহ ত্যাগ করিও না, অতিথির সংকার করিও। ইহাপেক্ষা ধর্ম্ম আর কি আছে? যে নাম গান করে, সাধুর মর্য্যাদা বুঝে সেই ব্রহ্মজ্ঞানী।

পরে "ওঁ য একোবর্ণো" ইত্যাদি পাঠ হইলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া বন্দনা গান করিলেন।

বন্দনা।

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা জয় জয় মঙ্গলদাতা, সঙ্কটভয়দুখত্রাতা, বিশ্বভুবনপাতা

জয় দেব জয় দেব।

অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা।' বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু চিন্ময় পরমাত্মা।

জয় দেব জয় দেব।

জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে, পরমশরণ তুমি হে জীবন মরণে।

জয় দেব জয় দেব।

জগতারণ দীনেশ সুখশান্তিদাতা, প্রভু সুখশান্তিদাতা; শরণাগতবৎসল তুমি পরম পিতা মাতা।

জয় দেব জয় দেব।

মিলিয়ে ভক্তসমাজ মাগি বরাভয় দান, প্রভু মাগি বরাভয় দান, কৃপা করি হে কৃপাময় দাও চরণে স্থান।

জয় দেব জয় দেব।

উপাসনা কার্য্য শেষ হইলে সকলে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় প্রথানুসারে জলযোগ করিলেন। এবং তৎপরে সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিয়ৎকাল ভাষণপ্রসঙ্গ চলিল। এখানে ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেকেরই একটা ভুল সংস্কার ছিল যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র। এই উপাসনা প্রণালী দেখিয়া সকলের সে ভ্রম দূর হইল। সমাগত সজ্জনগণের মধ্যে ব্রাহ্মের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। কিন্তু এই উপাসনার গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে সকলেরই চিত্ত বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমাদেরই চিরন্তন অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম জানিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

এই উৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার বিষয়ে স্পেশাল সবজজ রাও বাহাদুর শ্রীযুক্ত চিন্তামণ নারায়ণ ভট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সীতারাম যাদব জাভেরি মহাশয় বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। ইহাঁদেরই যত্নে এখানে প্রথম প্রার্থনা সমাজ স্থাপিত হয় এবং ইহাঁদেরই প্রাণপণ চেষ্টায় ইহার কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। ভবিষ্যতে এখানে এই সনাতন ধর্ম্মের অনেক উন্নতি আশা করা যায়।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০শে আশ্বিন সোমবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে ব্রহ্ম উপাসনা হইবে।

শ্রীবিহারীলাল বন্দোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫, আষাঢ় ও শ্রাবণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ... ... ১৫২৪।০
পূর্ব্বকার স্থিত ৩১১৯।৵০

সমষ্টি ... ... ৪৬৪৩।৶০
ব্যয় ... ১৫১৭। ৫

স্থিত ... ... ৩১২৬।৵১৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ৭০৮৸৶৫

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৮১৬ শকের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের দান ৮০৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ১৮১৫ শকের পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন ১৮১৫ শকের ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ১৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় ১০৲
" " যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ৫৪৩।১৫

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ১৲
পরলোক গত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বেঙ্গল বণ্ডেড্অয়ার হাউসের সেয়ারের ডিবিডেণ্ট ৩২৸৵০
পুরাতন বাতিল কাগজ বিক্রয় ২।৶৫
দানাধারে প্রাপ্ত ১২।৵৫

৭০৮৸৶৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১০৩৻৫
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা ১২৲
" " কৃষ্ণদয়াল সিংহ চৌধুরী, দিনাজপুর ৩।৵০
" " দেবেন্দ্র দেব দাস, কলিকাতা ৬৲
" " কালিপ্রসন্ন ঘোষ, ঐ ৬৲
" " বলাইচাঁদ পাইন, ঐ ৩৲
" " মণিলাল মল্লিক, ঐ ৬৲
" " রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ঐ ৩৲
" " আশুতোষ ধর, ঐ ৩৲
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, ঐ ৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ঐ ১৲
" " মথুরানাথ বর্ম্মন, ঐ ৪।৵৫
" " হরিশ্চন্দ্র ঘোষ, বড়িশা ১।০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, ঐ ৪।০
" " হেমলাল পাইন, ঐ ৩৲
" " বিশ্বম্ভর শিকদার, ঐ ৩৲
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায়, ঐ ৩৲
" " গোপালচন্দ্র দে, ঐ ১৲
" " দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ (পাথুরেঘাটা) ১৲
" " শ্রীগোপাল মল্লিক ঐ ২৲
" " রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ঐ ৩৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ঐ ১৲
" " রামশঙ্কর সেন, ঐ ॥০
" " কালিপ্রসন্ন বিশ্বাস, ঝাজি ১৸৵০
" " হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৲
" " গৌরীশঙ্কর রায়, কটক ৩।৵০
" " হরিবিলাস আগরওয়ালা, তেজপুর ৭৲
" " লক্ষ্মীদাস মজুমদার, খামারগাছি ৩।৵০
" " রঘুনাথ নাথ, গোয়াড়ি ৩।৵০
" সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজ কুমারখালি ।৵০
" ব্রাহ্মসমাজ, নওগাঁ ৪৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এক খণ্ড নগদ বিক্রয় ।৵০

১০৩৻৫

পুস্তকালয় ২৪৸৵০
যন্ত্রালয় ... ... ৬৬২।৶৫
গচ্ছিত ... ... ৬।৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ৬৲
পুস্তক বিক্রয়ের কমিসন .. ১২॥৵১৫

সমষ্টি ১৫২৪।০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২৯৭৻১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৮০৵১০
পুস্তকালয় ... ৭৯৶১৫
যন্ত্রালয় .. ৯৯৫॥৵১০
গচ্ছিত ... ৪৯৵০
সেভিংসব্যাঙ্ক ১৬৲

সমষ্টি ১৫১৭। ৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयं
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

গোলাপ পুষ্প দ্বারা ব্রহ্মার্চ্চনা।

হে গোলাপ! তুমি পুষ্প সাম্রাজ্যের ঈশ্বরী। জগৎস্রষ্টা তোমাকে ঐ পদে মনোনীত করিয়াছেন। তুমি অশ্রুবর্ষণকারী প্রাতঃকালের মধুরতম সন্ততি। তুমি ধরণীর নানা রত্নে মণ্ডিত শোভন পরিচ্ছদের শোভনতম রত্ন। তুমি কুসুম-দলের জল্‌জলে চক্ষুস্বরূপ। তুমি উপবনের অপূর্ব্ব শোভা। তুমি প্রাতঃকালরূপ ধাত্রীপালিত সৌন্দর্য্য দেবীর দুহিতা। তোমার সুগন্ধ দ্বারা কেবল প্রীতিই নিঃশ্বসিত হইতেছে। অতএব তোমাকে সেই প্রাণের প্রাণ বন্ধুর বন্ধু প্রেমময়কে উপহার দিতেছি। এমন সুন্দর জিনিষ যে তুমি তোমাকে সেই শিব সুন্দরকে উপহার না দিয়া আর কাহাকে উপহার দিব? তোমাকে যখন আমি দর্শন করি সমস্ত জগতের সকল সৌন্দর্য্য গভীর সমুদ্রের ন্যায় এক কালে আমার মনশ্চক্ষু সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া আমাকে স্তম্ভিত করে। তোমার দর্শন সেই সকল সৌন্দর্য্যের আধারকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তোমার প্রেমিক বুল্‌বুল অপেক্ষা সহস্র গুণ আমাকে উন্মত্ত করিয়া ফেলে। যিনি তোমাকে আমাদিগের সুখ সম্বর্দ্ধনার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি কখন নিষ্ঠুর দৈত্য হইতে পারেন? তাঁহার করুণা কে পরিমাণ করিতে পারে? হে সাধকের মনোমোহিনী! হে সাধকের মনোহারিণী! আমার ইচ্ছা যে তুমি একবার আমার সঙ্গে কথা কহ। তুমি একেবারে নিঃস্তব্ধ হইয়া আছ কেন? একবার একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ কর যে আমার কর্ণকুহর তৃপ্ত হউক। তুমি ত কথা কহিলে না। যেমন নিঃস্তব্ধ ছিলে সেইরূপ নিঃস্তব্ধ রহিলে। বুঝিয়াছি তুমি সেই গুণাকরের অনন্ত গুণ ধ্যান করিতেছ এই জন্য নিঃস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছ। বুঝিয়াছি তুমি তাঁহার মর্ম্ম বুঝিয়া পরম সাধিকার ন্যায় শিশিররূপ অশ্রু বর্ষণ করিতেছ। যাই আমরা তাঁহার মর্ম্ম বুঝি তখনই চক্ষে জল আইসে। আমরা জানি সেই প্রেমময়ের নিকেতনের রাস্তা সাধকের অশ্রুসিক্ত। তোমার সৌন্দর্য্য সেই রাস্তা দেখাইয়া দিতেছে। হে গোলাপ! পরম সাধিকা তুমি, তুমি আমার আগে আগে চলিয়া সেই প্রেম-

ময়ের নিকটে আমাকে লইয়া যাও। তোমাকে যেমন আমি স্পষ্টরূপে দেখিতেছি কবে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যকে, সেই জ্যোতির জ্যোতিকে, সেইরূপ দেখিতে পাইব! সেই দিনের জন্য আমি ব্যগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিতেছি। তিনিই স্বর্গ, তিনিই মোক্ষ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

রসায়ন বিজ্ঞানের উপকারিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রসায়ন জানিতে হইলে কোন্ দ্রব্য কোন্ কোন্ উপাদানের কি কি পরিমাণ দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও জানিতে হইবে। কেবল মাত্র উদজান অম্লজান যোগে জল হইল, ইহা স্থূল কথা; ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম কথা হইবে এই যে, দুই ভাগ উদজান সহিত একভাগ অম্লজান মিশ্রিত করিলে জল হয়। এই তিন ভাগ সংযুক্ত হইয়া যে জলের বাষ্পরূপে পরিণত হইবে, সেই বাষ্প কেবল দুইভাগ মাত্র স্থান গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি তাহাদের ওজন করিয়া পরীক্ষা করা যায়, দেখিতে পাইব যে, যে দুইভাগ উদজান আছে তাহার প্রত্যেক ভাগ উদজানের ওজন যদি এক কুঁচ হয়, তাহা হইলে দুই ভাগে দুই কুঁচ ওজন হইবে; আর একভাগ যে অম্লজান আছে তাহার ওজন ষোল কুঁচ হইবে এবং ঐ দুই ভাগ উদজান ও একভাগ অম্লজান মিলিত হইয়া যে বাষ্প হইবে তাহার ওজন আঠারো কুঁচ হইবে। যদিও তিন ভাগ উদজানও অম্লজানে দুইভাগ মাত্র বাষ্প হইল কিন্তু তাহাদের এক পরমাণুও নষ্ট হইল না—কারণ উদজান অম্লজান অধিক পরিমাণে ঘনীভূত হইল বটে কিন্তু ওজনে যে আঠারো কুঁচ, সেই আঠারো কুঁচই হইল। পরিমাণ ও ওজনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে জল প্রস্তুত করিতে পারিবে না। আবার ইহারা যে সংযুক্ত হয়—কি নিয়মে সংযুক্ত হয়? শুদ্ধ উদজান দুইভাগ ও একভাগ অম্লজান বিশ দিন একটা পাত্রে রাখিয়া দাও, কিছুই হইবে না কিন্তু এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যুৎ লাগাইয়া দাও, জল হইবে। তবেই নিয়ম এই হইল যে দুই ভাগ উদজান ও এক ভাগ অম্লজানে বিশুদ্ধ অবস্থায় তড়িৎ প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাই হইল হিসাবী কথা; ভাসা কথাতে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। বিজ্ঞান আলোচনা করিবার কালে তাহাদের নিয়ম সহিত আলোচনা করিতে হইবে, তবে ঈশ্বরের আবির্ভাব আমরা অনুভব করিতে পারিব।

ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করাই আমাদের বিজ্ঞানালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা অতদূর উন্নত হয় নাই, যাহাদিগের মন পারমার্থিক দিকে ধাবিত হয় নাই, তাহারা কি রসায়ন বিজ্ঞানের দ্বারা কোন উপকারই প্রাপ্ত হইবে না? ঈশ্বরের এরূপ ভাব নহে। তিনি উদারভাবে যে যাহা চায় তাহাকে তাহাই দেন; যে তাঁহাকে চায়, তাহাকে আপনাকে দান করেন; যে ঐহিক সুখ চায় তাহাকে ঐহিক সুখ দেন—ক্রমে সে তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া আবার তাঁহারি দিকে ফিরিয়া আইসে। সেইরূপ রসায়ন দ্বারা যে ঐহিক সাহায্য হয় না, তাহা নহে। ইহার দ্বারা ঐহিক উপকার বিস্তর হয়। রসায়নশাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা যে কত শিল্প প্রস্তুত হইতেছে বলা যায় না; রসায়নশাস্ত্রের বিলোপ হইলে তাহার কিছুই

থাকে না। ইহার এক সহজ দৃষ্টান্ত দেখ—সূর্য্যালোক দ্বারা ছবি তোলা। প্রথম কাচকে কলোডিয়ম দ্বারা প্রলেপ দিতে হয়; তাঁহার পরে তাহাকে (কাষ্টকি) "নাইট্রেট্ অব সিলবর" এর জলে ভিজাইয়া লইলে মানুষ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে মানুষের ছায়া যেখানে পড়ে সেইস্থান ক্ষয় হয় না, যেখানে যেখানে আলো পড়ে, সেই সেই স্থান ক্ষয় হইয়া যায়—ইহাতেই মানুষের প্রতিবিম্ব কাচে বেশ্ দাঁড়াইয়া যায়।

কাপড় রঞ্জিত করিবার রং ধাতু হইতেও প্রস্তুত হয়, বৃক্ষ হইতেও হয়। নীল রঙ্গ বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত হয় কিন্তু নানা কৌশলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা বাহির করিতে হয়। আমাদের এখানে খনি আছে, তাহা হইতেই হীরক, নীলকান্ত মণি প্রভৃতি পাই, বিলাতে তাহা পাওয়া যায় না অথচ এ সকল না হইলে শোভা হয় না সুতরাং বিলাতবাসীরা কৃত্রিম উপায়ে তাহা প্রস্তুত করে। যদি চ তাহা স্বাভাবিক হীরকাদির ন্যায় হয় না—ইহা ঈশ্বরের নিয়মে হয়, আর তাহা মানুষের নিয়মে হইতেছে—তবুও অনেকটা ঠিক করিয়া উঠিয়াছে; ক্রমে ইহা অপেক্ষাও ভাল প্রস্তুত করিতে পারিবে। এই ব্যবসায়ের দ্বারা কত লোক প্রতিপালিত হইতেছে, আবার কত লোকের বেশভূষার সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। আর এক প্রকার ব্যবসা চলিতেছে,—ছাঁচ তোলার ব্যবসা। মনে কর, ঐ কুঁজটীর ছাঁচ তুলিবে। যদি তাহার ছাঁচ তুলিতে হয়, উহার অর্দ্ধেকের উপর তামার জলের * প্রলেপ দিবে, পরে অপর অর্দ্ধেকের উপর প্রলেপ দিবে; সেই দুই অর্দ্ধেক ছাঁচ সংযুক্ত করিলেই কুঁজার সম্পূর্ণ ছাঁচ উঠিল। এই ব্যবসায় প্রকৃতরূপে রসায়ন বিদ্যার ফল। মনে কর, কাচের ব্যবসায়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কাচের বদলে স্ফটিক ব্যবহার হইত। খনির ভিতরে যেমন অন্যান্য সামগ্রী থাকে, তেমনি কাচের মতন স্বচ্ছ প্রস্তর অনেক পাওয়া যায়। আর এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে কাচও প্রস্তুত হইত, কিন্তু তাহা অতি অল্প পরিমাণে হইত। এখন বিশ চল্লিশ প্রকারের কাচ প্রস্তুত হইতেছে; যন্ত্রের দ্বারা তাহাকে কাটিয়া বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। গিল্টি ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিক ব্যাপার। ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যাহারা ভোগবিলাসী তাহাদের পক্ষে সুখকর দ্রব্য ব্যয়েতেও অল্প, আবার তাহাতেই অন্যেরও জীবিকা হয়। আমাদের দেশে স্বর্ণকারেরা রসায়নের নিয়ম মাত্র জানে। সোনা গালাইতে হইবে—তাপ দিতেছে, গলিতেছে না, একটু সোহাগা দিতেই গলিয়া গেল; "পান" ধরাইবার সময় সোরা ও নিশাদল উপযুক্ত ভাগে দিলে জোড়া লাগিয়া যায়—অন্য কোন আটা দিলে সেরূপ যোগ হইত না। এই সকল রসায়ন-কথা বরাবর চলিয়া আসিতেছে তাই তাহারা অভ্যাসবশতঃ জানিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এখন আর আমাদের দেশে রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা নাই, সুতরাং ইহার আর উন্নতি হইতেছে না; পূর্ব্বে রসায়ন বিজ্ঞান যতটুকু বাহির হইয়াছিল তাহাই আছে, বরঞ্চ তাহা অপেক্ষাও কমিয়া গিয়াছে বলিতে পারি।

চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধেও রাসায়ন দ্বারা

* অন্য পদার্থের সংমিশ্রণে গলিত তাম্র। ইহা কোন বস্তুর উপর ঢালিলেই তাহা ঘনসংযুক্ত হইয়া যায়।

কত উপকার হইয়াছে। অসভ্যাবস্থায় যেন ধাঙ্গড় প্রভৃতি বন হইতে একটা গাছের কতকগুলি পাতা খুঁজিয়া লইয়া আসিল, আর একটা গাছের শিকড় লইয়া আসিল, ঔষধ হইয়া গেল। কিন্তু যেখানে সেই সকল গাছ আছে, সেই স্থানের লোকদিগেরই রোগে তাহা খাটিতে পারে; দূরবর্ত্তী স্থান হইলে পাতা প্রভৃতি আনিতে আনিতে শুকাইয়া গেলে আর তাহাতে কাজ হয় না। এই জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদের সত্ত্বটা বাহির করিয়া লওয়া গেল। অনেক পাতা শিকড় খাইলে যে উপকার হয়, তাহার দশ ফোঁটা খাইলেই সেই উপকার হয়। সত্ত্ব দ্বারা ঔষধের রাগ হয়, তেজ হয়; এইরূপ বলবান্ ঔষধ প্রস্তুত না হইলে নিমের পাতা, গুলঞ্চের পাতা প্রভৃতি ঔষধদ্রব্য অনেকটা খাইতে হইত। আরও এই সত্ত্ব প্রস্তুত করিবার প্রণালী দ্বারা সার ভাগ লইয়া আসার ভাগ পরিত্যাগ করা গেল; তাহাতে দূর দূর স্থানে পাঠাইবার সুবিধা হইল; চিকিৎসকদের ব্যবস্থা করিবার সুবিধা হইল; রোগীর ঔষধ খাইবার সুবিধা হইল; বিক্রয়ের সুবিধা হইল। লৌহঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে লৌহের সঙ্গে অম্লজান যোগ করিয়া লৌহভস্ম করা হইল; তখন তাহা উদরে গিয়া পরিপাক হইয়া ঔষধের কার্য্য করিতে লাগিল। তাহা না করিয়া যদি লৌহ গিলিয়া খাওয়া হয়, তাহাতে রোগের আরো বৃদ্ধি হইবে। এইরূপ আমাদের দেশে তামাঘটিত, লৌহঘটিত, রূপাঘটিত, সোনাঘটিত ঔষধ আছে—অমুক অমুক পদার্থের সঙ্গে অমুক অমুক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহার সঙ্গে অম্লজান মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিয়া রাখে। আমাদের দেশে এইরূপে যতদূর উন্নতি হইবার তাহা হইয়াছিল; তাহার পরে নানা কারণে আর বেশী চর্চ্চা হয় নাই, উন্নতি হয় নাই। ইংরাজদিগের কতরকম লৌহঘটিত ঔষধ আছে—(হীরাকস বা গন্ধকায়িত লৌহ) সল্‌ফেট অব্ আয়রণ আছে, (লৌহভস্ম বা জারিত লৌহ) অক্‌সাইড অব আয়রণ আছে, (লিম্বুকায়িত লৌহ) সাইট্রেট অব আয়রন আছে, (দ্রাক্ষায়িত লৌহ) টারট্রেট অব আয়রণ আছে, আরো কত রকম আছে; এক লৌহকে নানা প্রকার রূপান্তরিত করিয়াছে—এক এক রূপে এক এক রকম গুণ। দেখ, রসায়ন শাস্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রের কত উপকার হইয়াছে।

এই রসায়ন শাস্ত্রকে জানিতে হইলে ইহার সঙ্গে যে যে শাস্ত্রের যোগাযোগ আছে, তাহা আগে জানিতে হইবে। তাহা না হইলে রসায়ন শাস্ত্রের মধ্যে তাহাদের কোন কথা পড়িলে তখন হাতড়াইতে হইবে। যেমন, তাপ আগুন হইতেও পাওয়া যায়, সূর্য্য হইতেও পাওয়া যায়—উহাদের সম্বন্ধে বিস্তর কথা আছে; কোন্ বস্তুতে কি পরিমাণ তাপ দিলে কঠিন বস্তু তরল হয়, তরল বস্তু বায়ু হয়, বায়ু আবার কত তাপে কত প্রস্থত হয়; আবার সেই তাপ কত হরণ করিলে বস্তুর কত সঙ্কোচ হয়, বায়বীয় পদার্থ তরল হয়, তরল পদার্থ কঠিন হয়; কি পরিমাণ তাপ দিলে জলে বিকর্ষণ হইয়া জল বায়ু হইয়া আকাশে প্রস্থত হয়, কি পরিমাণ তাপ প্রত্যাহার করিলে তাহারা আকৃষ্ট ও সংকুচিত হইয়া জল হয়, তাহা হইতে আবার কত তাপ হরণ করিলে সেই জল কঠিন হইয়া তুষার হয়, এই সকল আশ্চর্য্য বিষয় পূর্ব্বে জানা উচিত। দেখ এক তড়িতের দ্বারা বিদ্যুৎ পাত হইতেছে, আবার তারে

সংবাদ যাইতেছে, কত দূর হইতে কত দূরে কত শীঘ্র অম্লজান ও উদজান মিলিয়া জল হইতেছে। আমাদের শরীরে তড়িৎ আছে বলিয়া কথা কহিতে পারিতেছি; তড়িৎ আছে বলিয়া শুনিতে পাইতেছি। সেই তড়িৎ কখন গুপ্তভাবে শরীরে আছে, কখন প্রকাশভাবে বিদ্যুৎ হইতেছে। আবার আকর্ষণ বিকর্ষণের বিষয় জানিতে হইবে। একটা গোলা ছাড়িয়া দিলাম, টেবিলের উপর পড়িল, আবার উপর দিকে যাইবে; প্রথম হইল আকর্ষণ, দ্বিতীয় হইল বিকর্ষণ। এই দুই ক্রিয়া বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। আকর্ষণ না বুঝিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বুঝা যায় না। আকর্ষণ বিবিধ প্রকার—যোগাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ, রাসায়নিক আকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ, তড়িদাকর্ষণ; ইহার বিপরীত বিকর্ষণ। আকর্ষণে সংঘটন হয়, বিকর্ষণে বিঘটন হয়।

জল এক শ্রেণীর পদার্থ। তরল পদার্থের নিদর্শন হইতেছে জল। কঠিন পদার্থ তাহা, যাহার পরমাণু সকলকে শীঘ্র সরান যায় না। তরল পদার্থ ঢালা যায়; আঙ্গুল তাহার ভিতরে বসিয়া যায় অর্থাৎ আঙ্গুল যত স্থান গ্রহণ করে, তথাকার পরমাণু সকল সরিয়া গিয়া অন্যত্র ততস্থান গ্রহণ করে, আবার আঙ্গুল টানিয়া লইলে গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া যায়। বায়বীয় পদার্থ সকল ভূমি হইতে উর্দ্ধে গমন করে। হাল্কা সূক্ষ্ম বায়ুবৎ পদার্থের মধ্যে আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণ বলবান্; তাহাদের পরমাণু সকল যতক্ষণ বায়বীয় ভাবে থাকে, ততক্ষণ পরস্পর হইতে দূরেই যাইতে চায়। রসায়নবিজ্ঞান জানিবার পূর্ব্বে জলজাতীয় যত পদার্থ, বায়ুজাতীয় যত পদার্থ সকলেরই বিষয় জানিতে হইবে—তৈল জল জাতীয় পদার্থ, পারদ জলজাতীয় পদার্থ। বায়ুর বিষয় জানিতে হইলে কেবল সামান্য বায়ুর বিষয় জানিলে হইবে না; অম্লজান একরকম বায়ু, উদজানও একরকম বায়ু—আবার এই সকল বায়ু যে কেবল মুক্ত ভাবে আছে তাহা নহে, ইহারা বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায়ও আছে।

পুরাকল্প।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

হিন্দুর প্রাচীনতম বেদশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, আদিম কালেও শিল্পীরা এখনকার ন্যায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী গৃহোপকরণাদি প্রস্তুত করিত এবং অধিবাসীদিগের মধ্যে সে সকলের ক্রয় বিক্রয় প্রথাও প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের স্থানে স্থানে তন্তুবায় ও কর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পী জাতির নির্ম্মিত বস্ত্র ও অস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার্য্য পদার্থের উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদে তৃতীয়াষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে একটী ঋক্ আছে। যথা—

ভূয়সা বস্নমচরৎ কনীয়োঽবিক্রীতো অকানিষং পুনর্যন্।
স ভূয়সা কনীয়ো নারিরেচীৎ দীনা দক্ষা বিদুহন্তি প্রবাণম্॥

অর্থঃ—কশ্চিৎ বিক্রেতা ভূয়সা বহুমূল্যেন বস্নেনা কনীয়ঃ স্বল্পতরং বস্নং মূল্যং কৃতবান্। ততোহেতোঃ স যন্ ক্রেতারং প্রতি গচ্ছন্ সন্ অবিক্রীতঃ স্বল্পমূল্যেনায়ং ময়া তুভ্যং ন দত্তঃ পুনঃ অকানিষং অধিকং ধনং ত্বত্তো লব্ধুং কাময়ে। স বিক্রেতা ভূয়সা স্বরূপতো বহুমূল্যবস্নেনাপি কনীয়ঃ বিক্রয়সময়ে স্বমঙ্গীকৃতমল্পতরমপি মূল্যং নারিরেচীৎ ন বর্দ্ধয়িতুং শক্নুয়াৎ। তত্র হেতুমাহ। দীনা অসমর্থাঃ, দক্ষাঃ সমর্থা বা, প্রবাণং প্রতিপন্নং বচনং বিশেষেণ স্বেষ্টপূরণায় অবলম্বন্তে। বাচনিকেষু ক্রয়বিক্রয়ব্যবহারেষু বচনামব স্বস্বস্তোৎপত্তৌ নিবৃত্তৌ বা নিমিত্তমিতি ভাবঃ।

কোন এক বস্ত্রবিক্রেতা, বহুমূল্য দ্রব্যের দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়কালে তাহা তদপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। যখন সে খতাইয়া দেখিল, লাভ হয় নাই, অধিকন্তু মূল হানি হইয়াছে, তখন সে ক্রেতার নিকট গিয়া বলিল, আমি অল্প মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিব না, অধিক মূল্য কামনা করি। কিন্তু তখন সে ক্রেতার নিকট অধিক মূল্য কামনা করিলেও প্রাপ্ত হইল না। না পাইবার কারণ এই যে, পারক হউক আর অপারক হউক, সকল লোকেই আপন আপন ইষ্ট পূরণার্থ অঙ্গীকৃত বাক্য অবলম্বন করে। অর্থাৎ বিক্রেতা যে মূল্য স্বীকার করিয়া বস্ত্র বিক্রয় করে, ক্রেতা তাহার সেই স্বীকারকেই আপনার অনুকূলে প্রমাণ প্রদান করিয়া বিক্রেতাকে নিরস্ত করিয়া থাকে।

এই ঋক্‌টী পাঠ করিলে, পূর্ব্বকালের লোকেরা যে বস্ত্র পরিধান করিত, তন্তুবায়েরা যে বস্ত্র প্রস্তুত করিত, সেই সকল বস্ত্র যে লোকসাধারণে ক্রীত ও বিক্রীত হইত, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হইতে পারে। অপিচ, আদিম আর্য্যেরা পশুকল্প ছিল, গাছের বাকল ও পশুর ছাল পরিধান করিয়া কালযাপন করিত, এ সংস্কার তিরোভূত হইতে পারে।

ঋগ্বেদ প্রথমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে একটী ঋক্ আছে, তাহাতে সমুদ্রগামী নৌকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"বেদা যো বীনাং পদমন্তরীক্ষেণ পততাম্।
বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়াঃ॥"

অর্থঃ—যঃ বরুণঃ অন্তরীক্ষেণ আকাশমার্গেণ পততাং গচ্ছতাং বীনাং পক্ষিণাং পদং গম্যস্থানং বেদ জানাতি তথা সমুদ্রিয়াঃ সমুদ্রযায়িন্যো নাবঃ নৌকাঃ বেদ জানাতি।

যে বরুণ দেবতা অন্তরীক্ষচর পক্ষীদিগের গম্যস্থান জ্ঞাত আছেন, এবং যে বরুণ দেবতা সামুদ্রিক নৌকা অবগত আছেন—

আদিম আর্য্য জাতীয় মানবেরা যে নৌকা প্রস্তুত করিতে জানিত তাহা ঐ মাত্র একটী ঋকেই যে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে; অন্যান্য ঋকেও রূপক কল্পনায় নৌকার বর্ণনা করিতে দেখা যায়। যথা—

স্ত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিম্ সুপ্রণীতিম্।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমারুহেমাস্বস্তয়ে॥"

ঋগ্বেদ, ৮। ২।

অর্থঃ—বয়ং যজমানা দৈবীং নাবং আরুহেম। দিবঃ স্বর্গস্থ ইমাং দৈবীং দ্যুলোকপ্রাপিকাং যজ্ঞময়ীং নৌকাং স্বস্তয়ে কল্যাণার্থং আরোহামঃ। নাবং বিশিনষ্টি। সুত্রামাণং সুষ্ঠু ত্রায়মাণাং সংরক্ষণকর্ত্রীমিতি যাবৎ। পৃথিবীং বিশালাং। দ্যাং দ্যোতমানাং। অনেহসং সময়প্রাপ্তাং। সুশর্ম্মাণং সুষ্ঠু শরণভূতাং। অদিতিং অখণ্ডিতাং। সুপ্রণীতিং সুষ্ঠু রীত্যা গম্যস্থানপ্রাপিকাং। স্বরিত্রাং শোভনং অরিত্রং কেনিপাতকং যস্যা স্তথাবিধাং। অনাগসং নির্দ্দোষাং অস্রবন্তীং অন্তঃ প্রবিশজ্জলস্রাবরহিতাম্।

যাগকারী আমরা স্বর্গলোকপ্রাপিকা যজ্ঞময়ী নৌকায় আরোহণ করিতেছি। এই নৌকা সুন্দররূপে সংসার-জলধি পরিত্রাণে সমর্থ। ইহা বিশাল অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ, সময়প্রাপ্য ও রক্ষাকারী। ইহা অখণ্ডিত অর্থাৎ অভগ্ন, এবং সুন্দর রীতিতে গম্যস্থানে লইয়া যায়। এই যজ্ঞময়ী বৃহৎ নৌকার অরিত্র গুলি অর্থাৎ দাঁড় গুলি অতি সুন্দর। এ নৌকা নির্দ্দোষ এবং ইহা অন্তঃস্রবজ্জলবর্জ্জিত। অর্থাৎ এ নৌকার তলা দিয়া জল চোয়ায় না।

দেখুন, আদিম আর্য্যজাতির নৌকা কেমন সুন্দর। কত ইংরাজ নৌকার ইতিহাস লিখিতে গিয়া কত শত ভ্রান্ত কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা

নাই। আমাদের সংস্কার জন্মিয়াছিল, নৌযানের সৃষ্টি আধুনিক। কিন্তু আজ্ সে সংস্কার দূরীভূত হইল। এখন জানিলাম, অতি আদিম কালেও ভারতবাসীরা সমুদ্রেও নৌযানে গমনাগমন করিতেন। কি কৌশলে নৌকা প্রস্তুত হইতে পারে ও তাহাতে কি কি উপকরণ আবশ্যক হয় সে সমস্তই ঋষিবৃন্দ বিজ্ঞাত ছিলেন।

ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায় যে, আদিম কালেও রাজা ছিল, রাজনীতি ছিল, রাজারা যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিতেন এবং উত্তম রূপে প্রজা পালন করিতেন। তখন শিল্পীরা রাজাদিগের জন্য যুদ্ধোপকরণ রথ, বর্ম্ম, ধনু ও শর প্রভৃতি প্রস্তুত কবিতে জানিতেন এবং রাজারাও সে সকল যথাযথ ব্যবহার করিতে ক্ষমবান ছিলেন। তখনও রাজাদের সৈন্য সামন্ত ছিল। যথা—

"জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যৎ বর্ম্মী যাতি সমদামুপস্থে।
অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বং সত্বা বর্ম্মণো মহিমা পিপর্ত্তু॥"

ঋগ্বেদ। ৫। ১।

অর্থঃ—হে রাজন্! যৎ যদা ভবান্ বর্ম্মী কবচাবৃতবপুঃ-সন্ সমদাং সংগ্রামাণাং উপস্থে মধ্যে যাতি গচ্ছতি তদা তব প্রতীকং বপুঃ জীমূতস্যেব ভবতি। যথা মেঘস্য শ্যামলং বপুঃ তথা তবাপি লৌহকবচাবৃতত্বাৎ। অতঃ ত্বং অনাবিদ্ধয়া তন্বা অক্ষতেন দেহেন জয় বিজয়মাপ্নুহি। স তথাবিধো বর্ম্মণঃ কবচস্য মহিমা ত্বাং পিপর্ত্তু পালয়তু।

রাজন্! যখন তুমি বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সংগ্রাম মধ্যে প্রবেশ কর, তখন তোমার শরীর মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হয়। তোমার জয় হউক ও তুমি বর্ম্মের মহিমায় অক্ষতশরীরে থাক।

"অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা বয়ন্তু।
অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাঁ উ দেবা অবতাহবেষু॥"

ঋগ্বেদ। ৮। ৫।

অর্থঃ—ইন্দ্রঃ অস্মাকং ধ্বজেষু সমৃতেষু শত্রুসেনাধ্বজৈঃ সম্মিলিতেষু সৎসু জয়মাবহত্বিতি শেষঃ। অস্মাকমিষবো বাণা জয়ন্তু অস্মাকং বীরা যোদ্ধারঃ উৎতরে উৎকর্ষবন্তো ভবন্তু। হে দেবা যুয়মাহবেষু যুদ্ধেষু অস্মান্ অব।

আমাদের রথধ্বজ শত্রুসৈন্যের রথধ্বজের সহিত মিলিত হইলে ইন্দ্রদেব আমাদিগকে জয়যুক্ত করিবেন। আমাদের ইষু অর্থাৎ বাণ জয়লাভ করুক, আমাদের বীরেরা উৎকৃষ্ট হউক। হে দেববৃন্দ! তোমরা যুদ্ধকালে আমাদিগকে রক্ষা করিও।

এইরূপ এইরূপ অনেক ঋকমন্ত্র আছে, যাহা পাঠ করিলে পুরাতন আর্য্যদিগের যুদ্ধব্যাপার জানিতে পারা যায়। তাহাতে যে শিল্পাদির অপেক্ষা আছে তাহাও অল্পপরিমাণে জানা যায়।

পূর্ব্বকালের আর্য্য রাজারা অত্যন্ত তেজস্বী, প্রজাপালনে সুদক্ষ, বীর, দয়ালু, সৎপথের প্রবর্ত্তক, শূর ও জয়কুশল ছিলেন। অন্যান্য সুখ অপেক্ষা বিজয়সুখকে বড় মনে করিতেন। এবং সকলেই উদারস্বভাব ছিলেন। উপদ্রবকারী চোর, খল, পিশুন ও পাষণ্ডদিগকে শাসন করিতেন। সৎপথাবলম্বী প্রজাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। যাহাতে লোকহিত হয় তাহাই করিতেন। সুতরাং বুঝা যাইতে পারে, তাঁহাদের সময়েও রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রচলিত ছিল এবং সে সকল রাজগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইত। এই সকল কথার পোষক বেদমন্ত্র বক্ষ্যমাণ তৃতীয় প্রস্তাবে প্রকাশিত হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য—এই পুরাকল্প প্রস্তাবে আমরা সংক্ষেপে প্রাচীন ইতিবৃত্ত বীজ সঞ্চয় করিব।

ক্রমশঃ।

পারসীকদিগের আচার ব্যবহার।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে পারসীক জাতির বিবাহ ব্যাপার পাঠ করিয়া পাঠকেরা বুঝিতে পারিয়াছেন যে পারসীকদিগের আচার

ব্যবহার অনেকটা হিন্দুদিগের ন্যায়। এক্ষণে উহাদের সম্বন্ধে আরও দুই চারটি কথা বলিলে বোধ হয় নিতান্ত অরুচিকর হইবে না।

আমাদের প্রত্যেকের নামে উপাধি সংযোগ থাকে। প্রথমটি নাম দ্বিতীয়টি বংশের উপাধি। মনে কর 'রামমোহন রায়'; নাম 'রামমোহন' ও বংশের উপাধি 'রায়'। অর্থাৎ তিনি 'রায়' বংশ সম্ভূত 'রামমোহন'। কিন্তু পারসীকদিগের প্রত্যেকের তিনটি করিয়া নাম থাকে; নামের প্রথম অংশটি তাহার নিজ নাম, দ্বিতীয়টি তাহার পিতার নাম ও শেষটি তাহার বংশের উপাধি অর্থাৎ এক জনের নাম 'নারৌজি ফ্রামজি কারকা', এস্থলে নিজ নাম 'নারৌজি' পিতার নাম 'ফ্রামজি' ও উহার বংশের উপাধি 'কারকা'। এই প্রকার প্রত্যেক পারসীকেরই নামের মধ্য অংশটি তাহার পিতৃনাম।

পারসীকদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই; কিন্তু আধুনা উহাদের মধ্যে দুইটা সম্প্রদায় হইয়াছে এবং অতি সামান্য কারণেই এই সাম্প্রদায়িকতা উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পারসীকদিগের মাসের তারিখ গণনা হইতে উহাদের সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। যাঁহার সময়ে মুসলমান আক্রমণে পারসীকেরা পারস্য ত্যাগ করেন সেই সাসানিয়ান বংশের শেষ নৃপতি ইয়াজ এজারাতের রাজত্বকাল হইতে পারসীকেরা সাল গণনা করিয়া থাকেন। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে একজন ইরাণ দেশীয় পারসীক বোম্বায়ে আসিয়া দেখেন যে তদ্দেশপ্রচলিত পারসী তারিখে ও পারস্যপ্রচলিত তারিখে ঠিক এক মাসের বিভিন্নতা রহিয়াছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ পারসীকই আপনাদের প্রচলিত দিবস গণনা অবলম্বন করিয়া রহিল কেবল অতি অল্প সংখ্যক লোকে ইরানপ্রচলিত প্রথা অবলম্বন করিল। প্রথম মতাবলম্বীরা 'রাসামি' ও দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা 'কাদামি' নামক সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া রহিল। বর্ত্তমান পারসীকদের মধ্যে প্রায় প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন 'রাসামি'। যদিও উল্লিখিত মতান্তর ঘটনার কারণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু পারসীকদের পক্ষে উহার যথেষ্ট অর্থ আছে। কারণ হিন্দুদিগের কোন পূজা অথবা ব্রতাদিতে যেমন পক্ষ তিথি নক্ষত্র প্রভৃতির উল্লেখ করিতে হয় উহাদের মধ্যেও তেমনি বৎসর, মাস, তারিখ ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া তবে উপাসনা করিবার রীতি আছে। সুতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের উপাসনার সময় বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে উহাদের বেশভূষার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। আজ কাল অনেকে ইংরাজের অনুকরণে ইংরাজী পরিচ্ছদ ব্যবহার করে বটে কিন্তু উহাদের পরিধেয় অন্যান্য জাতি হইতে স্বতন্ত্র। পারসীক শিশুদের বয়ঃক্রম যত দিন না সাত বৎসর হয় তত দিন উহারা 'ঝাবলা' ব্যবহার করে। গল দেশ হইতে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত লম্বা এক প্রকার দেহাবরণকে উহারা 'ঝাবলা' কহে। উহা প্রায়ই বহুমূল্য বস্ত্রে নির্ম্মিত হয়। শিশুরা সাত বৎসর সাত মাস দশ দিন বয়স পর্য্যন্ত এই প্রকার 'ঝাবলা' ব্যবহার করে। পরে তাহারা জোরস্ত্রীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাহাদের বেশ ভূষার কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। পরিচ্ছদের মধ্যে দুইটি একেবারে অপরিহার্য্য 'সাদ্র' ও 'কোষ্টি'। 'সাদ্র' কেবল একটি অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের অঙ্গাবরণ মাত্র

উহার বৈবিত্র কিছুই নাই কেবল তাহাতে একটি ছোট বগলী থাকে উহাই উহাদের জোরস্ত্রীয় ধর্ম্মের চিহ্ন। 'কোষ্টি' উহাদের উপবীত। ব্রাহ্মণদের উপবীত যেমন নব সূত্র ও ত্রিদণ্ডীতে বিভক্ত উহাদের 'কোষ্টি' ও সেই প্রকার দ্বাদশ অংশে ও বায়াত্তর সূত্রে বিভক্ত। কটি দেশে তিন বার বেষ্টন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দিকে চারটি গ্রন্থি বন্ধন করিয়া 'কোষ্টি' ধারণ করিতে হয়। পারসীকেরা কহেন যে 'ইজ্রাষ্ণ' নামক ধর্ম্ম পুস্তকের বায়াত্তর পরিচ্ছেদের প্রতিনিধি স্বরূপ তাহাদিগকে বায়াত্তর গাছি সূত্র ব্যবহার করিতে হয়। প্রতি দ্বাদশ সংখ্যক অর্থাৎ সর্ব্ব স্বদ্ধ ছয় গাছি সূত্র 'অবস্থার' পঞ্চম অধ্যায়ের সহিত সমান এবং এই ছয় সূত্রে জগৎসৃষ্টির ছয়টি অবস্থা উপলব্ধি হয়। বাইবেলে বলে যে ঈশ্বর ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, এই ভাবটি পারসীকদিগের নিকট হইতে গৃহীত সন্দেহ নাই। কোষ্টি কটি দেশে তিন বার বেষ্টন করিবার অর্থ এই যে আমরা সংচিন্তা, সদালাপ ও সৎ কার্য্যে বদ্ধ থাকিব। চারিটি গ্রন্থির অর্থ এই যে অগ্নি, বায়ু জল ও মৃত্তিকা এই চতুর্ভূত আমাদের এই বন্ধনের সাক্ষী রহিলেন। এ দেশের ব্রাহ্মণদের উপবীতের নাম যজ্ঞসূত্র। ব্রহ্মকে সূচনা করিয়া দেয় এই জন্য ইহার নাম সূত্র। সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ। আর যে নয়টী সূত্রে যজ্ঞসূত্র প্রস্তুত হয় তাহা সাধনের বিভিন্ন অঙ্গের স্মারক। প্রতিবার গ্রন্থি বন্ধন করিবার সময় পারসীকেরা ব্রাহ্মণদিগেরই ন্যায় একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের মন্ত্রে প্রার্থনা বাক্য ইহাতেও তাহাই। মন্ত্রটী এইঃ—

"অহুরা-মাজদা এই জগতের অধীশ্বর তাঁহার জয় হউক। তাঁহার শত্রু দুষ্ট শয়তান ভগ্ন হউক; আরহিমান (শয়তান) অন্যান্য দেবযোনি, দ্রাজ, ডাকিনী, মন্দকারী, ও শত্রু সকল ধ্বংশ প্রাপ্ত হউক। ঈশ্বরের শত্রুরা ক্ষতিগ্রস্ত হউক, ঈশ্বরের শত্রুরা পলায়ন করুক। হে অহুরমাজদা! আমি সকল প্রকার পাপের জন্য অনুতাপ করিতেছি। যে কিছু মন্দ চিন্তা, মন্দ কথা ও মন্দ কার্য্য আমা দ্বারা চিন্তিত, কথিত অথবা কৃত হইয়াছে, আমাদ্বারা শারীরিক মানসিক, পার্থিব, অপার্থিব, ইত্যাদি যে সমস্ত পাতক কৃত হইয়াছে তজ্জন্য আমি অনুতাপ করিতেছি।"

'সাদ্র' ধারণ এতই প্রয়োজনীয় যে তাহার অন্যথা করিলে পরলোকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। 'আর্দে-বিরাফ্-নামা' নামক একখানি পারসীক গ্রন্থে স্বর্গ দর্শন ও নরক দর্শন নামক প্রবন্ধে এক স্থানে লিখিত আছেঃ—আমরা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া এক স্থানে সমাগত হইয়া দর্শন করিলাম অসংখ্য আত্মা একত্র সমবেত হইয়াছে। উহাদের মাঝে মাঝে ভয়ানক ব্যাঘ্র, সর্পাদি হিংস্রক জীব বিচরণ করিতেছে ও ক্রমাগত সেই আত্মাদিগকে দংশন করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। তাহাদের কাতর রোদনে পাষাণও গলিয়া যায়। আমি 'শারসইজাদ্' নামক একজন দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'কি পাপে উহাদের এই দণ্ড হইতেছে?' তিনি বলিলেন "উহারা পৃথিবীতে অবস্থান কালীন সাদ্র ধারণ করিতে তাচ্ছিল্য করিয়াছিল।" পুরুষদিগের ন্যায় পারসীক স্ত্রীলোকেরাও সাদ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের সাদ্র নেট বা সূক্ষ্ম জাল ও পুরুষের সাদ্র মসলিন দ্বারা নির্ম্মিত হয়। স্ত্রীলোকেরা প্রথমে রেসমের

পায়জামা পরিয়া তাহার উপর বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত বিশ হাত দীর্ঘ রেসমী সাড়ি পরিধান করেন। সাত্রর উপর ও সাড়ির নিচে এক প্রকার জামা ব্যবহার করেন উহার নাম 'চোলি'। উহাঁরা নানাবিধ বহুমূল্য হীরকাদিখচিত স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া থাকেন। পারসীকেরা কেহই একেবারে এত দরিদ্র নাই যে যাহার বাটির স্ত্রীলোকদের স্বর্ণালঙ্কার ও রেসমী সাড়ি নাই।

কি স্ত্রী কি পুরুষ, মস্তক অনাবৃত রাখা উহাদের মধ্যে বড় অশুভজনক। উহাদের বিশ্বাস যে কৃষ্ণবর্ণ মাত্রই শয়তানের সৃষ্টি সুতরাং যেখানে কৃষ্ণবর্ণ সেই স্থানেই শয়তানের প্রভুত্ব এই জন্য দিনরাত টুপি পরিয়া উহারা কৃষ্ণবর্ণ কেশ ঢাকা দিয়া রাখেন। স্ত্রীলোকেরা টুপির পরিবর্ত্তে 'মায়াবানু' নামক শ্বেত বস্ত্র খণ্ডে কেশ আচ্ছাদন করিয়া রাখেন।

উহাদের পুরোহিতের পরিচ্ছদ প্রায়ই সাধারণ পারসির ন্যায় কেবল মাথায় টুপির পরিবর্ত্তে শ্বেত বস্ত্রের পাগড়ি ব্যবহার করা হয়।

বিশ্বাস ও জ্ঞান।

বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিতর্কে মানুষের হৃদয় শুষ্ক হয়, অতএব অবিচারিতচিত্তে গুরু-বাক্য, শাস্ত্রের আদেশ বা সমাজপ্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস অবলম্বন কর, শান্তিলাভ করিবে; এরূপ কথা আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেই বলিয়া থাকেন, "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"। অর্থাৎ যুক্তি ও বিচারবিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অন্ধভাবে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের অধিবাসিগণ নানাকারণে অলসপ্রকৃতি ও পরিশ্রমে অপটু। স্বাধীনভাবে জ্ঞানানুশীলন গুরুতর মানসিক পরিশ্রম সাপেক্ষ, সুতরাং স্বাধীন চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া নির্ব্বিকার ভাবে গুরু বা শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ করা অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। এই কারণে এদেশে গুরুবাদের প্রভাব অতিরিক্ত মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। পরমেশ্বর মানবের অন্তঃকরণে জ্ঞানপিপাসা ও সত্যানুরাগ নিহিত করিয়াছেন। মানব যে পরিমাণে বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে পরিমার্জ্জিত করে, সেই পরিমাণে সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, সত্যের উপলব্ধিই জ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত। জ্ঞান অগ্রে সত্যকে উপার্জ্জন করিলে পশ্চাৎ হৃদয় তাহা ধারণ করে। সুতরাং জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত সত্যোপার্জ্জনের সম্ভাবনা নাই। সত্য লাভ না হইলে ধর্ম্মও নিরবচ্ছিন্ন কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। এই জন্য সংহিতাকার মনু বলিয়াছেন,

"সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা"

জ্ঞানিগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা শাস্ত্র সকল বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইবেন। জ্ঞানস্পৃহা ও বুদ্ধি বিবেচনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া গতানুগতিকের ন্যায় শাস্ত্রবাক্য বা অন্যদীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিলে সত্য লাভের সম্ভাবনা নাই, এই মহাসত্য আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সাধারণ জনসমাজে চিরকাল সমভাবে জ্ঞানালোচনার স্রোত প্রবাহিত থাকিতে পারে না। জনসাধারণ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া একবারে ধর্ম্মবিহীন না হয়, এই নিমিত্ত কল্যাণকামী আচার্য্য-

গণ নিম্নাধিকারিগণকে শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ বিধি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এইরূপে জনসমাজ হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানচর্চ্চা অন্তর্হিত হয় এবং আচার্য্যগণের উপদেশবাক্য লোকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে। ইহার পর অভ্রান্ত গুরুবাদের দূষিত মত সকল ধর্ম্মসাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে সমাজে বদ্ধমূল হইতে থাকে। ইহার ফল ঘোরতর নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবনতি।

"যোগুরুঃ স হরিঃস্বয়ং"

যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি।

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।"

অর্থাৎ হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণকর্ত্তা, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে পরিত্রাতা আর কেহই নাই। ইহা অপেক্ষা ঘৃণিত ও ভয়ানক অনিষ্টকর মত আর কি হইতে পারে?

অনেকে বলিবেন, তুমি কাম ক্রোধের অধীন অসংযতচিত্ত দুর্ব্বল মানুষ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি কি প্রকারে নির্দ্ধারণ করিবে, অতএব জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানাপন্ন আচার্য্যের শরণাপন্ন হও, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই তোমার পক্ষে সুপথ্য। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, অগ্নি যেমন ইন্ধন ও সমীরণ সহযোগে অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, সৎগুরু বা সাধু আচার্য্যের আশ্রয়ে মানবের জ্ঞানস্পৃহা ও সত্যানুরক্তি সেইরূপ সন্ধুক্ষিত হইয়া থাকে। নতুবা নিজের বিচার বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাকে বিসর্জ্জন করিয়া অন্ধভাবে অন্যের পুচ্ছাবলম্বনে শ্রেয়োলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। কথায় বলে মনের অগোচর পাপ নাই সেইরূপ জ্ঞানের অগোচর ধর্ম্ম নাই। না. জানিয়া বিষ ভক্ষণ করিলেও অনিবার্য্যরূপে দেহে তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু ধর্ম্ম ত এ প্রকার কোন ভৌতিক বস্তু নয়, জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের নিত্য যোগ। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, আত্মতুষ্টি * অর্থাৎ যাহাতে ধর্ম্মবুদ্ধি সায় দেয় এবং স্বানুভব † অর্থাৎ নিজের জ্ঞানগত বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনু সর্ব্বপ্রকারে পরাধীনতা বর্জ্জন করিয়া স্বাধীন ভাবে পরমাত্ম ধ্যানের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, যে কর্ম্ম করিতে করিতে জীবাত্মার আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, অবিহিত, অনিষিদ্ধ, ও বিহিত অনেক প্রকারের মধ্যে যাহাতে মন প্রশস্ত হয়, এমত কর্ম্ম করিবে, ইহার বিপরীত যে কর্ম্ম অর্থাৎ যাহাতে আপনার মন প্রশস্ত না হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে।

* "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎধর্ম্মস্য লক্ষণং॥"
মনু, ২য় অধ্যায় ১২ শ্লোক।

† "স্বানুভূতেঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।"
ইত্যাদি।
যোগবাশিষ্ঠ ৪র্থ সর্গ ৫৫ শ্লোক।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

মূল রামায়ণে আছে মহর্ষি বাল্মীকি একদা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি গুণবান বিদ্বান বলবান ধর্ম্মপরায়ণ দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র; কোন্ ব্যক্তিই বা লোকব্যবহারকুশল, সুচতুর ও প্রিয়দর্শন; এবং কাহাকে ক্রুদ্ধ দেখিলেই বা দেবতারা ভীত হয়েন। আপনি

এরূপ মনুষ্যের বিষয় অবশ্যই অবগত আছেন।

"মহর্ষে! ত্বং সমর্থোসি জ্ঞাতুমেবং বিধং নরং।"

বাল্মীকি উত্তর করিলেন তুমি যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলে তাহা মনুষ্যে নিতান্ত দুর্লভ; তথাপি—

"মুনে বক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধা তৈর্যুক্তঃ শ্রূয়তাং নরঃ।"

হে মুনি! ঐ সকল গুণযুক্ত মনুষ্যের বিষয় স্মরণ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। এই বলিয়া ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রামচন্দ্রের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। রামায়ণের প্রথম সর্গের অষ্টাদশ শ্লোকে আছে—

"বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।"

অর্থাৎ রামচন্দ্র বলবীর্য্যে বিষ্ণুসদৃশ সৌন্দর্য্যে চন্দ্রসদৃশ, ক্রোধে কালাগ্নি সদৃশ ইত্যাদি। সপ্তবিংশ শ্লোকে জনকদুহিতা সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে,

"জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্ম্মিতা,
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নারীণামুত্তমা বধূঃ।"

অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নারীশ্রেষ্ঠা জনককুলজাতা সীতা সাক্ষাৎ দেবমায়ার ন্যায় নির্ম্মিতা হইয়াছিলেন। "দেবমায়েব নির্ম্মিতা" ইহার মধ্যে যে ইব শব্দ আছে, তাহাতে টীকাকারের মন উঠিল না। সম্ভবতঃ টীকা লিখিবার সময়ে রামচন্দ্রের অবতারত্ব পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই জন্য টীকাতে আছে "ইবশব্দ এবার্থে" অর্থাৎ এখানে ইবশব্দের অর্থ এব। ইব শব্দে উৎপ্রেক্ষা বুঝাইবে না, এব অর্থাৎ প্রকৃতই সেই বস্তু। সুতরাং টীকাকারের মতে দেবমায়েব নির্ম্মিতা ইহার অর্থ সীতা প্রকৃতই দেবমায়া হইলেন। রামচন্দ্রের বিশেষণে বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে, ইহার মধ্যে সদৃশ কথা রহিয়াছে, ইব থাকিলে ঐ স্থান হইতেই রামচন্দ্রের বিষ্ণুঅবতারত্ব সংস্থাপনের চেষ্টা হইত।

যাঁহারা বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডের প্রথম সর্গ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে এখানে ইব শব্দ এব অর্থে ব্যবহার করিবার গ্রন্থকারের কোন উদ্দেশ্য নাই। এব শব্দ ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় কিছুমাত্র থাকিলে "দেবমায়ৈব নির্ম্মিতা" এরূপ লিখিতে পারিতেন, অথচ ছন্দে দোষ বর্ত্তিত না। বিশেষতঃ যখন রামচন্দ্রকে মনুষ্য বলিয়া পুনঃপুনঃ অভিহিত করা হইয়াছে, তখন দেবত্বের আভাস দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

নারদ বাল্মীকির সমক্ষে রামচন্দ্রের অলোকসামান্য গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যৌবরাজ্যে অভিষেক আয়োজনের পরিণামে কৈকেয়ীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রামচন্দ্রের বনগমন, গুহের সহিত মৈত্রী স্থাপন, পুত্রশোকে দশরথের অকালমৃত্যু, মাতৃকৃত মহাপাপে খিন্নমনা রামদর্শনপিপাসু ভরতের বনগমন, রামের আগ্রহাতিশয়ে ভরতের নগরে প্রত্যাবর্ত্তন, বিরাধবধ শূর্পনখার নাসাচ্ছেদন, সীতাহরণ, বালিবধ, হনুমান কর্ত্তৃক সীতার উদ্দেশ, সমুদ্রপীড়ন, সেতুবন্ধন, রাবণবধ, লঙ্কাগৃহবাসিনী সীতার অগ্নিপরীক্ষা, বিভীষণের লঙ্কায় অভিষেক, সীতাসহ রামচন্দ্রের রাজ্যপালন এই কয়েকটি চিত্র প্রথম সর্গের লব্বুইটি শ্লোকে স্থান পাইয়াছে। এই সর্গের অবশিষ্ট কএকটী শ্লোকে রামচরিত পাঠের ফলশ্রুতির উল্লেখ আছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাহার মধ্যে কোনটিতেই দেবত্বের পরিচয় নাই।

নারদ দেবলোকে গমন করিলে বাল্মীকি স্নান করিবার জন্য তমসাতটে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ব্যাধহস্তমুক্ত

তীক্ষ্ণ সায়ক আসিয়া ক্রৌঞ্চের মর্ম্মস্থল ভেদ করিল, ক্রৌঞ্চীর তীব্র আর্ত্তনাদে বাল্মীকির হৃদয় অভিভূত হইল। তিনি যে বাক্যে নিষাদকে অভিশপ্ত করিলেন তাহা ছন্দগ্রথিত বলিয়া উহা হইতেই শ্লোকের সৃষ্টি হইল।

স্নানান্তে মহর্ষি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চবধ ও শোকাবেগপ্রসূত অচিন্তিতপূর্ব্ব শ্লোকের বিষয় আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে মহাতেজা ব্রহ্মা তদ্দর্শনার্থ আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া কহিলেন মুনে, তোমার মুখ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে তাহা শ্লোক বলিয়াই বিখ্যাত হইবে, উহা আমারই সংকল্পপ্রভাবে তোমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। তুমি এক্ষণে সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে রাম লক্ষ্মণ সীতা ও রাক্ষসগণের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

"তচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি,
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি"

যাহা অবিদিত অর্থাৎ নারদ যাহা বলেন নাই তাহা (রচনাকালে) তোমার বিদিত হইবে, কাব্যের কোন অংশই মিথ্যা হইবে না। এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। এই ইঙ্গিত বাল্মীকির পক্ষে যথেষ্ট হইল। তিনি কল্পনার মাত্রা চড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভার বলে রামায়ণ মহাকাব্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। প্রসঙ্গত এই স্থানে একটী কথা বলা আবশ্যক। যাঁহারা বলেন রাম না জন্মাইতে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম। এই অসম্ভব কথা বাল্মীকির রামায়ণে নাই। প্রত্যুত রাম অরণ্যবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যখন রাজ্য গ্রহণ করেন সেই সময়ে তাঁহার অধিকারস্থ এক মহাকবি তাঁহার চরিত্র যে রচনা করেন উপরি উদ্ধৃত বাক্যগুলি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

সমগ্র পুস্তক রচনাকালে মহর্ষি ইহার প্রচার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময়ে মুনিবেশধারী লবকুশ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সমগ্র পুস্তক অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। শীঘ্রই সঙ্গীতবিদ্যা, স্থান ও মূর্চ্ছণাতত্ত্ব তাঁহারদের আয়ত্ত হইল। একদা এই দুই ভ্রাতা অযোধ্যার রাজমার্গে রামায়ণ গান করিতেছেন, সহসা রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্বভবনে আনয়ন পূর্ব্বক উহাঁরদের সমুচিত সৎকার করিলেন ও পরিশেষে তাঁহাদিগকে সঙ্গীত করিবার আদেশ দিলেন। রাজসভায় শ্রোতার অভাব ছিল না। রাগরাগিণী সহকৃত সংস্কৃতাশ্রিত সঙ্গীত বীণাকণ্ঠের আলাপনে সকলকে স্তব্ধ করিয়া ফেলিল। ফলত লবকুশমুখে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ মহাকাব্যের অবতারণা করিলেন।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

(শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য)

দ্বিতীয় প্রকরণ-দ্বিতীয় ব্যাখ্যান।

ব্রহ্মোপাসকদিগের উচ্চ অধিকার ও কর্ত্তব্য।

ওহে ব্রাহ্মগণ! করি নিবেদন।
কেন লইয়াছি ঈশ্বর-শরণ॥
তিনি পিতা মাতা দিতেছেন প্রাণ।
বিপদে পড়িলে করিছেন ত্রাণ॥
পাপে অনুতাপি করিলে ক্রন্দন।
দয়া করি পাপ করেন মোচন॥
তিনি সাধকের হৃদয়ে আসিয়া।
বলেন বচন কত আশ্বাসিয়া॥
চল মোর পথে হ'য়ে এক মন।
কাটি দিব তব মায়ার বন্ধন॥
দাও মনঃ প্রাণ মোরে সযতনে।
রাখিব তোমারে অমৃত ভবনে॥
প্রেম-ভরে সদা ভজরে আমায়।
বলি দিব মোরে পা'বার উপায়॥
হেন স্থানে তোমা করিব রক্ষিত।
যথা হ'তে আর না হবে স্খলিত॥

স্বর্গের অমৃত দিব হে এখানে।
যে অমৃত-ভোগ বাড়িবে সেখানে॥"
ভেবে দেখ ওহে প্রিয় ব্রাহ্মগণ!
যে দিন করেছি এ ধর্ম্ম গ্রহণ॥
সে দিন হইতে নূতন জীবন।
নূতন হৃদয়, নূতন নয়ন॥
দেখি তাঁর রূপ সুমন্দ্র সরিতে।
রবি শশি তারা কুসুম রাজিতে॥
দশ দিশ তাঁর মহিমা প্রকাশে।
বিশ্ব তাঁর গান গাহিছে উল্লাসে॥
তিনি অন্তরাত্মা প্রকৃতি ভিতরে।
তাই সে প্রকৃতি হেন শোভাধরে॥
তাই দিবাকর বিমল কিরণে।
বিতরিছে প্রাণ জগবাসি জনে॥
তাই সুধাকর সুধা কর ক্ষরে।
তাই গিরি হ'তে নিঝরিণী ঝরে॥
তাঁর স্নেহ কিবা গম্ভীর অপার।
কণা তার বুঝে হেন সাধ্য কার?
সুধাময় তাঁর পথে যেবা যায়।
তাঁহার অমৃত হৃদি সেই পায়॥
দেখ অতুলন হৃদি তাঁর রূপ।
কেবলি মঙ্গল মোহন স্বরূপ॥
প্রেম-সূর্য্য ছাড়ি কোথা তুমি যাও।
রে আত্মন্ চাও, তাঁর পানে চাও॥
পাপ মলা ত্যাগ কররে যতনে।
হৃদয়ে পাইবে সেই প্রেমধনে॥
নিজ ইচ্ছা সব কররে বর্জ্জন।
তাঁর ইচ্ছা যেবা কররে আপন॥
সেই ইচ্ছা কর জীবনে পালন।
এই তাঁর সহ যোগের সাধন॥
ভক্ত তাঁর ইচ্ছা—হৃদয় কন্দরে।
পাইয়া একান্তে তারি অনুসরে॥
তাঁর ইচ্ছা যেবা—লাঙ্গুল চালন।
অথবা বিশাল রাজ্যের শাসন॥
অথবা দীনের অশ্রু বিমোচন।
অজ্ঞান বিনাশি জ্ঞান বিতরণ॥
তাঁর সুধা নাম জগতে প্রচার।
তাঁহা হ'তে তুমি পাও যেই ভার
সে কায সাধিতে কর প্রাণপণ।
হইবে সফল জীবন ধারণ॥

তাঁর সহ যোগ হ'লে একবার।
সে যোগ বিচ্ছেদ হবে নাহি আর॥
তিনি যদি হ'ন হৃদয়ের ধন।
পাবে তুমি সদা তাঁর দরশন॥
হৃদি রাজ্যে তব দয়া করি আসি।
আপন শাসন তথা পরকাশি॥
করিবেন হেন তোমার অন্তর।
হবে তাহা তাঁর রাজ্য মনোহর॥

কবে তাঁরে লয়ে জীবন যাপিব?
তাঁর দাস হ'য়ে তাঁহারে সেবিব?
ভুলিব না আর মোহের ছলনে।
ভাবিব তাঁহারে শয়নে স্বপনে॥
তাঁর দয়া মনে সতত স্মরিব।
তাঁর সুধা নাম নিয়ত জপিব॥
নিজ ইচ্ছা কিছু হৃদি না পোষিব।
যে ইচ্ছা তাঁহার তাহাই সাধিব॥
অমৃতের দিকে ক্রমিকি চলিব।
তাহা হ'তে আর কভু না টলিব।
কবে তাঁর ভাবে হৃদয়ে গলিব।
তাঁরে ছাড়া আর কিছু না চাহিব॥

কবে এ অধম জনে দয়াময় হরি।
তারিবেন মৃত্যু হ'তে দিয়া পদ-তরী॥
মৃত্যু-সঞ্জীবনী ভক্তি জীবনের সার।
করিবেন তাহা দিয়া আমারে উদ্ধার॥

প্রার্থনা।

ভক্তির সুলভ তুমি—পেয়েছি বচন।
দয়াময়! দাও ভক্তি তোমার সাধন॥
তাহে যদি পাই তোমা হৃদি একবার।
তবে ত সফল হবে জনম আমার॥

ক্রমশঃ।

সাংখ্য স্বরলিপি।

স্বাধ্যায়ের বেদ পাঠে সংক্ষেপে স্বরগুণ-সঙ্গৎ।

স্বরিৎ-স্বরের বেলায়

(স্বরিৎস্বরকে যদি সা সুরে ধরা যায়)

বেদপাঠ। সা ।
সঙ্গৎ—ডাঁ। সা × পা × গা।
২......
সঙ্গৎ—বাঁ। সা × পা × সা।
২ ৩......

অনুদাত্তস্বরের বেলায়

—(নি তাহা হইলে অনুদাত্ত স্বর হইল)

২
বেদপাঠ। নি ।
২ ^
সঙ্গৎ—ডাঁ। "নি × মা × গাঁ" বা "নি × মা × রে"।
২... ... ... ২... ... ...
সঙ্গৎ—বাঁ। নি × ^মা × নি বা "রে "।
৪ ৩...... ৩

উদাত্তস্বরের বেলায়

• —(রে তাহা হইলে উদাত্তস্বর হইল)

বেদপাঠ রে ।

সঙ্গৎ—ডাঁ। রে × নি × পা।
২……

সঙ্গৎ—বাঁ। রে × পা × রে।
২…… ৩।

ডাঁ = ডানহাত বা ডানদিক।
বাঁ = বামহাত বা বামদিক।

সমালোচনা।

হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

এই পুস্তকখানি সুপাঠ্য ও সময়োপযোগী হইয়াছে। দীনবাবু ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মের প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের অবস্থা সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন আর্য্যগণ হিন্দুধর্ম্মকে অব্যাহত ও অবিচ্ছিন্ন রাখিতে চিরকালই প্রয়াস পাইয়াছেন। "প্রাচীন কালে যখন চার্ব্বাক-প্রমুখ নাস্তিকদের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে, ঋষিগণ দর্শন শাস্ত্রের অবতারণা করিয়া তাহাদের কুতর্কজাল ছিন্ন করিয়াছিলেন। পরে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করিল, আর্য্যগণ তাঁহাদের প্রিয়ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। … … মহাপণ্ডিত কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করিয়া গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন। তাঁহার পর অসামান্য প্রতিভাশালী শঙ্করাচার্য্য তর্কবলে বৌদ্ধমত খণ্ডবিখণ্ড করিয়া শৈবধর্ম্ম বিস্তার করেন।" কিছুকাল পরে যখন খ্রীষ্টিয় প্রচারকদিগের দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম আঘাত প্রাপ্ত হইল তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম্মের সমর্থনে সমরে অবতীর্ণ হইলেন। "শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত সমাচার দর্পণে হিন্দু শাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইলে তিনি "ব্রাহ্মণ সেবধি" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে উৎকৃষ্ট ভাব আছে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় পুরাণও তন্ত্র প্রতিপাদিত ধর্ম্ম সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে বিশদ রূপে দেখাইয়াছেন যে এক ঈশ্বরের উপাসনা বিধিবদ্ধ করাই হিন্দুশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তবে যাঁহারা নিরাকার ভাবে পরমেশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, তাঁহাদের জন্যই প্রতিমূর্ত্তির দ্বারা তাঁহার উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। * * জ্ঞানীর পক্ষে ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে উপাসনা, জ্ঞানহীনের পক্ষে কোন প্রতিমা অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা;—শাস্ত্রের ইহাই অভিপ্রায় এবং রামমোহন রায় ইহাই প্রচার করিয়াছিলেন।" দীন বাবু বলিয়াছেন যদি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অভিপ্রায়ানুসারে হিন্দু জ্ঞানীরা নিরাকার উপাসনার পক্ষপাতী হইতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্ম বলিয়া একটী সম্প্রদায়ই গঠিত হইত না। কেহ নিরাকারবাদী হিন্দু কেহ সাকারবাদী হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইতেন। পরন্তু আদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া যে সকল ব্রাহ্ম হিন্দু সম্প্রদায়ের বহির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা দুর্ব্বল হিন্দুসমাজ আরও অধিক বলহীন হইত না। আমরাও বলিয়াছি যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া নূতন মত প্রচার করা ব্রাহ্ম বলিয়া এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু জাতির মধ্যে মিশাইয়া যাইবে, ইহাই আমাদিগের লক্ষ্য। *

গ্রন্থকর্ত্তা হিন্দুদিগের স্বীয় শাস্ত্রার্থে উপেক্ষা, কৌলীন্য প্রভৃতি জঘন্য প্রথার নিরাকরণে ঔদাস্য, বিদেশ হইতে প্রত্যাগত কৃতবিদ্য স্বদেশীয়দিগকে স্বীয় সমাজ হইতে বর্জন, ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণীবিশেষের পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান ভোজ্যান্নতা প্রতিষেধ, অনেক হিন্দুনামধারীর কপটাচার অর্থাৎ হিন্দুর ভাণ করিয়া ম্লেচ্ছের ন্যায় আচার ব্যবহার প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া হিন্দু সমাজের সংস্কারের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আমরা তাঁহার মতের সম্পূর্ণ প্রতিপোষক। আমরা বলি হিন্দু ধর্ম্ম (উপধর্ম্মের কথা বলিতেছি) বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ হওয়ায় অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালে ঋষিরা যাগ যজ্ঞের ফল অস্তবৎ ইহা উপনিষদে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভক্তি শাস্ত্রে বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের ফলহীনতা দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে

দর্শিতোঽয়ং ময়াচারো ধর্ম্মমুদ্বহতাং ধুরং।

"ধর্ম্ম ভারবাহি লোকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ আচার আমি মন্বাদি শাস্ত্রে প্রদর্শন করিয়াছি" এই শ্লোকের টীকায় জ্ঞানীপ্রবর শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন

"মন্বাদিরূপেণ ধর্ম্মরূপাং ধুরং ভারং, কর্ম্ম-জড়ানামিত্যর্থঃ"

যত দিন মানুষ জড় অর্থাৎ অজ্ঞান থাকে তত দিন ক্রিয়া কাণ্ডের নিরর্থক আচারের বিধিও তাহার নিকটে বলবৎ থাকে কিন্তু কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইলে কি কেহ আর মন্ত্রার্থ না জানিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করে বা লৌকিকতার অনুরোধে অসার কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? যাহারা গতানুগতিকের ন্যায় না বুঝিয়া প্রচলিত ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করে তাহারা হয় অন্ধভক্তি দ্বারা চালিত কিম্বা কপটাচারী। ফলতঃ হিন্দু ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান পদ্ধতির সংশোধন করা কর্ত্তব্য। হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি সমবেত হইয়া হিন্দু শাস্ত্রার্থ রক্ষা করিয়া হিন্দুর উপাসনা ক্রিয়াকাণ্ড বিবাহাদি ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করেন, ইহা আমাদিগের অভিপ্রায়। তাহা হইলে হিন্দু শাস্ত্রের সার মর্ম্ম অবগত হইয়া লোকে ব্রহ্মপূজায় প্রবৃত্ত হইবে ও যে আচার ব্যবহার ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি দ্বারা প্রণোদিত তাহাই প্রবর্ত্তমান হইয়া ভারতের অপূর্ব্ব শ্রী সংসাধিত হইবে।

* শ্রাবণ মাসের পত্রিকা দেখুন

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩৩৩৲
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১২৬।৵১৫
সমষ্টি ..	৩৪৫৯।৵১৫
ব্যয় ...	২০১৮৵১০
স্থিত	৩২৫৭॥ ৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ১৪৭৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৮১৬ শকের ভাদ্র মাসের দান ১৪০

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন ১৮১৫ শকের পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার ২

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় দেব ৪

১৪৭৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৫২॥৵০

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দত্ত,	কলিকাতা	১৲
„ „ জগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়,	হালিসহর	৩।৵০
„ „ হরকুমার সরকার,	বোয়ালিয়া	৩।৵০
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ,	কটক	২৸০
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী,	কলিকাতা	৩৲
„ মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর	ঐ	৩৲
„ রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর	ঐ	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চন্দ্র	ঐ	৩৲
„ „ লালবিহারী বড়াল,	ঐ	৩৲
„ „ হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	১৲
„ পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন,	ঐ	৩৲
„ বাবু বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	৩৲
„ „ দেবেন্দ্র দেব দাস,	ঐ	৩৲
„ „ শ্রীগোপাল মল্লিক,	ঐ	২৲
„ „ গোপালচন্দ্র দে,	ঐ	১৲
„ „ হেমচন্দ্র ঘোষ,	ঐ	৩৲
„ „ তুলসীদাস দত্ত,	ঐ	৩৲
„ „ কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া	কোহিমা	৩।৵০
„ „ কালিনারায়ণ গুপ্ত,	ঢাকা	৬৸০
		৫২॥৵০

পুস্তকালয়	৩৩।৶০
যন্ত্রালয়	৫৮৲
গচ্ছিত	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৸০
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	৪০৲
পুস্তক বিক্রয়ের কমিসন ..	৶০
সমষ্টি	৩৩৩৲

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ ...	৫৩৴ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩৩॥৵০
পুস্তকালয়	১৯।৴০
যন্ত্রালয়	৯৩৴০
গচ্ছিত	২৮৴৫
সমষ্টি	২০১৮৵১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০এ কার্ত্তিক শুক্রবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের একচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ন ৩ ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
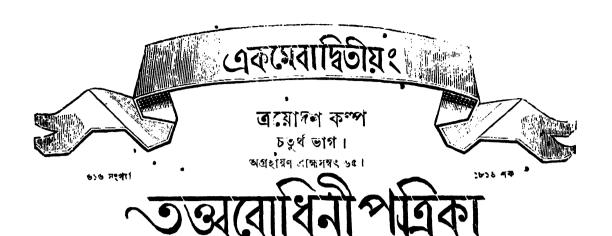
ঈশ্বরের প্রতি প্রেমোক্তি।

হে হৃদয়বিহারি! কে তুমি যে আমার নয়ন-পথে তুমি সর্ব্বদা খেলিয়ে বেড়াও? তোমার যে কি রূপ তাহা আমি কেমন করিয়া বর্ণন করিব। কাহার সঙ্গে তাহার তুলনা দিব আমি ভাবিয়া পাই না। যাহা কোথাও নাই তাহা তোমাতে আছে। আমি জানিয়াছি তুমি সংসারের সার। তোমার প্রসন্ন বদন আমার সকল দুঃখ হরণ করে। তোমার প্রসন্ন বদন আমি বড় ভাল বাসি। যখন ঐ প্রসন্ন বদন আমাকে দেখাইয়াছ তখন আমার মতন সুখী জগতে কে আছে? যখন আমি দুঃখ-সাগরে ভাসি তখন কাহার প্রসন্নতাতে আমি প্রসন্ন হই, হে প্রিয়তম! তাহা আমাকে বল এই কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। ইচ্ছা হয় তোমার অরূপ রূপ-মাধুরী অহর্নিশি অবলোকন করি। আহা! কি মনোহর সৌন্দর্য্য সাজে তুমি সাজিয়াছ! এই সাজ তোমাকে কে প্রদান করিল? ভ্রান্ত আমি! তোমাকে আবার কে সৌন্দর্য্য সাজে সাজাইবে? তুমিই জগতের সকল বস্তুকে সাজাও, তোমাকে কেহ সাজায় না। ইচ্ছা হয় তোমার অরূপ রূপমাধুরী দিবানিশি হৃদয়-মন্দিরে বদ্ধ করিয়া রাখি। তুমি কি অমূল্য নিধি তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। তুমি কি মুক্তা না মরকত, সূর্য্যকান্ত না চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত না অয়স্কান্ত, তুমি নয়ন তৃপ্তি-কর কোন্ মণি? তাহা নয়, কখনই নয়। মণি কি এমন হয়? এ স্বর্গীয় প্রভা কি তাহাতে আছে? আসুক, পৃথিবীর উৎকৃষ্টতর হীরক তোমার কাছে আসুক। সে লজ্জা পাইবেক। তুমি যখন-আমার হৃদয়কে স্পর্শ কর তখন আমার হৃদয় কি শীতল হয় তাহা কি বলিব। এরূপ শীতল করিতে আর কাহার সাধ্য আছে? যখন আমার হৃদয় সংসারের দুঃখ দাবানলে দগ্ধ হইতে থাকে তখন তুমি মলয় সমীরণের ন্যায় আমার প্রাণে জীবন সঞ্চার কর। যখন পৃথিবীর সকল মনুষ্য হইতে নিষ্ঠুর আ-ঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রণয়-তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া পড়ি তখন তোমারই কৃপায় তোমা দ্বারা সেই তৃষ্ণা নিবারিত হয়। নিদাঘ কালের পানীয়ের ন্যায় তোমার ন্যায় স্নিগ্ধ-

কর বস্তু কে কোথায় পাইয়া থাকে। তুমি কুসুমের ন্যায় গন্ধ বিস্তার করিয়া আমার মনোভৃঙ্গকে উন্মত্ত করিয়াছ। কি মাধুরী! কিবা গন্ধ! এ প্রকার মধু কোন্ ফুল সদা বিতরণ করে? যেখানে যত কুসুম আছে সকলই তোমার কাছে আসুক। তোমার ন্যায় রূপ, রস, গন্ধ, আর কোন্ ফুলের আছে? এ ফুল বার মাস ফুটিয়া থাকে, যত অলিকুল ইহার মধুপান জন্য আকুল। ফুলমধু পান জন্য আকুল হইয়া যখন প্রাণরূপ অলি গুঞ্জরিতে থাকে তখন তুমি কৃপা করিয়া তাহার আশা পরিতৃপ্ত কর।

হে প্রিয়তম! তুমি অন্তর্যামী হইয়া অন্তরে বিরাজ করিতেছ। নয়ন মুদিত করিলেই তোমাকে আমি দর্শন করি। তোমা ভিন্ন আর কাহার সাধ্য যে আমার অন্তরে বিহার করে? যেখানে যাই তোমাকেই দর্শন করি, তুমি আমার নয়নের তারা। তোমাকে না দেখিলে আমি অস্থির হই, দিবসেও এই সংসার অন্ধকার দেখি। তুমি অন্ধকার গগনে একমাত্র তারার ন্যায়। তোমাকে দেখিয়া আমি জীবন ধারণ করি। কর্ম্মভূমিতে ক্লান্ত হইয়া তোমার সুখদ সুস্নিগ্ধ প্রেম তরুতলে আমি বিশ্রাম করি। ইচ্ছা হয় হে প্রিয়তম! তোমাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে পাইয়া কালরূপ রাক্ষসীরে একেবারে বিনাশ করি। তুমি যখন আমাকে প্রিয় সম্ভাষণ দ্বারা সন্তোষামৃত প্রদান কর তখন আমি স্বর্গসুখ লাভ করি, তখন এক দৃষ্টে তোমার বদনসুধাকর নিরীক্ষণ করি। সমস্ত জীবন তোমাকে হৃদয়মন্দিরে রাখিয়া তোমাকে যত্নে পূজা করিব। তোমাকে প্রণয়-অঞ্জলি দিব, তোমাকে প্রণয়-আরতি করিব। প্রেমের চামর লইয়া তোমাকে বীজন করিব। অতি যত্নে প্রেমের বেদ তোমার সম্মুখে পাঠ করিব। দিবস রজনী প্রণয়কে আহ্নিক কৃত্য করিয়া জীবন যাপন করিব। আমি তোমার প্রেমাধীন, তোমাকে কি কখন আমি ভুলিতে পারি? আর সকল ভুলিতে পারি, তোমার ঐ অরূপ রূপমাধুরী কখন ভুলিতে পারি না, পাষাণপট্টে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় তাহা আমার হৃদয়ে চির মুদ্রিত রহিয়াছে।

তুমি আমার সখা। তুমি আমার আত্মার আত্মা। এমন নিকটতম প্রিয়তম আর কে আছে? তোমাকে ছাড়িলে পলকে প্রলয় উপস্থিত হয়। তাই বলি হে প্রিয়তম! এস, নিত্যকাল তোমার সহচর অনুচর হইয়া সুখের জলধি-নীরে আমি ভাসমান হই। প্রেমময়! প্রেমের ডোরে সুদৃঢ় বন্ধনে আমাকে বাঁধ। এই মিলিত ভাব কখন ছিঁড়িতে দিব না। হে প্রিয়তম! তুমি হৃদয় মাঝে এসো, মন প্রাণ জুড়ুক। তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরণীতে স্বর্গসুখ লাভ করি। আহা! বল কে জ্বলন্ত সংসারানল এই মাত্র নিবাইল। এই মাত্র পূর্ণিমার শশী হইতে মেঘের ঘন আবরণ কে সরাইল? সেই প্রেমশশীকে কে এখন আমাকে দেখাইল? যে মহাভীম প্রভঞ্জন সুপ্রকাণ্ড বৃক্ষগণকে ছিন্নভিন্ন করিতেছিল, তাহা এখন কে থামাইল? কে এখন বসন্তস্নিগ্ধ সমীরণ বহাইল? কে এখনই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে প্রতপ্ত ধরণীকে শান্তিজল দিল? সুশীতল করিবার জন্য জলদকে বর্ষিতে আদেশ করিল? শুষ্কলতা তৃণদল অমনি বাঁচিয়া উঠিল?

জড়ের সাধারণ গুণ।

(১ বৈশাখ, রবিবার ১৭৯৫ শক।)

পূর্ব্ব প্রস্তাবের শেষে বলা হইয়াছিল, রসায়নের আগে জড়ের সাধারণ গুণ ও তাপতড়িৎ প্রভৃতি বর্ণনা করিব। জড় পদার্থের সাধারণ গুণ ও প্রকৃতি আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাইবে, যেমন ইহার ভিতর পরীক্ষার বিষয় অনেক আছে, তেমনি ইহার ভিতর অনেক অনুমান-সিদ্ধ বিষয়ও আছে। জড় পদার্থ কাহাকে বলে, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায় যে, যে কোন বস্তু বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় তাহাই জড়পদার্থ; পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোন একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যাহা তাহাই জড়পদার্থ—যেমন এই দ্রব্য দর্শন দ্বারা জানিতেছি এই জন্য ইহা জড়পদার্থ, তাহাতে কেহ কেহ বলেন যে, এই লক্ষণে ভ্রম আছে। আয়নার ভিতর যখন প্রতিবিম্ব দেখে, বালকেরা তাহার পশ্চাতে হাত দিয়া তাহাকে ধরিতে যায়; কিন্তু বাস্তবিক তো সেখানে কিছু নাই। সুতরাং ঐ লক্ষণ অনুসারে জড়পদার্থ নিরূপণ করা যায় না। এই জন্য পণ্ডিতেরা আর এক লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন—এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু যদি অন্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলেই সেই পদার্থের যাথার্থ্য নিরূপণ হইবে। যেমন, এই দ্রব্যটী দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা গ্রাহ্য, ইহার উপরে আর কথাটী কহিবার উপায় নাই। কোন কোন স্থলে এক বস্তু পঞ্চেন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য হয়। দর্শন দ্বারা কোন বস্তু দেখিয়া তাহাতে যদি অপ্রত্যয় থাকে, স্পর্শ দ্বারা তাহা অপনীত হয়; অতএব দর্শন স্পর্শ দ্বারা যাহা একদা গ্রাহ্য হয় তাহাই যথার্থ,—এই লক্ষণেও ব্যভিচার আছে। সূর্য্যকে আমরা দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ দ্বারা জানিতে পারি না—সূর্য্যকিরণকে স্পর্শ করিতেছি বলিয়া কিছু সূর্য্যকে স্পর্শ করিতেছি না—অতএব দ্বিতীয় লক্ষণেও সকল বস্তুকে পাওয়া যায় না।

যদি আর একটী লক্ষণ করিয়া লই, তাহা হইলে এই করিতে পারি যে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের একটী দ্বারাই হউক, দুইটী দ্বারাই হউক, স্থাননির্ব্বিশেষে, কালনির্ব্বিশেষে ও মনের অবস্থানির্ব্বিশেষে যাহাকে একই দেখিতে পাই তাহাই যথার্থ এবং এই লক্ষণ-নির্দ্দিষ্ট গুণের তারতম্যানুসারে বস্তুর বাস্তবিকতার প্রতি প্রত্যয় বা সন্দেহ হয়।

যে পদার্থকে, কি এখানে কি ওখানে, যেখানেই থাকি না কেন, কি আজ কি কাল প্রতিক্ষণেই, কি মনের ভাল অবস্থায় কি মন্দ অবস্থায়, কি ব্যস্ততার অবস্থায় কি স্থিরাবস্থায় একই রূপে দেখিতে পাই তাহাকেই যথার্থ বস্তু বলিতে হইবে, ইহাই যদি বস্তুর লক্ষণ হয় তাহা হইলে এই লক্ষণ এত গুরুতর হইয়া পড়িল যে, পরমেশ্বর ভিন্ন আর কোন বস্তুতে প্রযুজ্য হইতে পারে না; পরমেশ্বরই একমাত্র অপরিণামী বস্তু। যাহাকে এক সময় দেখিতে পাইলাম, আর এক সময় দেখিতে পাইলাম না, তাহাকে পদার্থ বলিয়া সন্দেহ থাকিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত—আয়নার ভিতর প্রতিবিম্ব; আয়নার নিকটে মুখ লইয়া গেলে প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলাম, মুখ সরাইলে আর দেখিতে পাইলাম না। আবার, এক সময় এক রকম দেখিলাম, আর এক সময় আর এক রকম দেখিলাম তাহা হইলেও বিশ্বাস ঠিক হয় না। বস্তুতে পরিবর্ত্তন যত কম হয়, তত তাহাতে প্রত্যয় হয়। ভে-

ক্ষীতে স্থান, কাল ও বস্তুগত অত্যন্ত পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহাতে আমরা অত বিশ্বাস স্থাপন করি না।

আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারাই জড় পদার্থ ঠিক করি বটে, কিন্তু তাহার নিশ্চয়তা স্থাপনের নিমিত্ত স্থান, কাল ও অবস্থানির্ব্বিশেষে যতটুকু হয় একই ভাবে দেখা আবশ্যক করে; তবে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। মরুভূমিতে মরীচিকা দ্বারা যে প্রতারিত হয় তাহাও এই কারণে যে, মরীচিকাকে প্রথমে এক স্থানে দেখা যায়, সেখানে গেলে আর তাহাকে সেই স্থানে দেখা যায় না, তখন আবার তাহা দূরে সরিয়া যায়; সুতরাং দুই তিনবার এই রূপ ঠকিয়া আর তাহার যাথার্থ্যে বিশ্বাস থাকে না অর্থাৎ দূর হইতে যেরূপ দেখা যাইতেছে, নিকটে গেলে তাহা যে সেইরূপেই প্রাপ্ত হইব তাহা নহে; আবার উহাকে প্রাতঃকালে দেখিতে পাইব না, সন্ধ্যার সময়ও দেখিতে পাইব না, কিন্তু মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকিরণ যখন প্রখর হয় তখনি তাহাকে দেখা যায়; আবার যাহারা তৃষ্ণাতুর হয় তাহারাই হয়তো উদ্যান জলাশয়াদি অধিক দেখিতে পায়। সুতরাং মরীচিকা ভ্রমমাত্র দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তাহা কেবলি যে ভ্রম তাহাও নহে; বাস্তবিক বায়ু উত্তপ্ত হইয়া সূর্য্যকিরণকে এরূপ বিখণ্ডিত (refract) করে যে, সেই সূর্য্যের কিরণ চক্ষে পড়িয়া নানা প্রকার ছবির আকার ধারণ করে; কিন্তু যেরূপ ছবি চক্ষে দেখিতে পাই সেরূপ কোন পদার্থ সেখানে থাকে না।

বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারাই জড়পদার্থ চেনা যায়; ইহার সঙ্গে সঙ্গে যতদূর হইতে পারে, স্থানের নির্ব্বিশেষতা, কালের নির্ব্বিশেষতা ও কখনো কখনো মনের নির্ব্বিশেষতা হইলে তাহার সত্তায় বিশ্বাস দৃঢ় হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই লক্ষণ, সম্যক্‌ভাবে জড় পদার্থে খাটে না। এই লক্ষণ পরমেশ্বরেতেই পর্য্যবসিত হয়; তিনিই দেশকালপাত্রে অপরিবর্ত্তিতস্বভাবরূপে স্থির হইয়া আছেন, আর সকলই লক্ষণের অংশমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। যে যত এই লক্ষণের ভাগ অধিক পায় তাহাকে আমাদের তত অধিক সত্য বলিয়া বোধ হয়। যেমন, মরীচিকা বা ভেল্কী অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী পুষ্পকে অধিক সত্য বলিয়া বোধ হইবে; পুষ্প অপেক্ষা প্রাচীরকে, প্রাচীর অপেক্ষা পর্ব্বতকে, পর্ব্বত অপেক্ষা পৃথিবীকে, পৃথিবী অপেক্ষা সৌর জগৎকে, সৌর জগৎ অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্ডকে এবং ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা পরমেশ্বরকে অধিক সত্য বলিয়া বোধ হইবে।

কিন্তু আমাদের এই লক্ষণ দ্বারা জড়পদার্থ আমাদের নিকট অধিক সত্য বা কম সত্য বলিয়া যেরূপই বোধ হউক না, যাহা সত্য তাহা সত্যই থাকিবে। উল্কাপাত দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হয় বলিয়া উহা কি সত্য নহে? উহাও সত্য—কত উল্কাখণ্ড পৃথিবীতে পতিত হইয়া লোকের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে। ক্ষণপ্রভা ক্ষণমাত্র নেত্রগোচর হয় বলিয়া কি উহা সত্য পদার্থ নহে? এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইলেও তাহা সত্য পদার্থ হয়; কেবল ঐরূপ ক্ষণিক ঘটনার সময় জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে যে, উহা কাল্পনিক বা বাস্তবিক। যেমন আমাদের চক্ষুর যদি কোন দোষ না থাকে এবং আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তবে উল্কাপাত হইলে তাহা কেন না আমরা উল্কাপাত বলিয়া বিশ্বাস করিব—বিশেষত, ঐরূপ উল্কাপাত যখন আরো অনেকবার,

হইতে দেখিয়াছি। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়,আর যদি তাহাতে ক্ষণপ্রভা দীপ্তি পায় তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি; কারণ,একত্র, যখনি মেঘ হয় তখনি বিদ্যুৎ দেখিতে পাই; দ্বিতীয়ত,বিদ্যুৎ যেরূপে উৎপন্ন হয় তাহার অনেকটা আমরা জানি এবং বিদ্যুৎ প্রস্তুত করিতে পারি। যে দ্রব্য কখন দেখি নাই, কখন শুনি নাই, এমন কোন দ্রব্য হঠাৎ প্রত্যক্ষ হইলে সংশয় হইতে পারে কিন্তু জ্ঞান দ্বারা সম্যক আয়ত্ত করিতে পারিলে সেই সংশয় দূর হয়।

কেহ কেহ বলেন যে বাস্তবিক পদার্থ আমরা দেখিতে পাই না, কেবল গুণ দেখিতে পাই; যেমন, এই তক্তার কালো গুণটুকু চক্ষে দেখিতে পাই; ইহার বন্ধুরতা হাতের দ্বারা স্পর্শ করিয়া জানিতে পাই; ইহা হইতে নির্গত শব্দগুণ কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাই। যাঁহারা বলেন যে ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল বস্তুর গুণ নিরূপণ হয় কিন্তু বস্তু নহে। কিন্তু গুণ যে আধারে থাকে, সেই আধার বস্তু তো? গুণ আধারে দেখিতে পাই অথবা গুণের সহিত বস্তুকে একত্র দেখি, ইহা একই কথা। যেমন কালো গুণ দেখিতেছি, তেমনি ঐ কালো গুণেতে আধার বা বস্তু জড়িত দেখিতেছি।

বস্তুত যদি জড়-জ্ঞানকে বিভাগ করিয়া দেখিতে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ইন্দ্রিয় তাহার আংশিক ভাগ প্রকাশ করে এবং আমাদের মনও আংশিক ভাগ তাহাতে অর্পণ করে। এই উভয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারাই যেন আমরা জড়পদার্থ অবগত হই। আমাদের মনের প্রতিঘাতে মন হইতে ভিন্ন বাহ্য পদার্থের জ্ঞান হয়। ছেলেবেলায় শিশু যাহা কিছু দেখে, সব যেন মনেতেই দেখে; ঘর দ্বার যাহা কিছু দেখে, বাহিরে যে এই সকল দেখিতেছে তাহা তাহার বোধ হয় না; তাহার মনই যেন তাহার নিকট ঐ সকল হইয়াছে। তাহাকে আঘাত করিলে আঘাত করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু তাহার মনেতে ক্লেশ উপস্থিত হইল, সেইটুকুই সে জানে। বড় হইলে ক্রমে বুঝিতে পারে, মনতো ঐ সকল ঘটনার কারণ নহে, অতএব মনের বাহির হইতে ঐ সকল কারণ আসিতেছে; এইরূপে আপনার সঙ্গে প্রতিঘাত দ্বারা শিশু ক্রমে বাহ্য পদার্থ জানে।

কিন্তু বাহ্যপদার্থের যেটুকু ইন্দ্রিয়গম্য সেটুকু গুণ, আমাদের মন তাহাতে আধার প্রদান করে। যেমন, তক্তার কালটুকু চক্ষে দেখিতেছি কিন্তু কাল এই বস্তু, ইহা মন বলিতেছে—তক্তার রংটুকু চক্ষে পড়িতেছে। তক্তাখানি যে কঠিন, তাহা হাত বুঝিতে পারিতেছে কিন্তু ইহা যে এতখানি স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এই স্থানটুকু মন দিতেছে;—স্থানকে তো হাত স্পর্শ করিতে পারে না, চক্ষু দেখিতে পায় না; আকাশ শূন্য পদার্থ, মন কিন্তু গুণেতে আধার দিয়া ও আকাশ দিয়া আকৃতি ও বিস্তৃতিযুক্ত বস্তুরূপে গ্রহণ করে।

বাস্তবিক মন যে গুণেতে আধার ও আকাশ অর্পণ করে তাহা নহে; যখনি আমরা জড়পদার্থকে জানি তখনি তাহাকে আকাশব্যাপ্য ও আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু বলিয়াই জানি। তবে, আমাদের এমন ক্ষমতা আছে যে, বস্তু হইতে গুণকে প্রত্যাহার করিয়া কল্পনাতে আলোচনা করিতে পারি, বাস্তবিক ভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারি

না। সে যাহা হউক, মতামত বিভিন্ন থাকিলেও বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা আংশিক স্থাননির্ব্বিশেষে, কালনির্ব্বিশেষে ও মনের অবস্থানির্ব্বিশেষে যে পদার্থ গ্রহণ করি তাহাই জড় পদার্থ। সেই জড় পদার্থ লইয়াই রসায়নের ব্যাপার। অজড় পদার্থ লইয়া রসায়ন-ব্যাপার হয় না। অজড় পদার্থ আত্মা। আত্মা হইতে না কোন রাসায়নিক ব্যাপার সমুদ্ভূত হয়, না জড়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারাই আত্মার উদ্ভব হইতে পারে।

জড় পদার্থ মাত্রেরই সাধারণ গুণ ও বিশেষ গুণ আছে। বিশেষ গুণের ইয়ত্তা নাই; বিশেষ গুণের আলোচনা করিতে গেলে সীমা পাওয়া যায় না। ঈশ্বরে যেমন একতা ও বিচিত্রতা তেমনি তাঁহার সৃষ্ট এক একটি বস্তুতেও অসীম বিচিত্রতা প্রকাশ পায়—ইহার এই গুণের সঙ্গে সঙ্গে উহার ঐ গুণ প্রভেদ ইত্যাদি। বিশেষ গুণ যতদূর পারি পরে আলোচনা করা যাইবে, এখন সাধারণ গুণগুলি মনে করা আবশ্যক। জগতে অশেষবিধ পদার্থ আছে বলিয়া জগতের অশেষবিধ উপাদান বলিলে যেমন অন্যায় হয়, তেমনি জড়-পদার্থের নানা প্রকার গুণ রহিয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে কতকগুলি গুণ এক সাধারণ গুণের হয়তো অন্তর্গত; আমরা এইরূপ বিশেষ বিশেষ গুণকে অন্তর্গত করিয়া সাধারণ গুণের বিষয় বলিতে চাহি, তাহা হইলে অধিক স্মরণ থাকিবে।

প্রথম, জড়পদার্থের সাধারণ গুণ এই যে, যে কিছু পদার্থ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করি, তাহার কিছুই রূঢ়ি বা অযৌগিক একটী পদার্থ নহে কিন্তু পরমাণুর সমষ্টি। যেমন, এই কাগজকে প্রত্যক্ষ কর; ইহা একটী পদার্থ নহে, ইহাকে যে বিচ্ছিন্ন করা যায় না তাহা নহে। এই কাগজে কত আঁশ আছে, এক একটী আঁশ আবার কত অংশের সমষ্টি। ইহাকে লক্ষ লক্ষ ভাগ করিয়া যাওয়া যায়; চরমে এক-রকম পরমাণু আছে যাহার আর ভাগ হইতে পারে না, সেই সূক্ষ্মতম পরমাণুর সমষ্টি এই কাগজ। সেই রূপ পরমাণুর সমষ্টিই সমস্ত বস্তু।

বস্তু বিভক্ত হইয়া ভাগের শেষ যাহা, যাহার আর ভাগশেষ হইতে পারে না, তাহাই পরমাণু। এ বিষয়েও মতান্তর আছে। এই পদার্থকে দশভাগ করিলাম, তাহাকে আবার বিশভাগ করিলাম, তাহাকে আবার চল্লিশভাগ করিলাম, এইরূপে অসীম ভাগ হইতে পারে, তখন তাহার আর অবশিষ্ট থাকে না। যেমন, ৮ কে যদি ২ দিয়া ভাগ করা যায় তাহার ভাগফল হইবে ৪, কিন্তু অনন্ত যদি ভাজক হয় ভাগফল শূন্য হইবে; যথা, ৮÷২=৪, ৮÷৪=২; ৮÷৮=১, ৮÷অনন্ত=০। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যাইতেছে, ভাজকটা যত ছোট হয় ভাগফল তত বড় হয়, ভাজক যত বড় হয় ভাগফল তত ছোট হয়। একখণ্ড বস্তু (যেমন এই খড়ি খানি) হইল যেন ১০; এই ১০ কে যদি ২০ ভাগ করা যায়, ভাগফল হইবে আধ (½) অর্থাৎ দুই ভাগের এক ভাগ। ইহাকে যদি ১০০ ভাগ করা যায়, ভাগফল হইবে ১/১০ অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ। এইরূপে ভাজককে বড় করিলে ভাগফল ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ হইতে হইতে ক্রমে অনন্ত ভাজক হইলে ভাগফল অনন্তগুণে ছোট হইবে অর্থাৎ শূন্য হইবে, যেমন, ১০÷অনন্ত=০। ইহাই কি সত্য? যদি কিছু না থাকে, তবে কিছু না হইতে কিছু হয় কি প্রকারে?

সুতরাং অনন্তগুণে ভাগ বৃথা—ভাগ করিতে করিতে এমন ভাগে পৌঁছান যায়, যে রাশির আর ভাগ হইতে পারে না; সেই সূক্ষ্মাংশের নাম পরমাণু। পরমাণু যদি না থাকে, তবে পরমাণু জড়িত হইয়া বস্তু হইবে কি প্রকারে? অতএব স্থির হইল যে বস্তু পরমাণুসমষ্টি।

ভৌতিক পদার্থ পরমাণুর সমষ্টি, ইহাই হইল প্রথম তত্ত্ব। সেই পরমাণুর আকার আছে,ভার আছে, ক্রিয়া আছে। পরমাণুর গুণেতেই বস্তুর গুণ প্রকাশ পায়। নির্গুণ যদি পরমাণু হইত, বস্তুও নির্গুণ হইত; পরমাণু কারণ, ইহা কার্য্য; কারণের গুণ না থাকিলে কার্য্যের গুণ থাকিতে পারে না।

ভৌতিক পদার্থের আর একটী সাধারণ গুণ বিস্তৃতি। বিস্তৃতির অর্থ স্থান ব্যাপিয়া থাকা। স্থান কাহারে বলে? এই বায়ু যে আছে, ইহা স্থান নহে; এই যে দেওয়াল আছে, ইহাও স্থান নহে; ইহারা স্থানেতে আছে মাত্র। এই গৃহ হইতে সমস্ত যদি বাহির করিয়া লওয়া যায় তখনই স্থান রহিল—শূন্য, যাহা পড়িয়া থাকে, তাহাই স্থান। সেই স্থান ব্যাপিয়া থাকা, ইহা একটী ভৌতিক গুণ। যেমন খড়ি এখানে রহিয়াছে, ইহা যত বড় ততটুকু আপনার মতন স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহা যেটুকু স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সেই স্থানে আর কিছু নাই। যে বস্তু সেই স্থান যতটুকু ব্যাপিয়া থাকে, তাহাই তাহার আকার।

এই বোর্ডের এই সমস্তটাই যেন স্থান; তাহার মধ্যে আমি কখগঘ আঁকিলাম। কখগঘ, বোর্ডের এইটুকু স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানটুকুর যাহা প্রান্তভাগ, সেই প্রান্তভাগের সমষ্টি লইলেই উহার আকার পাওয়া গেল। কখগঘ হইল চতুষ্কোণ, কোনটা ত্রিকোণ হয়, কোনটা গোল হয়। স্থানব্যাপিত্ব হইতেই আকার হয়।

আবার যেমন এই বইটী বইয়ের মতন স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তেমনি ইহার সূক্ষ্মতম পরমাণুও কি স্থান ব্যাপিয়া নাই—অবশ্য আছে। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর অংশে বই হইল, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান দ্বারা এত বড় স্থান হইল। ব্যাপিত্ব হইতে আকার হয়। স্থূল পদার্থ যেমন স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, জলও তেমনি স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, বায়ুও তেমনি স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে; অণুও স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহাতেই বিভিন্ন আকার হইতেছে।

আকার দুই রকমে হয়; এক, স্থানের যেমন যেমন সীমা, বস্তুর তেমনি তেমনি আকার হয়; দ্বিতীয়তঃ, পরমাণুর আকার যেরূপ বস্তুর সেইরূপ আকার হয়। পরমাণুর আকার কি দেখা যায়? তাহার আকার চক্ষে দেখা যায় না বটে, কিন্তু প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। রাজমিস্ত্রী যখন গোলাকার থাম গাঁথে, গোলাকার ইট দিয়া গাঁথে বলিয়া থাম গোলাকার হয়; বইটা চতুষ্কোণ, ইহাতে স্থূলতা আছে—ইহার পাতাগুলিও চতুষ্কোণ এবং তাহাতে অল্পপরিমাণে স্থূলতা আছে; পাতের চতুষ্কোণতা ও স্থূলতা থাকাতেই পাতের সমষ্টি যে এই বই, ইহাও চতুষ্কোণ ও স্থূল হইয়াছে। যদি এই বইয়েতে আরও পাত দেওয়া যায়, বই আরও স্থূল হইবে। সেইরূপ পরমাণু পুঞ্জ যেমন যেমন স্থান লইয়া থাকে বস্তুও তেমনি আকার ধারণ করে। যদি

দেখা যাইতেছে যে এই খড়ির আকার একরকম, এই টেবিলের আকার একরকম, ইহা আর কিছুই নহে; কেবল পরমাণু যেরূপে স্থানে সাজান রহিয়াছে, সেই অনুসারে ইহাদের আকার বিভিন্ন হইয়াছে।

আবার এই টেবিলটাকে বেশ্ মসৃণ ও সমতল দেখিতেছি। বাস্তবিক ইহা মসৃণও নহে, সমতলও নহে কিন্তু কেবলই উচ্চনীচ; প্রবল অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে গোল গোল 'ল'এর মত (⌒⌒⌒) উচ্চ নীচ দেখা যাইবে। এই বইটা রহিয়াছে, ইহার ধার আছে বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার ধার নাই, ধারটাও ঐরূপ গোলগোল। আবার দেখা যায়, জগতের প্রায় সকল বস্তুই গোলাকার—গ্রহতারা চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী হইতে ক্ষুদ্র জলবিন্দু পর্য্যন্ত সকলই গোল; গাছ গোলপ্রায়; দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে মাথা, নাড়ী প্রভৃতি সকলই গোল। জলকে সমতল বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাহার উপরিভাগও তরঙ্গের ন্যায় গোল; সেই জলের আবার এক বিন্দু যদি উঠাইয়া ধরা যায় তাহাও গোল। পারা ধাতু, তাহাকে যদি টেবিলের উপর ফেলিয়া দাও তাহা গোল গোল হইয়া গড়াইয়া যাইবে।

যদি কোন বস্তু চতুষ্কোণ হয়, তাহার ঠিক ছুঁচল কোণ থাকিবে, তাহার ধার থাকিবে; সেই ধারকে এইরূপে (>) আঁকা যাইতে পারে। কিন্তু এই রকম কোণ কি ধার জগতের মধ্যে দেখা যায় না। যেখানে (>) এমনি কোণ আছে সেই কোণের মধ্যে (⌒)এমনি গোলত্ব আছে। অতএব ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে পরমাণুর প্রাকৃতিক আকার গোল। পরমাণুর পরিবর্ত্ত হইতে পারে না, তাহার ভার্গও হইতে পারে না, তাহাকে চাঁচাও যায় না; ঈশ্বর যে আকার প্রদান করিয়াছেন তাহাই আছে—সেই আকার গোল।

কেহ কেহ বলেন, ভিন্ন প্রকার পরমাণুর ভিন্ন আকার। যেমন মিশ্‌রিতে যে দানা (crystal) বাঁধিয়া যায় বা জলে লবণ ফেলিয়া দিলে জল উবিয়া গেলে তাহাতে যে দানা বাঁধে, পরমাণুর যে পার্শ্ব আছে সেই সকল পার্শ্ব মিলিয়াই দানা বাঁধে; পরমাণুর সংহতি দ্বারা যখন দানা বাঁধে তখন পরমাণুরই আকার দানার আকারের ন্যায় অর্থাৎ পরমাণুর ধার আছে এবং কোণ আছে। কিন্তু অণুবীক্ষণ দ্বারা দানার প্রতি পার্শ্ব দেখিলে সেখানে 'ল' এর মত উচুনীচু আছে দেখা যায়; কেবল চক্ষু দ্বারা যেখানে ছুঁচল বোধ হয়, তাহার ভিতরেও 'ল' এর ন্যায় গোলভাব আছে। আবার দেখা যায় যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের দানা বাঁধে। সুতরাং পরমাণুর আকার দানার আকারের মত নহে, কেননা পরমাণুর আকার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না; তবে যে দানা বাঁধে, তাহা কেবল গোল পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে সন্নিবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব পরমাণুমাত্রের ঈশ্বরপ্রদত্ত আকার গোল; গোলত্ব হইতে বিভিন্ন আকার হইতেছে, তাহার মধ্যেও গোলত্ব রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উদয় হইতে পারে, পরমাণু যদি গোল হয় তবে বস্তু সকল কিরূপে চতুষ্কোণ হয়, ত্রিকোণ হয়? কেল্লাতে যেরূপে গোলা সাজায় তাহা হইতে দেখা যায়, এক গোল হইতে সকল প্রকার আকার হইতে পারে;

গোলা দ্বারা চতুষ্কোণও হয়, যেমন— আবার এই চতুষ্কোণের প্রত্যেক অণুই গোল এই জন্য ঐ সকল গোল অণু যদি একত্র থাকে, তাহা হইলেই বস্তুর উপরিভাগ সকল 'ল' আকার, (⌒⌒⌒) এই প্রকার, দেখিতে পাইবে। যদি পরমাণু চতুষ্কোণ হইত তাহা হইলে উচ্চনীচ থাকিবার প্রয়োজন হইত না, যেমন আবার গোল অণু দ্বারা ত্রিকোণ হইতে পারে, যেমন এই সকল যুক্তি দ্বারা স্থির হইল পরমাণুর আকার আছে। তাহা সম্ভবত গোল; তদ্দ্বারা বিভিন্ন রকম আকার প্রস্তুত হয়; বস্তুগত আকার সকলের বিভিন্নতার মধ্যে সাধারণত্ব দেখা যাইতেছে গোল।

প্রথম অণুসমষ্টির কথা হইল; অণুসমষ্টির পর বিস্তৃতি, বিস্তৃতির পর আকৃতি এবং আকৃতির পর পরমাণুর আকৃতি গোল এই পর্য্যন্ত বলা গেল। ভৌতিক পদার্থের আর একটী সাধারণ গুণ আকর্ষণ। যেমন বিস্তৃতি আকৃতি সকল বস্তুতে আছে তেমনি সকলেরই আকর্ষণ আছে। আকর্ষণ কাহাকে বলে? এক বস্তু অন্য বস্তুকে আপনার দিকে যে শক্তির দ্বারা টানিয়া লইয়া আসে তাহার নাম আকর্ষণ। সেই আকর্ষণকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যেমন, যোগাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ, রাসায়নিক আকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ, তড়িদাকর্ষণ। বস্তুত এই সকল বিভিন্ন আকর্ষণ নহে। সমস্ত বস্তুর একই মাত্র আকর্ষণ আছে এই টুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইল; কিন্তু যখন বিভিন্ন নাম আছে, তখন আকর্ষণের পৃথক্ নামযুক্ত প্রত্যেক বিভাগের বিবরণ বলিয়া যদি তাহার পরে দেখান যায় যে আকর্ষণ মাত্রেই এক, তাহা হইলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

আমরা আকর্ষণের সামান্য চিহ্ন অনেক দেখিতে পাই। যেমন, একটী কাঠিতে এক বিন্দু জল এবং অপর এক কাঠিতে আর এক বিন্দু জল ধরিয়া যদি পরস্পরের খুব নিকটে লইয়া আসা যায়, ক্রমে ক্রমে নিকট হইতে দুই বিন্দু জল মিশিয়া এক হইয়া যায়। বিস্তৃত মুখবিশিষ্ট পাত্রে কিম্বা পুষ্করিণীতে কিম্বা সমুদ্রে বিবিধ জিনিস ভাসাইয়া দিলে, জল নিস্তব্ধ থাকিলেও সকল গুলি আসিয়া একস্থানে জড়ো হইবে। আরও দেখ, গোলা রহিয়াছে, ছাড়িয়া দিলে; অবিলম্বে মাটিতে পড়িয়া গেল। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইহা উহাকে টানিতেছে, উহা ইহাকে টানিতেছে; গোলাতে যত পরমাণু আছে, গোলা তত বলে পৃথিবীকে টানিতেছে, পৃথিবীতে যত পরমাণু আছে সে তত বলে ইহাকে টানিতেছে অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি পরমাণু ইহার প্রতি পরমাণুকে টানিতেছে, ইহারও প্রতি পরমাণু পৃথিবীর প্রতি পরমাণুকে টানিতেছে।

এই পরমাণুর ন্যূনাধিক্য হেতু আকর্ষণের গতির ন্যূনাধিক্য হয়। যদি এই বস্তুর পরমাণু এক হয়, পৃথিবীর পরমাণু একশত হয় তাহা হইলে পৃথিবী ইহাকে শতগুণ বলে টানিবে; ইহা পৃথিবীর দিকে কেবল শত পদ অগ্রসর হইবে, পৃথিবী ইহার দিকে কেবল $\frac{1}{100}$ উন্মুখ হইবে। যদি একটা সূর্য্য পৃথিবীর কাছে আসে, তাহা হইলে সূর্য্য পৃথিবীতে না আসিতে আসিতেই পৃথিবী সূর্য্যেতে গিয়া লাগিয়া যাইবে। আমরা পৃথিবীতে হাঁটিবার সময় এক পা পৃথিবীতে ফেলিয়া আর এক পা উঠাইয়া লইয়া অগ্রসর হইতেছি; আমরা

পৃথিবীর সঙ্গে লগ্ন রহিয়াছি; আমরাও আকর্ষণ করিতেছি পৃথিবীকে, পৃথিবীও আকর্ষণ করিতেছে আমাদিগকে—পরস্পর লাগালাগি রহিয়াছি।

এমন দৃষ্টান্ত আনা যাইতে পারে, যাহাতে আকর্ষণের প্রতি সন্দেহ হইতে পারে। তাহাও উল্লেখ করিতেছি, যেমন, গাছের পাতা ঊর্দ্ধদিকে যায়, ধূম ঊর্দ্ধদিকে যায়। উহাদের যে আকর্ষণ নাই তাহা নহে; পাতা যে ঊর্দ্ধদিকে যাইতেছে, তাহার কারণ, পাতার সঙ্গে পৃথিবীর যে আকর্ষণ তাহা অপেক্ষা বায়ুর বেগ বেশী, এই জন্য তাহাকে বায়ুতে উড়াইয়া লইয়া গেল।

ধূম যে উপরে উঠে, তাহার কারণ বুঝিয়া উঠা কিছু কঠিন হইবে। ধূম বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা, বায়ু ধূম অপেক্ষা ভারী; সুতরাং বায়ুর মধ্যে ধূম থাকিলে, ধূম যত জোরে পৃথিবীতে আসিতে চাহে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর জোরে বায়ু পৃথিবীর দিকে আসিতে চাহে। ধূম হাল্‌কা, ধূম বায়ুকে ভেদ করিতে পারে না, বায়ু ধূমকে ভেদ করিয়া তাহার স্থানে আসিয়া দাঁড়ায়; বায়ু চেষ্টা করে, যেখানে ধূম রহিয়াছে সেইখানে সে যাইবে। সমস্ত বায়ু যদি ধূমের স্থানে যাইতে চাহে, কাজে কাজেই বায়ু তাহাকে উপরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, যে পর্য্যন্ত না উপরে যাইতে যাইতে ধূমের ভার আর বায়ুর ভার একরূপ হয়। এই জন্য মেঘকে আমাদের উপরে কতকটা উচ্চে দেখিতে পাই, আবার পর্ব্বতবাসীরা তাহাদের পদতলে মেঘ দর্শন করে।

আর এক প্রকার আকর্ষণের চিহ্ন দেখিতে পাই, যখন দুই আয়তন উদজান মরুৎ এক আয়তন অম্লজানের সঙ্গে মিলিয়া দুই আয়তন মাত্র জলীয় বাষ্প হইল। কোথায় উদজানের এক রকম গুণ, অম্লজানের আর এক রকম গুণ; এই দুই মিলিত হইয়া কোথায় আর এক জিনিস, জল হইয়া গেল, যাহাতে তাহার উপাদানের কোন গুণই নাই।

আকর্ষণের আর এক রকম চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই, যখন চুম্বক ইস্পাতকে টানিয়া লয়। আর এক রকম আকর্ষণের চিহ্ন দেখি, যখন কাচকে রেশম বা লোমশ কাপড় দিয়া ঘষিলে চুল কি পালক প্রভৃতি আকর্ষণ করে এবং বিকর্ষণ করে।

ইহার মধ্যে যোগাকর্ষণ হইতেছে, একটা বস্তুর মধ্যে অণুতে অণুতে যে আকর্ষণ। এক দ্রব্যের ভিতর যে সকল অণু ঘেঁসাঘেঁসি আছে তাহাদের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণের নাম যোগাকর্ষণ; সন্নিকটস্থিত পরমাণুর পরস্পরাকর্ষণকে যোগাকর্ষণ বলে। এই যোগাকর্ষণ-ভেদে বস্তুর নানাপ্রকার অবস্থা হইতেছে; কোনটা কঠিন হইতেছে, কোনটা নরম হইতেছে, কোনটা আটার মত হইতেছে; কোনটা তেলের মত হইতেছে, কোনটা জলের মত হইতেছে কোনটা বাষ্পের মত হইতেছে, কোনটা একেবারে বায়ুর মত হইতেছে।

ইহাদের মধ্যে তিন অবস্থাই আসিল; অন্য অন্য অবস্থাগুলি তাহাদের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। সেই প্রধান তিন অবস্থা, কঠিন, তরল ও মরুৎ অবস্থা। একই বস্তুর হয়তো এই তিন অবস্থা ক্রমান্বয়ে ঘটিতে পারে। কাহারো হয়তো দুই প্রকার অবস্থা ঘটিতে পারে; কোনটা বা একই অবস্থায় থাকে। যেমন, জল তরল অবস্থায় আছে, আর এক সময়ে জমিয়া বরফ হইয়া কঠিন হইয়া গেল; আর এক সময় বায়ুর অবস্থা পাইয়া

নীচে থাকিতে পারিল না, উপরে উঠিয়া মেঘ হইয়া দেখা দিল। আবার, আমাদের এই বায়ু, ইহাকে কোনরূপেই তরল করা যায় না বা কঠিন করা যায় না। আবার, কতকগুলি মরুৎকে শীতল করিয়া ও চাপ দিয়া তরলও করা যায় এবং কঠিনও করা যায়। যেমন, আঙ্গারিক অম্ল (কারবনিক অ্যাসিড) নামক যে মরুৎ, উহাতে শৈত্য ও চাপ প্রয়োগ করিলে উহা ক্রমে ক্রমে তরল ও বরফের ন্যায় কঠিন হয়। ধাতু সামগ্রী স্বর্ণ বা লৌহ-খুব কঠিন, তাপ দিলে তাহারা গলিয়া গেল, আবার খুব তাপ দিলে বায়ুবৎ হইয়া চলিয়া গেল। তবে দেখ, যোগাকর্ষণ কম হয় তাপ দ্বারা, আর যোগাকর্ষণের শক্তি বৃদ্ধি পায় শীতলতা বা তাপহীনতা দ্বারা।

তেও মত।

জগতে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত আছে, পূর্ব্বে তাহার বিষয় অনেকেরই অজ্ঞাত ছিল। আমেরিকার ধর্ম্মমহামণ্ডলীর দ্বারা আর কিছু বিশেষ উপকার হউক আর নাই হউক আমাদের পক্ষে এই একটি বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়াছে যে, আমরা অনেক মত ও উপমতের বিষয় কিছু ভাল করিয়া জানিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বে শিণ্টো মত' সম্বন্ধে এই পত্রিকায় কিছু বলা হইয়াছে। এক্ষণে তেও মতের কথা কিছু বলিব। কি কংফুচের মত, কি শিণ্টো মত, কি তেও মত তিনেই রাজার দেবত্ব ও উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন চীনসাম্রাজ্যে কংফুচের মত ও তেও-মত প্রাচীনতম ধর্ম্মমত। চীনদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দ্বারা তেও মতও প্রবর্ত্তিত হয়। মূলে এই সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যে কে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। বোধ হয় ইহা দ্বারা ঈশ্বরকে বুঝাইতেছে। এই সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক তেও মত প্রবর্ত্তিত করিয়া লেও-জের হস্তে ন্যস্ত করেন। ন্যূনাধিক খৃষ্ট জন্মের ৬০৪ পূর্ব্বে চৌ-বংশে লেও-জ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাত্মা কংফুচের সমকালিক লোক। তাঁহার রচিত "তেওতে-কিং"এ প্রকৃতি-উৎপত্তি ও তত্ত্ব এবং প্রাকৃতিক জগতের রহস্য প্রভৃতি দুরূহ বিষয়গুলি ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইয়াছে। কালক্রমে তেও মত চারি উপমতে বিভক্ত হয়। কিছুকাল পরে সবগুলি পুনরায় এক হয়। যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের এক্ষণে দুই প্রধান শাখা—একটি তিব্বত প্রভৃতি ভারতবর্ষের উত্তরদিকস্থ দেশ সমূহে প্রচলিত অপরটি সিংহল প্রভৃতিতে প্রচলিত, তেও-মত ও তদ্রূপ। ধর্ম্মগ্রন্থাবলী উচ্চ, মধ্যম ও প্রথম শ্রেণীতে বিভক্ত। উচ্চশ্রেণীতে সত্য অনুসরণ ও সত্যালোচনা, মধ্যম শ্রেণীতে সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রথম শ্রেণীতে আত্মতত্ত্বের উপদেশ আছে। শান্তি ও শুদ্ধতা এই দুইটি উক্ত তিন শ্রেণীর যথাক্রমে মুখ্য উদ্দেশ্য। সকল কামনা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে তত্ত্বানুসন্ধান করাই তেও মতের লক্ষ্য। কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া উল্লিখিত মতাবলম্বিগণ আজকাল ভূত প্রেত প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তায় ব্যস্ত। দেবতা ও উপদেবতার সম্বন্ধে কাল্পনিক গল্প এক্ষণে তেও-গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। "তেও-তে-কিং" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা ছিল, তদ্দারা পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই সৃষ্টির অবিনশ্বর বীজ। এই অনন্ত বীজের উপকারিতা "উ-চিন-পিন" নামে আর

একখানি গ্রন্থে প্রকটিত আছে। ক্রমে ক্রমে চরিত্রের উন্নতি ও যোগসাধন, বশীকরণ, উপাসনা, সঙ্গীতচর্চ্চা, মন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ যে পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল সেই পরিমাণে তেও মত বিকৃত হইল। যাঁহারা ধর্ম্মানুশীলন করেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করেন, আত্মা সংরক্ষণ করেন, আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হন, এবং আপনার চিত্তের উপর প্রহরী নিয়োজিত করেন। এই মতাবলম্বী বলে যে, পুষ্টিসাধন ব্যতিরেকে আত্মা দিন দিন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে থাকে। সঞ্চালনা ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক তেজের হ্রাসতা ঘটে। অন্তঃকরণ যদ্যপি পরীক্ষিত না হয়, তাহা হইলে ইহা দিন দিন কলুষিত হয়। বিশুদ্ধতা ইহার মূল মন্ত্র, ধৈর্য্য ইহার জপমালা। কোমলে কঠোরের জয় ইহার অনুশাসন। নীরবে নির্জ্জনে দীর্ঘকাল ধর্ম্মানুষ্ঠান কর; অদৃষ্ট হইতে কিছু দৃষ্ট হউক; দৃষ্ট পুনরায় অদৃষ্টে বিলীন হউক; যতক্ষণ না অন্তরে যথেষ্ট তেজ জন্মে বল সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও; কর্ত্তব্য রক্ষা কর, অনন্ত সত্ত্বার জ্ঞান, পরলোক জ্ঞান অক্ষুণ্ণ ভাবে রাখ; তেও-মতাবলম্বীর এই উপদেশ।

প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের এখন যেরূপ অবস্থা, প্রকৃত তেও-মতের ও সেইরূপ। উভয় সম্প্রদায়ের ভালভাল সুশিক্ষিত মহোদয়গণ কুসংস্কারে পূর্ণ ক্রিয়াদি এবং অঙ্গীভূত অসত্য গুলি বিবর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বতন অবস্থায় আনিতে ও তৎপ্রদর্শিত মার্গাবলম্বন করিতে সচেষ্ট। তেও-মতাবলম্বীর কৃচ্ছ্র-সাধনের ও কঠোর ব্রতের একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করিয়া আমি প্রবন্ধ শেষ করিব। একদা একটি তেও-মন্দির জীর্ণ সংস্কারোপযোগী হয়। কার্য্যটি ব্যয়সাধ্য। এক জন মঠধারীই হউক বা সাংসারিকই হউক ঠিক্ মনে নাই—লোক গণ্ডদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বৃহৎ শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দ্বারে দ্বারে অর্থ সংগ্রহের জন্য বহির্গত হন। কথিত আছে যে, যতদিন তাঁহার অভিলষিত অর্থ সংগৃহীত না হইয়াছিল, ততদিন তিনি আপনাকে শলাকা বিমুক্ত করেন নাই।

দেবোত্তর বিষয়।

আজ কয়েক মাস হইল দেবোত্তর সম্পত্তি সম্বন্ধে নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন হয়। ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিবার জন্য সংবাদপত্রেও এ বিষয়ের ঘোর আন্দোলন চলিয়া গিয়াছে। ফলে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন নাই। গবর্ণমেণ্ট ঈদৃশ কোন আইন প্রকটন করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ মহারাণীর ঘোষণা পত্রের বিরোধী। আমরা এ বিষয়ে যতদূর চিন্তা করিয়াছি তাহাতে মনে হয় গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। আমরা যে তীর্থস্থানাদির দূষণীয়তা মঠধারীর স্বেচ্ছাচারিতা স্বীকার করি না, এমন নহে। কিন্তু আমরা আইনের বলে ব্যাধি বিনাশের পক্ষপাতী নহি। আমাদের মধ্যে জাতীয় গৌরব যদি কিছু থাকে তাহা ধর্ম্ম লইয়া। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মক্ষেত্রের পঙ্কোদ্ধার নিজ নিজ চেষ্টায় সুসম্পন্ন করিতে না পারিয়া দীনহীন অনাথের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইলে আমাদের জাতীয় চরিত্র জাতীয় গৌরবে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে, সংস্কৃতানুরাগা বর্ত্তমান ইউরোপে আমাদের মস্তক আরো অবনত হইবে।

অধিকাংশ তীর্থে বিগ্রহপূজার সহিত মোহন্ত বা মঠধারীর (তিনি যেরূপ চরিত্রের হউন না কেন) পাদপূজার ব্যবস্থা আছে। ইহা দ্বারা মঠধারীর বিপুল অর্থাগম হয়। এরূপ স্থানে মঠধারীর নিয়োগাদি ভার গবর্ণমেণ্ট বা বিশ্বস্ত লোকের হস্তে আসিলে, তাঁহার কল্পিত দেবত্ব—সঙ্গে সঙ্গে তীর্থের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইবে। বিশেষতঃ কোন আইন বিধিবদ্ধ হইলে মোহন্তগণের সম্পত্তি সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে যে প্রাচীন ব্যবস্থা আছে, তাহার আমূল পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হইবে।

প্রসিদ্ধ তীর্থগুলির বিশৃঙ্খলতার মূলে কুঠারাঘাত করাই আবেদনকারিগণের উদ্দেশ্য। ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি ও তদর্পিত সম্পত্তির সুবন্দোবস্তের অভাব আবেদনকারিদিগের লক্ষ্য নহে। কেন না এবম্বিধ সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত সাধন উত্তরাধিকারিগণের পক্ষে সুখসাধ্য, প্রচলিত আইনে তাহার প্রতীকার সুদূরপরাহত নহে।

অনেক স্থলে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার পরে পূজকের হস্তে নিত্যসেবার ভার পতিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাতা বা তৎবংশীয়গণের সহিত বিগ্রহের সকল সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়াছে। কালক্রমে বিগ্রহ জনসাধারণের নিকট বিশেষ জাগ্রত বলিয়া অনুমিত হওয়ায় পূজকের অর্থাগমের পথ প্রমুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপস্থলে বিগ্রহ জীবিকানির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এমন কি পূজার পালা কোম্পানির কাগজের ন্যায় ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ স্থলে আইনের দ্বারা প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা নাই।

আমাদের ধারণা এই প্রচুর ধনসম্পত্তি সংসারত্যাগী মহাপুরুষকেও নরকের পথে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে। জটাধারীর হস্তে জমিদারী দিলে সাধনের অবসর কোথায় থাকিবে। তিনি যে সাধনহীন সুতরাং চরিত্রহীন হইয়া পড়িবেন তাহা ত একপ্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত। বলিতে কি বিদেশীয় প্রথা মত বিশ্বস্ত অধিকারী (trustee) নিয়োগ ভিন্ন কোন সাধারণ দেবালয়ের কার্য্য যথাযথ চলিবার সম্ভাবনা নাই। পাছে অর্থের সংশ্রবে আসিয়া ধর্ম্মাত্মার ধর্ম্মহানি হয় এই জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বর্ণগ্রহণ নিষিদ্ধ, যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহারা পতিত হন। উদ্দেশ্য যে মহৎ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, যে সকল চরিত্রহীন ঘোর নারকী মোহন্ত বা মঠধারী আবেদনকারিগণের আবেদনে সন্ত্রস্ত ও ভীত হইয়া ছিলেন, পশ্চিম গগনে সুনীল মেঘের উদয়ে ঘোর আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন, তাঁহারা যেন গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতা দেখিয়া আপনাদিগকে অব্যাহত বিবেচনা না করেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্ত্রদর্শী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ যে তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়াছেন তাহা কোন মতেই প্রশমিত হইবার নহে। ইহার ফল বিলম্বেই হউক শীঘ্রই হউক অবশ্যই ফলিবে। প্রকৃত পক্ষে তীর্থস্থানের দেবোত্তর সম্পত্তির আমূল সংস্কারের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা আবেদন লইয়া আইন প্রার্থনায় রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা যদি উৎসাহ সহকারে এ বিষয়ের ক্রমিকই আন্দোলন আপনাদের মধ্যে করিতে থাকেন তবে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি যাহা গবর্ণমেণ্টের আইনের বলে

না হইত তাহা ঘোর আন্দোলনের বলে
সংসাধিত হইবে।

নিষ্কাম ও কাম।

নিষ্কাম।—
আমি শান্তধীর হ'য়ে পালি তাঁর ব্রত,
হাহা কর ভবে তুমি হইয়া বিব্রত।
সরল হইয়া করি তাঁহার আরতি,
চঞ্চল বিষয়ে থাক ল'য়ে তব রতি।
শুদ্ধ হ'য়ে থাকি জেগে করিয়া সুকৃতি;
মদোদ্যমে থাক লেগে উদ্দাম প্রকৃতি।
তোমায় আমায় ভেদ আকাশ পাতাল—
আমি তাঁর ভক্ত, তুমি অভক্ত মাতাল;
এইজন্য হ'য়ে আছ সবাকার অরি;
আমি সার প্রিয়, হেতু প্রিয় মোর হরি।
জানাই সকলে আমি সার ভগবান;
পঞ্চভূতে কর খেলা ল'য়ে পঞ্চবাণ;
মাঝে তার পড়িবে যে পাবে সে পঞ্চত্ব,
কিন্তু মোর মধ্যে পায় সবে প্রাণ সত্ব।
আমি চির সুধাময় আধ্যাত্মিক দাস,
আমার পরশে জাগে সংসারে সুবাস;
আত্মার অধীন হ'য়ে করি আমি কাজ,
তাই মোর এইরূপ সুবিমল সাজ;
আত্মার নিকটে আমি করি গো প্রতীক্ষা,
পেতে প্রেমভিক্ষা শিক্ষা জ্ঞান ধর্ম্ম দীক্ষা।
আত্মা তাঁর পিতা মাতা পরমাত্মকাছে,
খুলে ক'ন সব গিয়ে—কি অভাব আছে।
যে আনন্দ পা'ন তাঁর লভি উপদেশ,
লভিয়া কণিকা তাঁর কৃপার অশেষ,
আমারে বলেন তাহা যতনে বিশেষ,
শুনে নব প্রাণ পাই, ধরি ফুল্ল বেশ;
সাধ হয় ব্রহ্মধামে করিতে প্রবেশ;
সেথাকার বার্ত্তা শুধু সুধা-সমাচার
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠি করিতে প্রচার।

কাম।—
তোমার ও সব আমি চাহি না শুনিতে
সুখ যদি দিতে পার চাহি তাই নিতে।

নিষ্কাম।—
অসুখ ও সুখ তব, সুখ যাহা চাও,
ছুটেছো যে দিশাহারা সাগরে উধাও;
এস এস ভাল হবে লও মোর সঙ্গ,
শোনাইব দিবারাত তাঁহার প্রসঙ্গ।

কাম।—
না, না, পারিব না যেতে ছেড়ে মোর খেলা,
এহেন স্বাধীনতায় কে করিবে হেলা!

নিষ্কাম।—
ও তোমার স্বাধীনতা! নিতান্তই ভ্রম,
স্বাধীনতা কোথা যেথা বিলাস-বিভ্রম—
তাহা জাগেনাকো বিনা আধ্যাত্মিক শ্রম,
জাগে ঠিক আনে যবে আধ্যাত্ম সম্ভ্রম—
—স্পর্শে যার হয় সবে সম্ভ্রান্ত উদার
সহজে তরিয়া যায় ভবপারাবার।

কাম।—
রাখ ঢিমে ভাব, আমি হইয়া জলদ
শূন্যে ভ্রমিবারে চাই যেরূপ জলদ।

নিষ্কাম।—
শূন্যে হেন ঘুরে পূর্ণ হবেনাকো আশ,
তোমায় প্রকৃতি তব, করিবে বিনাশ।
শোন বলি কথা মোর চাও যদি শ্রেয়
সত্বর সুপথে এস ত্যাগ করি প্রেয়।
বৃথা ভ্রম ল'য়ে ভ্রম' বড়ই বাতুল,
ভুলে পুণ্যময় ধ্বনি জগতে অতুল।
কতবার বলিতেছি বোঝোনাকো ভুল,
পড়িতে হইবে পরে পাথারে অকূল;
ভুলে গেছ যেতে হবে অনন্তের পানে,
মলিন লালসা ল'য়ে মেতে মদ্যপানে,
বাজাইছ মোহময় পিরীতিবিষাণ,
নীরস নির্দ্দয় ঘোর হ'য়েছো পাষাণ;
এটা জেন ক্রমে হবে সব অবসান,
সব দিতে হবে শেষে জলেতে ভাসান—

জলাঞ্জলি হবে দিতে সজল নয়ানে
তাই বলি ভ্রম চড়ি শুদ্ধধর্ম্মযানে,
তুচ্ছি বৃথা আড়ম্বর বহির্যজ্ঞযাগ—
অন্তরের মহাযজ্ঞে থাকরে সজাগ্।
মিছে কালক্ষয় কর ল'য়ে বৃথা রঙ্গ,
ভয় হয়নাকো দেখে কালের তরঙ্গ ?
মহা প্রকৃতির পানে চাহ একবার—
গভীর রচনা রুচি, জাগে চারি ধারে—
কালাতীত পুরুষের প'ড়ে দেশকাল—
কতলীলা জাগে তায় কত ছন্দ তাল,
মহাছন্দে নৃত্য করি চলে চরাচর,
সীমা নাই দেখিবার শোভা বরাবর ;
আলোকে পুলকে হের অন্ধকার দিশি ;
ছায়া আলো করে কেলি বিশ্বে দিবানিশি;
দেখ জ্যোৎস্না শুভ্র নভ কৃষ্ণনীলাভাস,
কি শান্ত পবিত্র ছবি নির্ম্মল নিবাস ;
সাধ হয় হোথা মোর করিতে প্রবাস,
ছাড়ি ভব, বিষময় হাস্য পরিহাস।
মহাকাশ হ'তে ওই ঝ'রে পড়ে তারা
পলক আলোক স্রোতে মুগ্ধ আঁখি-তারা ;
অন্তহীন মহিমার সঙ্গীতের ধারা,
বেজে ওঠে মর্ম্মমাঝে মন্দ্রমধ্যতারা।
ধ্বনিত করিয়া তোলে সেই ভূমানাম,
মগ্ন হই ভাবি সেই মহানন্দ ধাম ;
বুঝি শ্রদ্ধা প্রেম ভক্তি স্নেহ প্রীতি দয়া,
এরা সার তীর্থস্থান, কাশী গঙ্গা গয়া।
বুঝি জগতের মাঝে প্রেম স্নেহ ভক্তি
এরা ধাতু, যুজি তায় সুকৃত বিভক্তি
পূর্ণ হয় ক্রিয়া মোর, বিশ্বে রহি তাঁয়,
প্রভান্বিত হ'য়ে উঠি স্বর্গীয় প্রভায় ;
সহজে বুঝিতে পারি কোন্‌টী নিয়ম ;
অক্লেশে আয়ত্ত হয় ক্ষমা দমশম।
সুধাময় ঠেকে আহা গ্রহ তারা সোম,
তরুলতা ফুল ফল চরাচর ব্যোম—
কি অমৃত শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওম্।

বৈদিক যুগ (৫)।

(গত বর্ষের ১১৪ পৃষ্ঠার পর)

এই প্রবন্ধের চতুর্থ প্রস্তাবে ঋগ্বেদীয় দশম মণ্ডলের দ্বিসপ্ততিতম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের আলোচনা শেষ করিয়াছি। এই-বার উক্ত সূক্তের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও নবম মন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাই-তেছে। ১০।৭২।২ (ঋষি বৃহস্পতি—দেবতা দেবগণ)

"ব্রহ্মণস্পতিরেতাসং কর্ম্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্বে যুগেহসতঃ সদজায়ত॥"

অনুবাদ,—ব্রহ্মণস্পতি (অন্নাধিপতি) অদিতি এই দেবগণকে কর্ম্মকারের ন্যায় নির্ম্মাণ (উৎপাদন) করিয়াছিলেন। দেব-গণের উৎপত্তির পূর্ব্বকালে অসৎ (দেবা-দির উৎপত্তির কারণভূত নামরূপ বিব-র্জ্জিত তত্ত্ব—ব্রহ্ম) হইতে সৎ অর্থাৎ নামরূপবিশিষ্ট পদার্থের উৎপত্তি হইয়া-ছিল।

সায়ণ বলেন,—

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত।" ইতি হি শ্রুতেঃ। × × "দেবানাং পূর্ব্বে যুগে"—আদিসৃষ্টাবিত্যর্থঃ।"

সায়ণের মতে "পূর্ব্বে যুগে" অর্থে "আদি সৃষ্টিতে।" আদি সৃষ্টি কি ?

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—"আদি সৃষ্টির প্রথমে তমঃসমা-চ্ছন্ন আকাশের স্থিতি স্বীকার, পরে সমস্ত পদার্থ ব্যঞ্জনার্থ বায়ুর আবির্ভাব, অনন্তর তমোনুৎ জ্যোতিঃ সমূহের প্রকাশ হইলে কারণ বারির সৃষ্টি এবং তাহাতে বীজক্ষেপণ পূর্ব্বক মৃণ্ময় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। এ সৃষ্টিতে কেহই কাহারও প্রকৃতি নহে, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সকলেই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত।"—যজুর্ব্বেদ সংহিতা বঙ্গানুবাদ পৃঃ ৪৩৩ দেখ।

তৃতীয় মন্ত্র এই,—

"দেবানাং যুগে প্রথমে ঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি॥"

অনুবাদ,—দেবগণের উৎপত্তির পূর্ব্বকালে অসৎ হইতে সৎ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে দিক সকল ও তৎপরে বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইল।"

এখানেও সায়ণ "দেবানাং পূর্ব্বে যুগে" অর্থে "আদি সৃষ্টৌ" করিয়াছেন।

এই সূক্তের নবম বা শেষ মন্ত্র এই

"সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরুপপ্রৈৎ পূর্ব্ব্যং যুগং।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎ পুনর্মার্ত্তাণ্ডমাভরৎ॥"

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "অদিতির অষ্ট পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি তন্মধ্যে সপ্ত পুত্র লইয়া দেবগণ সমীপে বা দেবলোকে চলিয়া গেলেন, এবং অষ্টম পুত্র মার্ত্তণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন।" সমালোচ্য মন্ত্রে বলা হইতেছে যে,—"পুরাকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া গমন করিয়াছিলেন। প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত তিনি মার্ত্তণ্ড নামক অষ্টম পুত্রকে দ্যুলোকে স্থাপন করিয়াছেন।"

সায়ণ বলেন,—

"'পূর্ব্ব্যং' পুরাণং যুগং। × × প্রাণিমরণ জননাদীনাং সূর্য্যোদয়াস্তময়ায়ত্ততা স্ফুটা।"

এই সূক্তে সর্ব্বত্রই "পূর্ব্ব যুগ" শব্দ "পুরাকাল" অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হইতেছে। সায়ণীয় ব্যাখ্যাও আমাদের এই সিদ্ধান্তের পোষক।

ইহার পর এই মণ্ডলের চতুর্নবতিতম সূক্তের এক স্থলে অর্থাৎ দ্বাদশ মন্ত্রে কালবাচক যুগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সূক্তের ঋষি অম্বুদ বা অর্বুদ—দেবতা গ্রাবন্ (সোম রস নিষ্পীড়িত করিবার প্রস্তর) ঋষির উক্তি এই,—

"ধ্রুবা এব বঃ পিতরো যুগে যুগে
ক্ষেমকামাসঃ সদসো ন যুঞ্জতে।"

অনুবাদ,—ক্ষেমকামী তোমাদিগের পিতা 'সর্ব্বযুগে' (চিরকাল) নিশ্চলভাবে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। সায়ণ "যুগে যুগে" অর্থে "সর্ব্বেষু যুগেষু" করিয়াছেন। সুতরাং "সর্ব্ব যুগে" অর্থে "চিরকাল" গ্রহণ করাই সুসঙ্গত।

ক্রমশঃ।

অভিনন্দন পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

ব্রাহ্মসমাজে আমরা সকলেই একই ব্রহ্মের উপাসক—আমরা একহৃদয় ও এক পরিবার। আপনাকে সহসা অসম্ভাবিত রূপে আমাদের মধ্যে পাইয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি এবং আজ সকলে আন্তরিক প্রীতির সহিত সমবেত হইয়া আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আপনার পিতামহ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য আজীবন যে যত্ন পরিশ্রম ও সেবা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতেছি। তিনিই বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রাচীন ঋষিকুলের প্রতিনিধি। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনা পূর্ব্বক বিদেশে গিয়া প্রাণ হারাইলে ব্রাহ্মসমাজ যখন মৃতপ্রায় হয়, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম ও নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান ব্রাহ্মসমাজের গৌরবময় আদর্শ। আপনার পিতা, পিতৃব্যগণ ও তাঁহাদের সন্তানেরাও যে উৎসাহ ও অকাতর পরিশ্রমের সহিত ব্রাহ্মসমা-

জের, স্বদেশের ও মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন, তাহাও আমরা আনন্দের সহিত স্মরণ করিতেছি। আপনি মহর্ষিকে ও আপনার পিতাকে আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবেন। আমরা ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, আপনি নীরোগ দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহাদের পুণ্যপদাঙ্ক অনুসরণ করুন।

বিনীত

চট্টগ্রাম
২১ শে অক্টোবর
১৮৯৪।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রভৃতি

কালনা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টীদিগের হস্তান্তর পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পিতার নাম শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পিতার নাম ৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাং যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
পিতার নাম ৺ কৃপারাম মুন্সী
হাল সাং কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়
পিতার নাম ৺ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
সাং বেহালা ডিঃ ও রেজেষ্টারী ২৪ পরগনা
শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
পিতার নাম ৺ যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সাং কালনা, সবডিঃ সবরেজেষ্টারী ও থানা কালনা, জেলা, বর্দ্ধমান।

লিখিতং—
শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
পিতার নাম ৺ জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং কালনা, অধিকারী পাড়া, সবডিঃ সবরেজেষ্টারী ও থানা কালনা, জেলা বর্দ্ধমান।
শ্রীমথুরালাল মুখোপাধ্যায়
পিতার নাম ৺ কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সাং বিদ্যাবাগীশ পাড়া কালনা, সবডিঃ সবরেজেষ্টারী ও থানা কালনা, জেলা বর্দ্ধমান।

মহাশয়গণ

কস্য ট্রষ্টীদিগের হস্তান্তর পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—এক ঈশ্বরের উপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করিবার জন্য আমরা কালনায় একটী ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, গত সন ১২৭৭ সালে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের কালনাস্থ মাল সেরেস্তা হইতে বার্ষিক ১৵০ সতর আনা রাজস্ব ধার্য্য মতে—সবডিবিজন ও সবরেজেষ্টারী কালনার অন্তর্গত নিজ কালনার শকুন্তলা নামক স্থানে, মিসনরোডের দক্ষিণ, মহারাজ বাহাদুরের বাটীর উত্তর প্রাচীরের ও রাস্তার উত্তর ইহার মধ্যে অনুমান ৵১ এক কাঠা জায়গা আমি শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নিজনামে সরতি মোকররী পাট্টা প্রাপ্ত হই। পরে ব্যয়সাধ্য সমাজ গৃহ নির্ম্মাণার্থ রাজা মহারাজা, ধনী ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়া উক্ত ৵১ এক কাঠা ভূমির উপরে প্রশস্ত একতালা পাকা দালান নির্ম্মাণ করাইয়া এবং তাহা কালনা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নামে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তথায় নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আসিতেছি। উক্ত সমাজ স্থাপনের

উদ্যোগীগণের মধ্যে প্রায় সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। আমরা উভয়ে জীবিত আছি মাত্র। এক্ষণে, আমাদের যত্ন চেষ্টা ও অর্থে এই সমাজের কার্য্য ও ইমারতের সংস্কারাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত না হওয়ায় এবং আপনাদের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী হিতৈষী মহোদয়গণের হস্তে এসমাজ ও সমাজের সমস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত করিলে, সমাজের উন্নতি সাধিত হইয়া সমাজস্থাপনার উদ্দেশ্য সফল হইবার আশায়, আমরা এই সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষায়, এই সমাজগৃহ ও সমাজগৃহস্থিত সমস্ত দ্রব্যাদি যথা,—একটা ঝাড়, দুইটা বৈঠকী ঝাড়, একটা বড় লাণ্ঠন, ছয়খানা বেঞ্চ ও একখানা চেয়ার, মায় এই সমস্ত আসবাব, যাহার আনুমানিক মূল্য ৫০০৲ পাঁচশত টাকা—তাহা আপনাদিগকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করতঃ আপনাদের হস্তে অর্পণ করিলাম। আপনারা উক্ত সম্পত্তিতে ট্রষ্টী স্বরূপে স্বত্ববান হইয়া স্বয়ং এবং এই ট্রষ্টডিডের সর্ত্তমত স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে চিরকাল, এই ডিডের উদ্দেশ্য ও কার্য্য পশ্চাৎ লিখিত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করিয়া দখলিকার থাকিবেন। আমাদের বা আমাদের উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বত্বদখল রহিল না ও রহিবে না। যদি কেহ কখন কোন দাবী দাওয়া করে তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

উক্ত সমাজগৃহে কেবল চিরকালই এক ব্রহ্মের উপাসনা হইবে, এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু পক্ষী মনুষ্যের বা মূর্ত্তির অথবা কোন চিত্র বা চিহ্নের পূজা এই গৃহে হইতে পারিবে না। এই গৃহে অপর সাধারণের একজন বা অনেকে মিলিত হইয়া নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন। আচার্য্যের কর্ম্ম করিতে হইলে ট্রষ্টীগণের বা তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সম্মতি লইবার আবশ্যক হইবে। ধর্ম্মের নামে বা খাদ্যের জন্য বা অন্য কোন কারণে এই গৃহে জীবহিংসা বা মদ্যপান হইতে পারিবে না। বৃথা কোন আমোদ প্রমোদের জন্য এই গৃহ ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম্মের বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা করা হইবে না। সমাজে এরূপ উপদেশাদি দিতে হইবে যাহা বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের পূজা বন্দনাদি ও ধ্যান ধারণার উপযোগী হয় এবং যাহা দ্বারা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মভাব ও ভ্রাতৃভাব সম্বর্দ্ধিত হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মনীতির ও উপচিকীর্ষাবৃত্তির স্ফুরণ হয়। এ গৃহে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, কলহাদি একেবারেই হইতে পারিবে না।

ট্রষ্টীদিগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ট্রষ্টীগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইলে, অধিকাংশের যে মত হইবে সেই মতেই কার্য্য হইবে। কোন ট্রষ্টী কার্য্যত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ট্রষ্টী ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণ উপযুক্ত ইচ্ছুক প্রাপ্তবয়স্ক ধার্ম্মিক ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। নূতন ট্রষ্টীও সর্ব্বাংশে এই ডিডের নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করিবেন। যদি কেহ সমাজের উন্নতির জন্য কোন দ্রব্য বা অর্থদান করেন, ট্রষ্টীগণ তাহা গ্রহণ করিয়া এই সমাজের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবেন। অধিকাংশ ট্রষ্টীর অভিমতে সেই ব্যয়কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। ট্রষ্টীগণ ইচ্ছা করিলে এই সমাজগৃহ ও তাহার আসবাব কালনার অন্তর্গত অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন বা বর্ত্তমান গৃহের কোন অংশ পরিত্যাগ কি নূতন সংযোগ করিয়া দিতে পারিবেন। এই সমাজগৃহ বা সমাজের কোন অংশ বা আসবাব কোন ট্রষ্টীর নিজের সম্পত্তি হইবে না। ট্রষ্টীগণের মধ্যে কাহার কোন ঋণদায়ে বা কার্য্যদোষে এই সমাজ বা সমাজের কোন অংশ বা আসবাব ক্রোক নিলাম হইতে পারিবে না বা বিক্রয় অথবা বন্ধকাদি দ্বারা আবদ্ধ হইতে পারিবে না। এই ট্রষ্টডিডের লিখিত নিয়মাবলীর বা

স্বত্বের বা ব্যবহার প্রণালীর বিপরীতে কখনই কোন কার্য্য হইতে পারিবে না।

ট্রষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে বা প্রয়োজন মতে উৎসব করিয়া ধর্ম্মোন্নতির ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিবেন এবং সমাজের উন্নতি কল্পে সকল প্রকার সদনুষ্ঠান করিতে পারিবেন ও যত্ন পূর্ব্বক চিরকালই এই সমাজ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে এই ক্ষুদ্র সমাজটী উন্নত ও চিরস্থায়ী হইবে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস—এবং সেই বিশ্বাস থাকাতেই আমরা অদ্য এই সমাজ ও সমাজের সকল স্বত্ব উল্লিখিত মহোদয়গণকে অর্পণ করিয়া ট্রষ্টী নিযুক্ত করিলাম। ট্রষ্টীগণ আমাদের মধ্যে কাহাকে কোন ভার দিতে ইচ্ছা করিলে যাহাকে যে ভার দিবেন, যদি সাধ্য হয়, আমরা পরম যত্নে তাহা সম্পন্ন করিতে যত্ন করিব।

আরও প্রকাশ থাকে যে যদি বর্ত্তমানের নিযুক্ত সকল ট্রষ্টীই এককালে ট্রষ্টীপদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তবে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান ট্রষ্টী ও সম্পাদকগণ বা ভবিষ্যতে যাঁহারা ট্রষ্টী ও সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন—সেই ট্রষ্টী ও সম্পাদকগণই পুনর্ব্বার উপযুক্ত ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া কালনা ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা করিবেন। ইহার বিপরীতে কোন কার্য্য হইতে পারিবে না। এতদর্থে সন্তুষ্টচিত্তে ও সরল হৃদয়ে এই ট্রষ্টীদিগের হস্তান্তর পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ২২শে চৈত্র শক ১৮১৫।

কালনা ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী,
লেখক,
শ্রীপুলিনচন্দ্র রায়।
সাং কলিকাতা, বাগবাজার, রিলায়ান্স প্রেস।
শ্রীযোগিন্দ্রচন্দ্র কবিরাজ।
শ্রীকালীকিশোর মুখোপাধ্যায়।
সাং অম্বিকা।
শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাং কালনা অধিকারীপাড়া।
Surya Narayan Sarvadhikari L. M. S.
Chairman Kalna.
Municipality.
Tara Das Bhattachargee L. M. S.
Medical officer Burdwan Hospital Kalna.

সংবাদ।

সম্প্রতি আত্মারাম নামক জনৈক পরিব্রাজক হিন্দু সন্ন্যাসী এখানে আসিয়াছিলেন। ইনি অতি অল্প বয়সে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ কিছু দিন প্রয়াগের অপর পার্শ ঝুঁসী নামক স্থানে সাধু সন্ন্যাসীদিগের সহিত বাস করেন। পরে ইহাঁর পিতা ও আত্মীয় স্বজন জানিতে পারিয়া ইঁহাকে ধরিয়া লইয়া যান। ইনি কিন্তু সংসার মধ্যে অধিক দিবস থাকিতে পারেন নাই। অতি অল্প দিবস পরেই পুনরায় সংসার ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আইলেন। পাছে আবার জানিতে পারিয়া আত্মীয় স্বজন ধরিয়া লইয়া যান এই নিমিত্ত আর ঝুঁসীতে না যাইয়া এবার চিত্রকূটে আসিয়া অনুসুয়া পাহাড়ে সাধুজন সহিত বাস করেন। আমি ইহাঁর ন্যায় জ্ঞানী ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহাঁর সহিত আমার দুই দিবস ধর্ম্ম বিষয়ক বাক্যালাপ হয়। পরে ইহাঁর অনুরোধে আমি ইহাঁকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিই। ইনিও প্রীতিপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে আজ হইতে ব্রাহ্ম সন্ন্যাসী রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বর ইহাঁর সাধু উদ্দেশ্য সফল করুন।

২৯ শে ভাদ্র } শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস।
প্রচারক—প্রার্থনাসমাজ ঝাসী।

গত আশ্বিনে কালনা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ উৎসবে পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনামণ্ডপ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হৃদয়গ্রাহী উপদেশে অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫, আশ্বিন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪৮৭॥/০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩২৫৭॥ ৫
সমষ্টি ...	৩৭৪৫/ ৫
ব্যয় ...	৬০৬৸৶১০
স্থিত ...	৩১৩৮ /১৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ১৫৯৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৮১৬ শকের আশ্বিন মাসের দান ১৪০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়	১০৲
„ „ অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী	৫৲
„ „ ক্ষেত্রমোহন ধর	২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

„ „ হীরালাল প্রামাণিক	২৲
	১৫৯৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১৪০/১০

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী,	ত্রিপুরা	৫৲
„ „ চন্দ্রশেখর বসু,	দ্বারভাঙ্গা	৬৸০
„ „ বেণীমাধব সেন,	পাণিহাটী	৬৸৴০
„ „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়,	হালিসহর	৪॥/১০
„ „ শ্রীরাম পালিত,	ঘাটাল	৬৸০
„ „ ললিতমোহন সিংহ,	চুঁচুড়া	১০৲
„ „ গোপালচন্দ্র বড়াল,	দিনাজপুর	৬৸০
„ „ রসিকলাল রায় মুন্সী,	মুসুরিপাহাড়	৫৲
„ „ লালা গণেশ প্রসাদ,	দ্বারভাঙ্গা	৩।৶০
„ „ বারাণসী বসু,	উলা	৩।৶০
„ রাজা কালিপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র,	গড়খণ্ডরই	৬৸০
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ,	বাঁকুড়া	৩৸০
„ বাবু শ্যামলাল মিত্র,	লক্ষ্ণৌ	৩।০
পি সি সেন স্কোয়ার	রেঙ্গুন	৬৸০
এইচ এইচ দি মহারাজা বাহাদুর অব্	দিনাজপুর	৩।৶৫
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সিংহ,	কলিকাতা	৩৲
„ „ মতিলাল পাল,	ঐ	৩৲
„ „ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মিত্র,	ঐ	৩৲
„ „ অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১।০
„ „ জয়গোপাল মিত্র,	ঐ	৩৲
„ রাজা রামেশ্বর মালিয়া,	ঐ	৩৲
„ বাবু উপেন্দ্রমোহন মিত্র মুস্তফি,	ঐ	২৲
„ „ হরিমোহন নন্দী,	ঐ	১৶
„ „ বিপিনবিহারী সরকার	ঐ	৩৲
„ „ মথুরানাথ বর্ম্মণ,	ঐ	১॥০
„ জয়গোপাল সেন,	ঐ	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	ঐ	৩৲
„ „ বলাইচাঁদ পাইন,	ঐ	৩৲
„ „ বলাইচাঁদ সিংহ	ঐ	৩৲
„ „ হেমলাল পাইন,	ঐ	৩৲
„ „ হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	১৲
„ „ ক্ষেত্রমোহন ধর,	ঐ	১৲
„ „ রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১॥০
„ „ প্যারিমোহন রায়,	ঐ	১২৲
„ „ আশুতোষ ধর,	ঐ	৩৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একখণ্ড নগদ বিক্রয়		।৶০
		১৪০/১০

পুস্তকালয়	১৪৶০
যন্ত্রালয়	১৭২৲
গচ্ছিত	১।৶০
পুস্তক বিক্রয়ের কমিসন ..	৸৶১০
সমষ্টি	৪৮৭॥/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩১২৸/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪৩।৶৫
পুস্তকালয় ...	৩৮॥৶১০
যন্ত্রালয় ..	২০২।৶০
গচ্ছিত ...	৭৸/৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১॥/১০
সমষ্টি	৬০৬৸৶১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর সারস্বত আশ্রমে বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২৫ আশ্বিন বুধবার ১৮১৬ শক।

ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসক।

হংস যেমন সরোবরে বিরাজ করে, পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া যেমন জল আলোকিত করে, চন্দ্র যেমন নক্ষত্র-খচিত নীল আকাশকে শোভিত করে, ব্রহ্মোপাসক তেমনি সংসারকে উজ্জ্বল করেন। ব্রহ্মোপাসকই সংসারের আলোক। চন্দ্র যেমন জ্যোতির আকর সূর্য্য হইতে আলোক লাভ করিয়া, সকলের মনোহরণ করে, ব্রহ্মোপাসকও তেমনি সকল জ্যোতির আকর পরমেশ্বর হইতে জ্যোতি পাইয়া সকলের নয়নানন্দ বিধান করেন।

ব্রহ্মোপাসনা হইতেই ব্রহ্মানন্দ উৎপন্ন হয়। এই ব্রহ্মানন্দই রূপহীনকে রূপবান ও দরিদ্রকে ধনবান করে। এই ব্রহ্মানন্দই সকল দুঃখ, সকল শোক, সকল অন্ধকার দূর করে।

যায় শোক যায় তাপ যায় হৃদয়ভার,
সর্ব্ব সম্পদ তাহে মিলে যখন থাকি তাঁর সাথ।

তিনি সকল সময়ে বন্ধু। তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার স্পর্শসুখে যিনি সুখী হয়েন, তাঁহার হৃদয় কি কোমল—কি ক্ষমাশীল!

এই ব্রহ্মানন্দ যদি স্বামী স্ত্রীর, পিতা পুত্রের, গুরু ও শিষ্যের, বন্ধু ও অবন্ধুর হৃদয়গত হয়, তবে সংসারে পবিত্র সুখের কি অভাব থাকে? তখন ইহ সংসারই স্বর্গলোক হয়। ব্রহ্মানন্দগুণে প্রীতি-ভক্তি ও স্নেহের পারিজাত গৃহপ্রাঙ্গণে প্রস্ফুটিত হইয়া কি এক অপরূপ শোভাই প্রদর্শন করে!

এই ব্রহ্মানন্দ যে স্থানে নাই, সে স্থান যদিও ধনধান্যে রাজভবনতুল্য সুসম্পন্ন হয়, তথাপি সেখানে সুখ-শান্তি নাই। সেখানে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে সঞ্চরণ করে। সেখানে রজত কাঞ্চনের প্রদীপের মধ্যেও গাঢ় অন্ধকার! সেখানে সুখের মধ্যে দুঃখ, ও হাস্যের মধ্যে মর্ম্মান্তিক বেদনা লুকায়িত থাকে।

আপনি স্বর্ণসিংহাসনে বসিলে কি হইবে, যদি হৃদয়ে ভগবানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকে। মুক্তার মালা গলে ধারণ করিলে কি ফল, যদি হৃদয় বাহিয়া

প্রেমাশ্রুধারা পতিত না হয়। পক্ষান্তরে চীরধারী ঋষির পর্ণকুটীর দেখ! ঈশ্বরের আবির্ভাবে ইহা রাজভবন হইতেও উজ্জ্বল। আনন্দের সুরভি কুসুম সেখানে নিয়তই প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। প্রেমের স্পর্শমণি কহিনুরকে পরাজিত করিয়া সকল অন্ধকার দূর করিতেছে। তিনি যখন গঙ্গাতীরে বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের তরঙ্গ, গঙ্গার তরঙ্গের সহিত তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে। তিনি যখন নিভৃত নিলয়ে ভগবানের ধ্যান করেন, তখন তাঁহার হৃদয় সংসারের অতীত প্রদেশে স্থিতি করে। হিমাচলের অত্যুচ্চ প্রদেশ যেমন শুভ্র তুষারে শোভিত—গাম্ভীর্য্য পবিত্রতা ও নিঃস্তব্ধতায় পূর্ণ, তাঁহার উন্নত হৃদয়ও তেমনি স্বর্গীয় পবিত্রতা ও শান্তিতে পূর্ণ।

ইহা নিশ্চয় যে, দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত নিষ্ফল। অতএব ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের সকল কার্য্যের একটা সময় হয়, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনার সময় হয় না। যাঁর নিকটে যাইলে সকল দুঃখের অবসান হইবে, তাঁর নিকটে আমরা যাই না। যার হস্তে হৃদয় সমর্পণ করিয়া বার বার আঘাত পাইয়াছি, তার সঙ্গই আমাদের ভাল লাগে। ছাড় এ মোহ। ভগবানের সঙ্গে থাক। প্রকৃত রূপে তাঁর উপাসনা কর। লোকের চক্ষুরঞ্জনের নিমিত্ত তাঁর উপাসনা নয়—আপনার আত্মার তৃপ্তির জন্য। যদি তাই না হয়, তবে সে উপাসনায় কি ফল? অর্থ না বুঝিয়া হৃদয়শূন্য হইয়া বৃথা বাক্য উচ্চারণ কি উপাসনা? যদি উপাসনা করিতে চাও, তবে হৃদয়-মন্দিরে আপনার অন্তরে প্রথমে তাঁহাকে উপলব্ধি কর। মনের দ্বার উদ্‌ঘাটন কর। আপনার হৃদয়ের কথা তাঁহাকে বল। তাঁর যে কথা তাহা শ্রবণ কর। সেই শান্তি-সমুদ্রে নিমগ্ন হও। "শিব সুন্দর চরণে মন, মগ্ন হোয়ে রও রে। ভজরে আনন্দময়ে সব যন্ত্রণা এড়াও রে। বিভুপাদপদ্মসুধাহ্রদে ডুবে প্রাণ জুড়াও রে।" এইরূপ প্রতি প্রাতে—প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের ঈশ্বরে আত্মসমাধান করা কর্ত্তব্য। আর একটি বিশেষ কথা এই,—উপাসনাতে অনিয়ম থাকা কোন রূপেই ভাল নয়। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ঋষিরা তপোবনে যথা নিয়মে উপাসনা করিতেন। আমি যেন শুনিতেছি, তাঁরা বলিতেছেন,

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

আর আমরা তাঁহাদের বংশে—তাঁহাদের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দিনান্তে কি একবার তাঁহাকে ডাকিব না। নিয়ম করিয়া প্রতিদিন উপাসনা করিলে তাহার ফলও বিস্তর হয়। নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত আত্মোন্নতির আর উপায় নাই।

মনুষ সহজেই দুর্ব্বল। সে যতই উন্নত হউক না কেন, তথাপি তাহার দুর্ব্বলতা থাকিবেই থাকিবে। এ মোহময় সংসারে পরম ধর্ম্মাত্মাকেও এক দিন অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু যিনি প্রতি দিন উপাসনা করেন, তিনি যদি কোন দিন মোহ বশত পাপে পড়েন, তাহা হইলে নিয়মিত উপাসনার ফলে, তাঁহার পাপ তখনি তখনি ক্ষয় হইয়া যায়। অভ্যাসের বশে নির্দ্দিষ্ট কালে যখন তিনি উপাসনা করিতে বসিবেন, তখন দেখিবেন পাপের যন্ত্রণাযুক্ত মনে উপাসনা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। তখন কাতর প্রাণে তাঁর পদতলে তাঁকে পড়িতেই হইবে। তখন তাঁহাকে কাঁদিয়া আকুল হইতেই হইবে। ভগবান সে অশ্রুজলের মধ্যে

তাঁহাকে দেখা দিয়া উদ্ধার করিবেনই করিবেন। সদ্যকৃত পাপ সদ্যই আত্মা হইতে চলিয়া যাইবে। নিয়মিত উপাসনায় এই এক প্রত্যক্ষ ফল। আর নিত্য নবালোকে নবানন্দে তাঁহার আত্মা পূর্ণ হইতে থাকে। ব্রহ্মানন্দই ব্রহ্মোপাসকের সর্ব্বস্ব। এস, প্রাণ থাকিতে থাকিতেই—পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করি। এস তাঁর শরণাপন্ন হই।

কোথা গো মা জগৎ-জননি! আমি দীপ্তশিরা হইয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি। তুমি তোমার চরণামৃত আমার মস্তকে সিঞ্চন কর। আমি সকল পাপ সকল তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দে প্রফুল্ল হই। জননি! তুমি আমাকে তোমার উপাসনা শিক্ষা করিতে দেও। তোমার ধর্ম্মপালনে বল দেও। যেখানে তোমার পদানত ভক্তেরা স্তিমিতলোচনে কি অমৃতরস পান করিয়া আত্মহারা হন, সেই অমৃত নিকেতনে মরণান্তে তুমি আমাকে স্থান দিও। এই তোমার নিকটে আমার ভিক্ষা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জড়ের সাধারণ গুণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যোগাকর্ষণের ন্যূনাধিক্য দ্বারা জড় পদার্থের নানা অবস্থা ঘটে। যোগাকর্ষণের তারতম্যবশত বস্তু সকল মরুৎ, তরল ও কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়; কখন কখন কঠিন ও তরল অবস্থার মধ্যবর্ত্তী আর এক অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, গন্ধককে গলাইয়া বিশেষ উত্তাপে আনয়ন করিলে তাহা চট্‌চটে অবস্থা প্রাপ্ত হয়; যাহাতে আঘাত করিলে প্রত্যাঘাত পাওয়া যায়, যাহাতে আঙ্গুল প্রবেশ করানো কঠিন হয়, সেরূপ কঠিন থাকে না; আবার, যেরূপ তরল হইলে সহজে ঢালা যায় সেরূপও হয় না, কিন্তু এক রকম আটার মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যোগাকর্ষণ সমস্ত অণুকে ধরিয়া আছে, তাহারি তারতম্য অনুসারে বস্তুর ঐই সকল অবস্থা ঘটে।

দূরবর্ত্তী পদার্থ সকলের মধ্যে যে আকর্ষণ তাহাই মাধ্যাকর্ষণ। যোগাকর্ষণ সন্নিকটস্থ পদার্থের আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ দূরস্থ পদার্থের আকর্ষণ; যেমন পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে যে আকর্ষণ পরস্পরকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সেই সকল মিলিয়া যদি একটা ঢেলা বাঁধিয়া যাইত তাহা হইলে যোগাকর্ষণের কার্য্য হইত। জলের মধ্যে যখন কতকগুলি জিনিস ভাসাইয়া দিলাম, আর তাহারা পরস্পর আসিয়া লাগিয়া গেল, তাহাকে কি আকর্ষণ বলে—তাহাকে অবশ্য মাধ্যাকর্ষণ বলে। যোগাকর্ষণে একটি বস্তু সমষ্টিভাবে থাকে, পিণ্ডভাবে থাকে। তেমনি মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা দূরস্থ পদার্থসকল পরস্পরের সঙ্গে মিলিতে চাহে এবং যথা স্থানে থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ঐ মাধ্যাকর্ষণ দ্বারাই ঢিল ছাড়িয়া দিলে পৃথিবীতে মিলিত হইতেছে; পর্ব্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেলে উপরে উঠিয়া যাইতে পারে না, পৃথিবীর আকর্ষণে মাটিতে পড়িয়া যায়; আবার ঐ মাধ্যাকর্ষণ দ্বারাই দূরস্থ জগৎ সকল দূরেতেই সাম্যভাবে থাকিতেছে।

কৈশিকাকর্ষণকে কেহ কেহ আকর্ষণ বলেন, কেহ কেহ বলেন না। কৈশিকাকর্ষণ নাম কেশ হইতে আসিয়াছে। কেশ যেমন সূক্ষ্ম, সেইরূপ সূক্ষ্ম স্থানের মধ্য

দিয়া যে আকর্ষণ আইসে তাহার নাম কৈশিকাকর্ষণ। যেমন এই একটী পাত্র আছে উহাতে ক পর্য্যন্ত জল আছে; উহাতে যদি খুব সরু একটী নল নামাইয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ জল নলের মুখ (খ) ছাপাইয়া উঠিবে। মাটি হইতে গাছের উপরে জল উঠে; দেওয়াল যে শুষ্ক দেখিতেছ, ইহার ভিতরেও জল আছে কিন্তু সে জল বনিয়াদের ভিতর হইতে উঠিতেছে না; পুরাতন বাড়ীতে যখন বড় বড় গাছ হয় তাহারাও জল পাইয়া বাঁচিয়া থাকে; কৈশিকাকর্ষণের পক্ষে যাঁহারা, তাঁহারা বলেন কৈশিকাকর্ষণ দ্বারাই ঐ সকল ঘটনা হয়; যাঁহারা কৈশিকাকর্ষণের বিপক্ষ, তাঁহারা অন্য অন্য কারণ দ্বারা ঐ সকল ঘটনা বুঝাইয়া দেন। সে সকল বিষয় এখন বলিবার প্রয়োজন নাই; কেবল মাত্র বলিয়া রাখি যে তাঁহাদের মতে বায়ুর চাপে ও সূর্য্যতাপে ঐপ্রকার জল উঠে। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক, রাসায়নিক আকর্ষণ বুঝা। এই ০ একটী অণু রহিয়াছে, এই ০ একটী অণু রহিয়াছে, এই ০ একটী অণু রহিয়াছে। প্রথম মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা তাহারা কাছাকাছি আসিল, তাহার পরে যোগাকর্ষণ দ্বারা তাহারা একটী পিণ্ড বাঁধিয়া গেল; ইহাতে পরমাণুর গুণ হইতে পিণ্ডের গুণ কিছুই পরিবর্ত্তিত হইল না; কেবল পরমাণুগুলি একত্র হইয়া পিণ্ড বাঁধিয়া রহিল মাত্র। কিন্তু যখন অন্যতর গুণ উৎপন্ন হইবে, তখন জানিবে পরমাণুতে পরমাণুতে রাসায়নিক আকর্ষণ হইয়াছে। রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা অণু সকল যুক্ত হইলে যে পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহার পৃথক্ গুণ হইয়া যায়; যেমন পূর্ব্বে দৃষ্টান্ত দিয়াছি যে, উদজান ও অম্লজানের পরস্পর সংযোগে জল হইয়া গেল এবং পরে যোগাকর্ষণ বলে তরল অবস্থায় দাঁড়াইল। এই খড়ি রাসায়নিক আকর্ষণে উৎপন্ন হইয়া তাহার পরে এখন যোগাকর্ষণ দ্বারা পিণ্ড বাঁধিয়া রহিয়াছে।

এই খড়ির মূলভাগ হইতেছে চূর্ণসার (ক্যালসিয়ম) ধাতুর পরমাণু, তাহার সঙ্গে অম্লজানের পরমাণু আকৃষ্ট হইয়া প্রথম চুনের রেণু প্রস্তুত হইল; পরে আবার চুনের রেণুর সহিত আঙ্গারিকাম্লের (কারবনিক অ্যাসিড) রেণুর যোগে এই খড়ির রেণু প্রস্তুত হইল। ঐ আঙ্গারিকাম্ল মরুতের রেণু আবার অঙ্গারের পরমাণুর সহিত অম্লজানের পরমাণুর যোগে উৎপন্ন হইয়াছিল। তবে দেখ, চূর্ণসার ধাতু, কয়লা ও অম্লজান মরুৎ, এই বিভিন্নরূপ তিনটী পদার্থের পরমাণুর পরিমিত সংযোগে একটা খড়ির রেণু প্রস্তুত হইয়াছে। চূর্ণসারের যে গুণ, কয়লার যে গুণ, অম্লজানের যে গুণ, ইহাতে সে প্রকার কোন গুণই নাই। দেখ, রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা স্বতন্ত্র গুণ উৎপন্ন হইয়া গেল।

যখন দেখি যে কোন পদার্থের একটী গুণ তাহার অণুর গুণ নহে, সেখানে রাসায়নিক ব্যাপার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যতক্ষণ কেবল উদজান ও অম্লজানকে একটা বোতলের ভিতর পুরিয়া রাখা যায়, ততক্ষণ যদিও উদজান সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের রেণুর গুণ-পরিবর্ত্ত হয় না; কিন্তু যেই তাহাতে নির্দ্দিষ্ট চাপ অথবা তড়িৎ প্রয়োগ করা যায়, অমনি তাহাদের রেণুর গুণ পরিবর্ত্তিত হইয়া বাষ্পরেণুর গুণ প্রাপ্ত হয়, যাহা উহাদের নিজের কোন গুণ নহে। সহজ

উপমা দিয়া বুঝাইতেছি—মনে কর, চাউল পৃথক আছে, ডাউল পৃথক আছে কিন্তু উভয়কে একত্র রন্ধন করিলে হইয়া গেল খেচরী অন্ন।

রাসায়নিক আকর্ষণ যেন বহুব্রীহি সমাস; যেমন, ক্ষণপ্রভা—ক্ষণ অর্থে সময়, প্রভা অর্থে আলো, উভয়ে মিলিয়া অর্থ হইল বিদ্যুৎ। এমন অনেক যোগরূঢ়িক কথা আছে, যাহার অর্থের সঙ্গে মূলের অর্থের কোন মিল নাই। পারা ও গন্ধক মিশ্রিত করিয়া গুঁড়া করিলে কজ্জলী হয়; আবার তাহাতে যদি তাপ দেওয়া যায়, তাহা হিঙ্গুল হয়—উপাদানের পরমাণুর সঙ্গে ফলের রেণুর সঙ্গে কিছুই মিল নাই।

যোগাকর্ষণে মিলিত হইয়া যে পদার্থ হয় তাহা যেমন গুণেতে বিভিন্ন হয় না, তেমনি যোগেরও কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই; এক ছটাক চাউল এক মণ চিনিতে মিশাও, একমণ একছটাক পদার্থ হইবে। কিন্তু রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা যাহার সঙ্গে যাহা মিলিবে তাহা একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিলিবে; যেমন দুই পরমাণু উদজানের সঙ্গে এক পরমাণু অম্লজান মিলিলে জল হইবে—জল হইতে গেলেই এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিলিতে হইবে। যদি তিন পরমাণু উদজান থাকে ও দুই পরমাণু অম্লজান থাকে, তাহাতে যদি তড়িৎ প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঐ দুই পরমাণু উদজানে এক পরমাণু অম্লজান মিলিয়া জল হইবে; আর অবশিষ্ট উদজানের যে এক পরমাণু ও অম্লজানের যে এক পরমাণু তাহারা মিশিয়া থাকিবে কিন্তু তাহাদের যোগ হইবে না; কিন্তু তাহাতে আর এক পরমাণু উদজান দিয়া যদি তড়িৎ প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে দুই পরমাণু উদজান, এক পরমাণু যে অম্লজান আছে তাহার সঙ্গে মিলিয়া জল হইবে, অবশিষ্ট আর কিছুই থাকিবে না।

এই উদজান পরমাণুর আয়তন এবং অম্লজান পরমাণুর আয়তন সমান, এই হেতু যদি দুই আয়তন উদজানের সহিত এক আয়তন অম্লজান মিশাইয়া উত্তাপ বা তড়িতের দ্বারা সংযুক্ত করা যায় তাহা হইলেই সমস্তটা বাষ্প হয় নচেৎ এক কিম্বা অন্যটা অবশিষ্ট থাকে। আবার দেখা যায়, আট কুচ ওজনের বা আট সের ওজনের বা আট মণ ওজনের অম্লজানের সঙ্গে এক কুচ বা একসের বা একমণ ওজনের উদজান যোগ হইয়া নয় কুচ বা নয় সের বা নয়মণ জল প্রস্তুত হয়; কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দুই পরমাণু উদজানের সঙ্গে এক পরমাণু অম্লজানের যোগে জল হয়; সুতরাং অম্লজানের প্রত্যেক পরমাণু উদজানের প্রত্যেক পরমাণু অপেক্ষা অবশ্য যোলগুণ ভারী।

আবার আমরা এই অম্লজান ও উদজানের সংযোগের সময় আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিতে পাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দুই পরমাণু উদজান এক পরমাণু অম্লজানের সঙ্গে মিলিয়া জল হয়; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে উদজান পরমাণুর আয়তন এবং অম্লজান পরমাণুর আয়তন সমান। মনে কর যেন উ, উ এই দুইটী দুই আয়তন উদজানের চিহ্ন এবং অ যেন অম্লজানের চিহ্ন [উ] [অ]

মনে কর এক এক আয়তন উদজানের ওজন এক কুচ, তাহা হইলে দুই আয়তনের ওজন দুই কুচ হইল এবং অম্লজান আয়তনের ওজন যেন ১৬ কুচ; এই তিন আয়তন মিলিয়া যখন বাষ্প হইবে, তখন যদিচ বাষ্পের ওজন ১৮ কুচ হইবে কিন্তু

আয়তন তিন থাকিবে না। উহারা এত গাঢ়রূপে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে যে অযুক্তাবস্থা হইতে যুক্তাবস্থায় উহাদের আয়তন কম হইয়া যায়; অম্লজান ও উদজানের আয়তন সমষ্টি তিন ছিল, সংযুক্ত হইয়া বাষ্পের আয়তন দুই মাত্র হয়; যেমন উ, উ, অ মিলিয়া দুই বা, বা (বাষ্প) হইয়া গেল সুতরাং এক এক বাষ্পায়তনের মধ্যে অম্লজানের ভার উদজান অপেক্ষা আটগুণ বেশী। রাসায়নিক আকর্ষণ এত প্রবল হইল যে তিন আয়তনকে দুই আয়তন করিয়া ফেলিল কিন্তু যোগাকর্ষণের বল হয়তো বেশী হইল না, যেহেতু সংযোগপরিণত রেণু কেবল বাষ্পভাব ধারণ করিল।

দেখ, রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা যাহার সঙ্গে যাহা মিলিবে তাহা একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যতীত মিলিবে না। যেমন, পারা ও গন্ধকে মিলিয়া হিঙ্গুল হইবে, কিন্তু এই উভয়ের মিলিবার একটী নির্দ্দিষ্ট ভাগপরিমাণ আছে, তাহাতেই তাহারা মিলিবে; যাহা কিছু বেশীকম থাকিবে তাহা মিলিবে না, মিলিত বস্তুর অবশিষ্ট অংশ পড়িয়া থাকিবে।

যোগাকর্ষণের মধ্যে যতই দাও না কেন,সমস্তই মিলিয়া থাকিবে; রাসায়নিক আকর্ষণ একে তো স্বতন্ত্র প্রকার পদার্থ প্রস্তুত করে, তাহাতে আবার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ না হইলে বিভিন্ন পদার্থ সকল তাহার বলে মিলিত হয় না। আবার এক এক পদার্থের সঙ্গে এক এক পদার্থের আকর্ষণ অথবা যোগাবনতি অথবা ঘনিষ্ঠতা আছে; আবার পদার্থবিশেষের সঙ্গে ঐ আকর্ষণের বা যোগাবনতির বা ঘনিষ্টতার ন্যূনাধিক্য আছে; আবার কতকগুলি পদার্থ কতকগুলি পদার্থের সঙ্গে আদতেই মিলিতে পারে না—ইহাও যোগাকর্ষণ হইতে রাসায়নিক আকর্ষণের একটা প্রভেদ দেখা যাইতেছে।

যোগাবনতির অর্থ এক পদার্থের অপর এক পদার্থের সহিত আকর্ষণ এবং এক পদার্থ অপেক্ষা অন্য পদার্থের সঙ্গে অধিক আকর্ষণ। যেমন, গন্ধকের পারার সঙ্গে যোগ হয়, কিন্তু লৌহের সঙ্গে অধিক যোগ হয়; গন্ধকের পারার সঙ্গে যুক্ত হইবার যে ইচ্ছা আছে, লৌহের সঙ্গে যুক্ত হইবার তদপেক্ষা অধিকতর ইচ্ছা আছে।

যেমন বিশেষ বিশেষ পদার্থের সঙ্গে যোগাবনতি আছে, তেমমি বিশেষ বিশেষ পরিমাণে যোগাবনতি আছে। যদি তিনটা বস্তুর রাসায়নিক যোগ করিতে যাওয়া যায়, তবে যে দুইটী পদার্থের পরস্পরের প্রতি অধিক যোগাবনতি আছে সেই দুইটীই মিলিবে, আর একটা পড়িয়া থাকিবে। যদি হিঙ্গুলের সঙ্গে লৌহের জ্বাল দেওয়া যায়, তাহা হইলে লৌহকে পাইয়া হিঙ্গুলস্থিত গন্ধক পারাকে ছাড়িয়া দিয়া উহার সঙ্গে যুক্ত হইবে; আবার অন্য পদার্থ দিলে হয়তো লৌহকে ছাড়িয়া তাহাতে গেল।

রাসায়নিক ক্রিয়ার এই কৌশল দ্বারা কোন এক বস্তুতে কি কি পদার্থ আছে তাহা আমরা জানিতে পারি। যেমন হিঙ্গুল বস্তুতে কি কি পদার্থ আছে, যদি আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে আমরা পৃথক করিতে চেষ্টা করিব; চেষ্টা করিতে করিতে হিঙ্গুলের সঙ্গে লৌহ দিয়া জ্বাল দিলাম; দিলেই গন্ধকের সঙ্গে লৌহ মিশিয়া এক পদার্থ হইয়া গেল, পারা স্বতন্ত্র হইয়া গেল—

জানা গেল যে হিঙ্গুলে পারা ছিল। সেই পারা পৃথক রাখিয়া দিলাম। এখন দেখিব হিঙ্গুল হইতে পৃথক হইয়া কোন্ পদার্থ আমার প্রদত্ত লৌহের সঙ্গে সংযুক্ত হইল। এই জন্য এমন কিছু পদার্থ তাহাতে দিতে হইবে যাহার সঙ্গে লৌহের অধিক যোগাবনতি; তাহা হইলে লৌহ ও সেই পদার্থ মিলিয়া যাইবে ও গন্ধক স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে। তখন সেই পারা ও গন্ধক ওজন করিয়া বুঝিতে পারিব যে এত পরিমাণ পারা ও এত পরিমাণ গন্ধক মিলিয়া এত পরিমাণ হিঙ্গুল হয়।

মনে কর, পারার সঙ্গে তামা দিলাম। এই দুইটা একত্র ঘুঁটিলেও মিলিত হয়, জ্বাল দিলেও মিলিত হইয়া আর এক পদার্থ হয়। আমাদের দেখিতে হইবে, পারা ও তামার মধ্যে যে যোগাবনতি আছে তদপেক্ষা ঐ দুইয়ের এক পদার্থের সঙ্গে অন্য কোন পদার্থের যোগাবনতি অধিক আছে কি না। পারায় ও তামায় যে যোগাবনতি তদপেক্ষা হরীতেনর (ক্লোরীন) সঙ্গে তামার অধিক যোগাবনতি; এই জন্য হরীতন যোগ করিলে হরীতনজারিত তাম্র (কপরিক্ ক্লোরাইড) হইবে ও পারা পৃথক হইয়া পড়িবে।

কোন যৌগিক পদার্থের মধ্য হইতে যে পদার্থ পৃথক করিতে চাই, হয় এমন কোন পদার্থ দিতে হইবে যে পদার্থের সঙ্গে তাহা যুক্ত হইয়া পৃথক হইয়া পড়িবে; তাহার পরে ঐ যুক্ত বস্তু হইতে আবার কোন পদার্থ দ্বারা, যাহা আমরা চাই তাহাকে পৃথক করিয়া দিতে হইবে; অথবা একেবারেই এমন কোন বস্তু দিতে হইবে যে, যে বস্তু আমরা চাই তাহার সঙ্গে সেই বস্তুর তত যোগাবনতি নাই যত অন্য অংশের সহিত তাহার যোগাবনতি আছে।

যেমন, হরীতন ও তামাতে মিলিয়া যে হরীতনজারিত তাম্র হয়, তাহা হইতে আমরা যদি তামাকে পৃথক করিতে চাহি তাহা হইলে আমরা তাহাতে উদজান দিলাম, তামাকে ছাড়িয়া দিয়া যাহার সঙ্গে হরীতন মিলিয়া হরিতোদম্ল (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) প্রস্তুত করিল ও তামা পৃথক হইয়া পড়িল। প্রথম তামার সঙ্গে হরীতন যোগে যে বস্তু ছিল তাহার নাম যদি খ হয়, আর শেষ কালে ঐ হরীতন উদজানের সঙ্গে মিলিয়া যে বস্তু হইল তাহার নাম যদি গ হয়, আর পারা হইতে যে তামা স্বতন্ত্র হইয়াছিল তাহা যদি ক হয়—প্রথমে দেখিলাম কএর এত পরিমাণ ওজন ছিল; খ হইলে এত পরিমাণ ওজন বেশী হইল, সুতরাং যেটা বেশী হইতেছে তাহা হরীতনের ওজন; আবার যদি এই পরিমাণ হরীতন কতে যোগ করিয়া ঠিক খ-কে প্রস্তুত করিতে পারি, তবেই পরীক্ষা একেবারে ঠিক হইল, রাসায়নিক আকর্ষণকে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।

কঠিন পদার্থের সহিত কঠিন পদার্থের যোগাকর্ষণ ভাল হয় না, রাসায়নিক আকর্ষণও ভাল হয় না, যেহেতু পরমাণু সকল কাছাকাছি হইতে পারে না। এই জন্য অনেক সময়ে পদার্থকে তরল করিতে হয়, কখন কখন খুব গুঁড়া করিলেও কাজ চলে। তরল করিলে তবে যে যে পরমাণুর বা রেণুর যে যে পরমাণুর বা রেণুর সঙ্গে যোগাবনতি আছে তাহাকে খুঁজিয়া লইতে পারে। যেমন, এই একটী ক অণু সকল মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে;

খ-তে গেল মিশিল না, গ-তে গেল মিশিল না; যেই এমন কোন অণুর নিকটে গেল যাহার সঙ্গে উহার পরিচয় বা যোগাবনতি আছে (যেমন চ) তাহার সঙ্গে মিলিয়া গেল; খ হয়তো দুই পরমাণু না হইলে মিলিতে পারে না, তাই সে হয়তো ঠ ও ডর সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গেল। যাহার সঙ্গে মিল হইল না তাহার সঙ্গে বিকর্ষণ হয় তাহা পরে বলিতেছি।

যোগাকর্ষণ রাসায়নিক আকর্ষণের ন্যায় এমন করিয়া বাছে না কিন্তু তাহার বেলায়ও পরমাণুর পরস্পর সংলগ্ন হওয়া চাই, ভিতরে প্রবেশ করা চাই। রাসায়নিক আকর্ষণ অণুতে অণুতে অত্যন্ত যোগাকর্ষণ। প্রকৃত আকর্ষণই সেই পারমাণবীয় অথবা রেণবীয় আকর্ষণ। রাসায়নিক আকর্ষণের কম পরিমাণের আকর্ষণ যোগাকর্ষণ। এই পদার্থের ভিতর নানা অণূ রহিয়াছে যথা কখগঘঙ।

গ ক
ঘ খ
ঙ

ইহারা যদি পরস্পর বাছিয়া মিলিতে পারে তাহা হইলে রাসায়নিক আকর্ষণ হইল; যেমন ক খ-তে গেল, গতে গেল, শেষকালে ঘতে গিয়া মিলিয়া গেল; যোগাকর্ষণে ক, গতে আসিত, তাহা না হইয়া ঘতে আসিয়াই রহিয়া গেল। এক পরমাণু যদি অন্য প্রিয় পরমাণুকে দেখিতে পায় তবেই রাসায়নিক আকর্ষণ হইল, নচেৎ অন্য স্থানে পড়িয়া তদপেক্ষা ন্যূনাকর্ষণ যে যোগাকর্ষণ, তদ্দারাই আকৃষ্ট হইয়া রহিল। যখন যোগাকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল হয় তখনি রাসায়নিক আকর্ষণে পরিণত হয়। যেমন, উদজান ও অম্লজান পাঁচ দিন বোতলে পূরিয়া রাখ, যুক্ত হইবে না; তাহাদের মধ্যে যোগাকর্ষণ প্রবল করিতে পারিলে জল হইয়া পড়িবে। আমার বোধ হয় যে উদজান ও অম্লজান মরুৎরূপে থাকাতে মরুতের গুণানুযায়ী তাহাদের পরমাণু পরস্পর হইতে দূরে থাকে সুতরাং তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে না; তড়িৎ প্রয়োগ করাতে পরমাণু সকল আকৃষ্ট হইয়া নিকটবর্ত্তী হওয়াতে পরমাণুর যোগাবনতি অনুসারে রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইবার অবকাশ পাওয়া যায়। যোগাকর্ষণে গুণের পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়াছিলাম কিন্তু ঠিক তাহা নহে—যেমন চিঁড়েতে গুড়েতে মাখিয়া খাইলে আর এক রকম আস্বাদন হয় বটে কিন্তু দুইয়েরই আস্বাদন চেনা যায়, ইহাও সেইরূপ। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে রাসায়নিক আকর্ষণের ন্যূনপরিমাণ আকর্ষণ যোগাকর্ষণ।

মাধ্যাকর্ষণও যোগাকর্ষণের রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। যোগাকর্ষণ নিকটে নিকটে আকর্ষণ করে, মাধ্যাকর্ষণ দূরে দূরে আকর্ষণ করে। নিকটে নিকটে আকর্ষণ প্রবল হইবে, দূরে দূরে আকর্ষণ কম হইবে। সেই আকর্ষণ কমবেশী হইবার আকার নিয়ম আছে। দুইটী প্রধান নিয়ম এই যে (১) এক পদার্থ অপর পদার্থকে অণুসমষ্টির সমানুপাতে আকর্ষণ করে (২) এক পরমাণু অপর পরমাণুকে দূরত্বের বর্গের বিষমানুপাতে আকর্ষণ করে। যেমন এক ইঞ্চি ঘন পরিমিত তুলাতে যদি ১০টী পরমাণু থাকে ও একইঞ্চি ঘনপরিমিত লৌহে যদি ৪০টী পরমাণু থাকে তাহা হইলে ধরা যাউক যে ঐ লৌহ খণ্ড ঐ তুলাখণ্ডকে চারিসের বলে টানিতেছে; কিন্তু যদি ঐ এক ইঞ্চি ঘনপরিমাণের ভিতর ৪০ পরমাণু লৌহের পরিবর্ত্তে ২০ পরমাণু লৌহ রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ লৌহখণ্ড আর ঐ তুলাখণ্ডকে

চারিসের বলে না টানিয়া দুইসের বলে আকর্ষণ করিবে। আবার, দুইটী পরমাণু এক হাত দূরে থাকিয়া যদি একসের বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, সেই পরমাণুদ্বয় যখন দুই হাত দূরে যাইবে তখন পরস্পরকে $\frac{১}{২^{২}}$ বা $\frac{১}{৪}$ সের অথবা এক পোয়া বলে আকর্ষণে করিবে; এইরূপ তাহারা তিনহাত দূরে থাকিলে $\frac{১}{৩^{২}}$ বা $\frac{১}{৯}$ সের অথবা একসেরের নয় ভাগের একভাগ মাত্র বলে আকর্ষণ করিবে ইত্যাদি।

পৃথিবীর আকর্ষণ এখানকার সকল বস্তুকে টানিয়া রাখিয়াছে। এই আকর্ষণ যদি অনেক দূরে কার্য্য করে, তবে ইহার গুরুত্ব কমিয়া যাইবে। এমন পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যাহার ভার এখানে পাঁচ সের, খুব উচ্চ পর্ব্বতের উপর লইয়া গেলে তাহার ভার কমিয়া যায়—আকর্ষণের গুরুত্ব অনুসারেই দ্রব্যের ভার হয়। এই আকর্ষণের বল কম হওয়াতেই উল্কাখণ্ড সকল প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইয়া এক লোকের আকর্ষণ ছাড়াইয়া অন্য লোকে পতিত হয়; কত উল্কা অন্য লোক হইতে ধাবিত হইতেই পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে পতিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়।

পারমাণব আকর্ষণ যোগাকর্ষণেতেও রহিয়াছে, মাধ্যাকর্ষণেতেও রহিয়াছে, রাসায়নিক আকর্ষণেতেও রহিয়াছে—রাসায়নিক আকর্ষণেতেই সম্পূর্ণরূপে রহিয়াছে। একই আকর্ষণ ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, এই জন্য ভিন্ন নামে খ্যাত হইয়াছে। ঈশ্বর অণুকে সৃষ্টি করিয়া যেমন আকার দিয়াছেন তেমনি মিলিত হইবার শক্তিও দিয়াছেন। সেই শক্তি দ্বারা যেখানে যে অণু থাকুক না কেন, ক্রমে মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা একত্রিত হইয়া, যোগাকর্ষণ ও রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা একই ভাব ধারণ করিতে করিতে প্রথমে উল্কাখণ্ড হয়, উল্কাখণ্ড হইতে হইতেই বৃহদায়তন পৃথিবীরূপে পরিণত হয়। ধূমকেতুর পুচ্ছ বলিয়া যাহা আমাদের নয়নগোচর হয় তাহা হয়তো পরমাণুরাশি, ধূমকেতুর তারকার মাধ্যাকর্ষণের বলে আকৃষ্ট থাকিয়া উহার সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করে; ক্রমে হয়তো তাহারা উহার সহিত সংলগ্ন হইয়া তারকার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া জীবজন্তুর বাসস্থলের উপযুক্ত করিতে থাকিবে।

এই সকল হইতে পরমেশ্বরের কি মহতী জ্ঞানশক্তির পরিচয় হয়। একদিকে তিনি যেমন 'মহতোমহীয়ান্,' সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, অপর দিকে তিনি আবার অণু হইতে অণু হইয়া পরমাণুর মধ্যে বিরাজ করিয়া প্রতি পরমাণুকে চালাইতেছেন, যোগ করিতেছেন, বিয়োগ করিতেছেন এবং তাহার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের পরিপাটী রচনা করিতেছেন। যন্ত্রকর কিবা যন্ত্র প্রস্তুত করে, চিত্রকর কিবা চিত্র পটে সন্নিবেশ করে, ভাস্কর কিবা মূর্ত্তি গঠন করে, কবিরা কিবা কাব্য প্রণয়ন করে; তিনি এক এমনি আকর্ষণের নিয়ম করিয়া দিলেন যে তাহাতেই অনন্ত আকাশ জরির কার্য্যে খচিত হইয়া গেল; তাহার দ্বারাই নদ নদী, সমুদ্র পর্ব্বত, উদ্যান কানন, মেঘ বৃষ্টি, শিলা বরফ, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ড, সকলই রচিত হইতেছে, নিমেষের তরে বিরাম নাই। আদি কবির নিকট সকল কবি, সকল কারুকর পরাভব পায়।

রাসায়নিক আকর্ষণ কোন্ স্থলে খাটিতে পারে না—কঠিন বস্তু সকলে খাটিতে পারে না। অতএব রাসায়ন আকর্ষণকে সম্পূর্ণরূপে খাটিতে দিলে যোগাকর্ষণকে প্রথম কম করিয়া পরমাণুদিগকে

শিথিল করিতে হয়, যাহাতে উহারা ইচ্ছা-মত আপনার আপনার অংশীদারকে খুঁজিয়া লইতে পারে।

রাসায়নিক আকর্ষণের একটা প্রতিবন্ধক পরমাণুর দূরতা। মরুৎ অবস্থায় পরমাণু সকল পরস্পর হইতে দূরে থাকে; তখন উপায় করিয়া তাহাদের মধ্যে যোগাকর্ষণ বর্দ্ধন করিতে হয়।

তাহার আরও একটা প্রতিবন্ধক পরমাণুর বিকর্ষণ। পরমাণু সকল মিলিত হইবার ইচ্ছা হইলেই মিলিত হইতে যায় কিন্তু মিলিত হইলেই পৃথক হইতে চাহে। যেমন, রেশমের কাপড় দিয়া কাচকে ঘসিলে, তাহার পরে তাহার নিকট যদি একটী ক্ষুদ্র পালক ধরা যায়, প্রথমে তাহা আকৃষ্ট হয় কিন্তু যেই কাচকে ছুঁইল অমনি আবার দূরে সরিয়া যায়। তেমনি যে আকর্ষণ দ্বারা দুই রেণু যুক্ত হইল, তাহাদের মধ্যে যদি বিকর্ষণ প্রকাশ হয় তাহা হইলে তাহারা আর মিলিতে পারে না; বিকর্ষণ অপেক্ষা আকর্ষণ অধিক থাকিলেই মিলিতে পারে। যদি বিকর্ষণ 'বি' হয় ও আকর্ষণ 'আ' হয় এবং আ যদি ৫ হয় ও বি যদি ৫ হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে দেখাদেখি হইয়া যে যেখানে আছে সে সেইখানেই থাকিয়া গেল, মিলিতেও হইল না এবং তাড়িতও হইল না। যদি আ ৫ হয় ও বি ৩ হয়, তাহা হইলে এই অতিরিক্ত আকর্ষণ যে ২, এই ২এর দ্বারা তাহারা মিলিয়া থাকিবে; অতিরিক্ত আকর্ষণ যাহার ৪, সে আরো মিশিয়া থাকিবে।

বিকর্ষণ বাঁদ দিয়া আকর্ষণের প্রবলতা অনুসারে পদার্থ কঠিন, তরল বা মরুৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিকর্ষণ শক্তি অধিক থাকিলে পরমাণু সকল কাছাকাছি হইতে পারে না। তাপ বিকর্ষণের প্রধান কারণ। আকর্ষণের দ্বারা দুই পদার্থ সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহাতে তাপ প্রয়োগ করিলে বিকর্ষণ বাড়িয়া গেল; দুই পদার্থ পৃথক হইয়া গেল। তাপহীনতায় আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

সকল বস্তুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুই শক্তি আছে, তাহাতেই পদার্থ সকলের যোগবিযোগ হয়। তাপ ও তড়িৎ আলোচনার সময় দেখিবে যে অণু সকলের ভিতরে তড়িৎ থাকে বলিয়াই আকর্ষণ হয় এবং তাপ থাকে বলিয়াই বিকর্ষণ হয়। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অণুর কার্য্য নহে; অণুর সহিত তাপ ও তড়িৎ রূপ যে শক্তি আছে তাহাতেই আকর্ষণ বিকর্ষণ হইতেছে।

জড়পদার্থের তবে সাধারণ গুণ হইল (১) অণুসমষ্টি, (২) বিস্তৃতি ও আকৃতি এবং (৩) আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকে আর আর অনেক সাধারণ গুণের উল্লেখ থাকে, যথা, বিভাজ্যতা, সচ্ছিদ্রতা, স্থিতিস্থাপকতা, নিশ্চেষ্টতা ইত্যাদি। কিন্তু ইহাদিগকে সাধারণ গুণ বলা ঠিক নহে, ইহারা সকলে অভাব গুণ।

আত্মার প্রতিষ্ঠা।

(গত ১ অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদী হইতে উদ্ধৃত)

উপনিষদে আছে,—

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হবৈ তৎ সর্ব্বং পরআত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে।২

"হে প্রিয়! যেমন পক্ষীসকল তাহাদিগের বাসস্থান বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সকলই পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে।

বৃক্ষ এবং পক্ষী এই উভয়ের সঙ্গে পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহারা উভয়ে উভয়ের উপযোগী। পক্ষীকে এমন করিয়া বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সে বৃক্ষে বসিবার উপযুক্ত, বৃক্ষকে এরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সে পক্ষীকে নিজ দেহে স্থান দিবার উপযুক্ত। পক্ষীর পা দুখানি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, সে বৃক্ষে বসিয়া থাকিতেই আরাম পায়; আবার বৃক্ষের শাখা প্রশাখা এমনি যে পক্ষী তাহাতে বসিয়া সুখী হয়। বৃক্ষ দেখিলে মনে হয় যেন পক্ষীকে বসাইবার জন্যই বৃক্ষের সৃষ্টি। পক্ষী ও বৃক্ষের সহিত এমন নিকট সম্বন্ধ যে, উভয়ের মধ্যে একটী দেখিলে অপরটীকে মনে হয়।

বৃক্ষই পক্ষীর নিরাপদ স্থান। তুমি তাহাকে ভয় দেখাইলে সে অমনি বৃক্ষে গিয়া বসিবে। ভয়ঙ্কর বৃষ্টিপাত হইলে, ঝঞ্চাবাতে বাড়ী ঘর ভূপতিত হইতে থাকিলে, পক্ষী বৃক্ষকেই আশ্রয় করে। আবার যখন প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে পৃথিবী জ্বলন্ত অনলের ন্যায় উত্তপ্ত হয়, তখন পক্ষী পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করে।

আত্মা ও পরমাত্মার সহিত ঐ প্রকার নিগূঢ় সম্বন্ধ। এই উভয়ের মধ্যে যে সম্মিলন, যোগ, তাহা স্বাভাবিক। পক্ষীকে দেখিলে বৃক্ষকে এবং বৃক্ষকে দেখিলে পক্ষীকে যেমন মনে হয়, তেমনি আত্মাকে দেখিলে পরমাত্মাকে মনে হয় এবং পরমাত্মাকে দর্শন করিলে তাঁহার আশ্রিত জীবকে স্মরণ হয়। উভয়ের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। বৃক্ষ যেমন পক্ষীর পক্ষে নিরাপদ ও আশ্রয়স্থান, আত্মার পক্ষে পরমাত্মা তেমনই আশ্রয়ভূমি, ও নিরাপদভূমি। যতক্ষণ মানব ঈশ্বরকে আশ্রয় না করে, ততক্ষণ সে নিরাপদ অবস্থা লাভ করে না। পক্ষী যেমন সূর্য্যকিরণে সন্তাপিত হইলে শান্তির জন্য বৃক্ষকে অবলম্বন করে, মানবও তেমনি সংসার রৌদ্রে তাপিত ও তৃষিত হইয়া শান্তি স্বরূপ ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি দাতা, আমরা গৃহীতা। তিনি প্রেম দিতেছেন, আমরা গ্রহণ করিতেছি; আমাদের প্রার্থনা তাঁহাতে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে। এ যোগই স্বাভাবিক যোগ। অতএব আমাদের মন সংসারের পাপ তাপে জর্জ্জরিত হইলে তাঁহার চরণ আশ্রয় করিতে ইচ্ছুক কি না ইহাই অনুসন্ধানের বিষয়। পক্ষী ভয়ে, বিপদে যেমন স্বতঃই আশ্রয়বৃক্ষের দিকে যায়, তেমনি আমাদের মন ভয়ে, বিপদে স্বতঃই পরমাশ্রয় পরমেশ্বরের দিকে যায় কি না ইহাই দ্রষ্টব্য।

—০—

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

চতুর্থ প্রস্তাব।

বালকাণ্ডের পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম সর্গ অযোধ্যা নগরীর ও রাজা দশরথের শৌর্য্য বীর্য্যের বর্ণনায় পর্য্যবসিত। অষ্টম সর্গের প্রথমেই ক্ষিন্নমনা অপুত্রক রাজা দশরথের ছবি। রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াও তাঁহার মনে শান্তি নাই আরাম নাই। তিনি মনে করিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে পুত্রমুখ সন্দর্শনে সমর্থ হইব। সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণের সংকল্প স্থিরীকৃত হইল। সুপটুপুরুষরক্ষিত অশ্ব বিমোচনের আদেশ দিয়া ও শান্তিকর্ম্ম অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থা করিয়া রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রিগণ

বিদায় গ্রহণ করিল। সুমন্ত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য-সম্ভার আহরণে ও যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল।

নবম দশম একাদশ দ্বাদশ, এই কয়েকটি সর্গ লইয়া আমাদিগকে একটু গোলযোগে পড়িতে হইবে। এই কয়েকটি সর্গ যে মূল রামায়ণের অন্তর্গত নহে তাহা সহজেই প্রতীত হয়। মহর্ষি বাল্মীকি যে ইহাদের রচয়িতা নহেন তাহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী কোন লেখক এই কয়েক সর্গ মূল রামায়ণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ আদৌ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাকবি বাল্মীকি মহর্ষি নারদমুখে রামচরিত্রের আভাস পান। পরিশেষে ভগবান ব্রহ্মার নিকট বর লাভান্তে যোগবলে রামচরিত্রের গূঢ়তম রহস্যও তাঁহার নিকটে প্রত্যক্ষ হয়। যে দিব্য আলোকে কবির চক্ষু জ্যোতিষ্মান হইল আমরা মনে করিয়াছিলাম তাহার উপরে বাহিরের আলোকের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু এই চারি সর্গের ভিতরে যাহা দেখিতে পাই তাহা নিতান্তই নিরাশাজনক।

নবম সর্গে আছে রাজা দশরথ পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছেন দেখিয়া, সারথি সুমন্ত্র নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিল, আপনার পুত্রোৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। দেবযুগ অর্থাৎ সত্যযুগে সনৎকুমার ঋষিগণ সন্নিধানে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন, মহর্ষি কাশ্যপের বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছে, ঋষ্যশৃঙ্গ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিবে। তিনি মুখ্য ও গৌণ এই দুই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। এই অবসরে অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের রাজ্যে সর্ব্বলোকভয়াবহ ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইবে। বিপ্রগণ শান্তিকর্ম্মের উদ্দেশে লোমপাদ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে কহিবেন মহারাজ,ঋষ্যশৃঙ্গকে যে কোন উপায়ে রাজ্য মধ্যে আনয়ন করুন এবং স্বীয় কন্যা শান্তার সহিত তাঁহার বিবাহ দিন। রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্য মধ্যে আনয়ন চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিবেন। এবং বেশ্যা সাহায্যে তাঁহাকে রাজ্য মধ্যে আনয়ন করিবেন এবং স্বীয় দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন। তাঁহার শুভ আগমনে রাজ্যমধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি নিপতিত হইবে। সনৎকুমার বলেন এই ঋষ্যশৃঙ্গই আপনার সন্তান কামনা পূর্ণ করিবেন।

দশরথ জিজ্ঞাসা করিলেন সুমন্ত্র! কি উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিলেন। সারথি তদুত্তরে জঘন্য কৌশলের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা আরম্ভ করিল। ইহাতেই দশম সর্গ পর্য্যবসিত হইল।

সুমন্ত্রকথিত সনৎকুমারের ভবিষ্যদ্বাণী এখানেই পর্য্যবসিত হইল না। সুমন্ত্র বলিল সনৎকুমার আরও বলিয়াছেন দশরথ নামে ইক্ষ্বাকুবংশে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহাঁর সহিত লোমপাদের বন্ধুত্ব জন্মিবে। ঋষ্যশৃঙ্গ লোমপাদের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। রাজা দশরথ লোমপাদের নিকট গমন করিয়া বলিবেন আমি নিঃসন্তান, এই কারণে যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করিয়াছি। আপনার জামাতা সেই পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ব্রতী হউন। এইরূপে দশরথ লোমপাদের সম্মতিক্রমে ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্য মধ্যে আনয়ন করিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাঁহাকে বরণ করিবেন। এবং যজ্ঞফলে রাজার চারিটি পুত্র জন্মিবে।

ইহা শুনিয়া রাজা দশরথ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নার্থ স্বয়ং অঙ্গদেশে গমন করিলেন, এবং লোমপাদের সহিত সৌহার্দ্য বিনিময়ান্তে সস্ত্রীক ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে দ্বাদশ-সর্গ। এই সর্গে রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি সন্তান কামনায় ঋষ্যশৃঙ্গকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন দ্রব্য সামগ্রী আহরণ অশ্বমোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। রাজা, ঋষ্যশৃঙ্গের নির্দেশানুসারে সুযজ্ঞ, জাবালি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন আমি পুত্রকামনায় এই ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের সাহায্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিব স্থির করিয়াছি। তৎশ্রবণে বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন যে অবিলম্বে যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রী আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। অন্যান্য যে সকল কথা চলিল তাহা অষ্টমসর্গের কয়েকটি শ্লোকের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

এই অষ্টম সর্গের শ্লোকসংখ্যা ২৫টি ও দ্বাদশসর্গের শ্লোকসংখ্যা ২২মাত্র। এই দুই সর্গ মিলাইয়া পাঠ করিলেই প্রতীত হইবে যে কোন লেখকের হস্তে এতাদৃশ পুনরুল্লেখ আদৌ সম্ভবিতে পারে না। আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে অষ্টম সর্গের সহিত দ্বাদশ স্বর্গের যে কয়েক শ্লোকের অবিকল মিল আছে তাহার তালিকা দিতেছি।

৫ শ্লোক	১ম চরণ	৬ শ্লোক	২য় চরণ
৬ „	২ „	৫ম „	ঐ
৭ম „	১ম „	৭ম „	ঐ
৮ম „	২য় „	৯ম „	১ ম
৯ম „	১ম „	৯ম „	২ য়
১০ম „	১ম „	১০ম „	২ য়
১০ম „	২য় „	১১শ „	১ ম
১১শ „	২য় „	১২শ „	১ ম
১২শ „	১ম „	১২শ „	২ য়
*১৩শ „	১ম „	১৩শ „	২ য়
১৩শ „	১ম „	১৪শ „	১ ম
১৫শ „	১ম „	১৫শ „	২ য়
১৫শ „	২য় „	১৬শ „	১ ম
১৬শ „	১ম „	১৬শ „	২ য়
১৬শ „	২য় „	১৭শ „	১ ম
১৭শ „	১ম „	১৭শ „	২ য়
*১৭শ „	২য় „	১৮শ „	১ ম
১৮শ „	১ম „	১৮শ „	২ য়
১৮শ „	২য় „	১৯শ „	১ ম
*১৯শ „	১ম „	১৯শ „	২ য়
*১৯শ „	২য়	২০শ „	১ ম
২০শ „	১ম	২১শ „	২ য়
২৩শ „	১ম	২২শ „	২ য়

* চিহ্নিত চরণ গুলিতে সামান্য দুইএকটি কথার তারতম্য আছে। নবম হইতে দ্বাদশ সর্গ যে প্রক্ষিপ্ত তাহা বলিবার এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম, ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন বৃত্তান্তের সহিত মূলবিষয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ নাই। দ্বিতীয়, বাল্মীকি ইচ্ছা করিলে ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন বৃত্তান্ত নিজেই বলিতে পারিতেন, পুরাণের দোহাই দিতেন না। তৃতীয়, বশিষ্ঠাদি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বর্ত্তমানে সুমন্ত্রের মুখ দিয়া পুরাণের কাহিনী দশরথের নিকট নির্জ্জনে উল্লেখ যুক্তিযুক্ত ও সম্ভবপর হইতে পারে না। চতুর্থ, লোমপাদের নিকট গিয়া দশরথের প্রার্থনা অরাজোচিত ও দীনতা-জ্ঞাপক; এরূপ হীনতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পক্ষে সাজিতে পারে, রাজার পক্ষে নহে। দশরথ ইচ্ছা করিলে অন্য লোকের সাহায্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজরাজ্যে আনিতে পারিতেন; বিশেষত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় দশরথ সুমন্ত্র দ্বারাই লোমপাদকে যজ্ঞক্ষেত্রে আহ্বান করিযা আনিয়াছিলেন। পঞ্চম, পাঠকবর্গের স্মরণ রাখা উচিত যে রামায়ণ, মহর্ষি বাল্মীকির অসামান্য প্রতিভার ফল। যে যে উপায়ে আলোচ্য বিষয়টীকে পরম প্রীতিকর করা যাইতে পরে, কবিকুলচূড়ামণির তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সুমন্ত্রকথিত পৌরাণিক কাহিনীতে যদি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিলাম যে যজ্ঞফলে রাজা দশরথের চারিটি পুত্র হইবে

তবে দশরথের উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার মর্ম্মে প্রবেশ ও তাঁহার সহিত সমবেদনা করিবার অবসর কোথায় রহিল। এই কয়েক সর্গে রাজা দশরথ অশ্বমেধ বা পুত্রেষ্টি কোন্ যজ্ঞে যে ঋষ্যশৃঙ্গকে বরণ করিলেন তাহার স্থিরতা নাই। পূর্ব্বাপর ধরিলে অবশ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই কয়েক সর্গে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গকে বরণ করা হইল এরূপ উল্লেখও আছে। এবং ইহারও যে বিশিষ্ট কারণ আছে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। ফলতঃ এইরূপ উল্লেখ করিয়া প্রক্ষেপকার ভবিষ্যতে আরও কিছু প্রক্ষেপ করিবার পথ প্রমুক্ত করিয়া রাখিলেন।

অষ্টম সর্গ পাঠান্তে একেবারে ত্রয়োদশ সর্গ পাঠ করিলে মধ্যবর্ত্তী কয়েকটী সর্গের অভাব আদৌ অনুভূত হয় না। অশ্ববিমোচনের পূর্ণ একবর্ষ অন্তে অশ্বমেধ যজ্ঞ উদযাপনের প্রকৃষ্ট সময়। যজ্ঞভূমি বিনির্ম্মিত হইল। দেশবিদেশস্থ রাজগণ আমন্ত্রিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বপরিত্যক্ত অশ্ব প্রত্যাগত হইলে সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বেদপারগ বিপ্রগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গাদি মহর্ষিগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণে ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহাযজ্ঞ যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন মহারাজ, আপনার পুত্রচতুষ্টয় অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। এই মধুর আশ্বাসে দশরথ পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। চতুর্দ্দশ সর্গ শেষ হইয়া গেল।

পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গ লইয়া আমাদিগকে আবার বিড়ম্বনায় পড়িতে হইল। এই কয়েকটি সর্গ আমাদের মতে মূল রামায়ণের অন্তর্গত নহে। আমরা এই কয়েকটি সর্গের মর্ম্ম সংক্ষেপে বলিয়া তৎসহ আমাদের আপত্তির কারণ দর্শাইব। আমরা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়া আসিতেছি যে, পুত্রকামনায় মহারাজ দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের সূচনা। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন যাহাতে আমার বংশলোপ না হয় আপনি তাহার উপায় করুন। ঋষি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন আমি আপনার পুত্রার্থ পুত্রেষ্টি যাগের অনুষ্ঠান করিব। পরশ্লোকেই যজ্ঞ আরম্ভ হইল। দেবতা সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ নিজ নিজ ভাগ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলেন। পর শ্লোকেই দেবলোকে সুরগণ সমবেত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, রাবণ বীর্য্যমদে মুগ্ধ হইয়া আমাদের উপর অত্যাচার করিতেছে, আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না। আপনার বরে সে দেবদানবের অবধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যদেব ইহাকে উত্তাপ প্রদান ও সমীরণ ইহার পার্শ্বে সঞ্চরণ করে না। তরঙ্গমালাসঙ্কুল মহাসমুদ্র ইহাকে দেখিয়া নিস্পন্দ হইয়া যায়।* ব্রহ্মা বলিলেন মনুষ্য ভিন্ন অপর কাহারও হস্তে তাহার মৃত্যু ঘটিবে না। এমন সময়ে পীতাম্বর হরি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অমরগণ তাঁহার স্তব আরম্ভ করিয়া দিলেন। চারি অংশে বিভক্ত হইয়া দশরথের তিন মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণান্তে মনুষ্যরূপে অবধ্য রাবণকে সমরে সংহার করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা চলিতে লাগিল। দেবদেব বিষ্ণু পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ষোড়শ সর্গে বিষ্ণু দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সুরসমাজ হইতে অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে রাজা দশরথের যজ্ঞীয় হুতাশন

* কবিত্ব বুঝিতে না পারিয়াই হউক ও অন্য যে কোন কারণে হউক কৃত্তিবাসের হস্তে এই স্থল কিরূপ এড়াইয়াছে তাহা উদ্ধৃত হইল।

সূর্য্যের উদয় নাই পৃথিবী ভিতর।
... ...
মন্দ মন্দ বাতাস তারে করেন পবন।
... ...
শুনিলে যমের কথা হইবেন হাস।
কাটিয়া আনেন তার ঘোটকের ঘাস।
... ...
রাবণ সমুদ্র বলি লাগিল ডাকিতে।
আসিয়া সমুদ্র দাঁড়াইল যোড়হাতে।

হইতে রক্তাম্বরধারী এক মহাপুরুষ দিব্য-পায়সপূর্ণ প্রশস্ত পাত্র হস্তে উত্থিত হইয়া দশরথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অদ্য আপনি দেবারাধনায় এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। ইহা অনুরূপ পত্নীগণকে ভোজন করিতে দিন। এই বলিয়া স্বকার্য্য সাধনান্তে তিনি অগ্নিকুণ্ডে অন্তর্ধান করিলেন। তিন মহিষীই পায়সভক্ষণে অন্তর্ব্বত্নী হইলেন।

সপ্তদশ সর্গে দেবগণ বানররূপী পুত্রসকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কামরূপী অমিততেজা বীরসকল উৎপন্ন হইয়া কেহ বা ঋক্ষবান পর্ব্বতে কেহ বা ভীষণ অরণ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ সর্গের প্রথমেই আছে অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে অমরগণ নিজনিজ ভাগ গ্রহণ করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। মহীপালও মহিষীগণের সহিত পুরপ্রবেশের উপক্রম করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ পূজিত হইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা পুরপ্রবেশ করিলে ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার সহিত সৎকৃত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এইরূপে সকলকে বিদায় দিয়া রাজা পুত্রোৎপত্তি অপেক্ষায় সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। আমরা যে যে কারণে ১৫শ, ১৬শ, ১৭শ, সর্গকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেছি তাহা এই—প্রথম, ইহার সহিত মূল প্রবন্ধের বিশেষ সম্বন্ধ নাই, দ্বিতীয় চতুর্দ্দশ সর্গে অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পরে একেবারে অষ্টাদশ সর্গ উদ্ঘাটন করিলেই দেখিতে পাই অশ্বমেধের পরে কি ঘটিল তাহা বর্ণিত আছে। তৃতীয়, অশ্বমেধের ফল পুত্রলাভ, তাহার পরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিশেষ আবশ্যকতা দেখি না। থাকিলে ও পুত্রেষ্টির ন্যায় প্রয়োজনীয় যজ্ঞ বাস্তবিক অনুষ্ঠিত হইলে অষ্টাদশ সর্গে তাহার পরিচয় থাকিত। বরং অষ্টাদশ সর্গে আছে অশ্বমেধের অন্তে রাজা সপরিবারে পুরপ্রবেশ করিলেন ও রাজগণকে বিদায় দিলেন, শেষে ঋষ্যশৃঙ্গও চলিয়া গেলেন। চতুর্থ পুত্রেষ্টি যজ্ঞের যেমনই প্রস্তাব হইল, অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত হইল, অমনি দেবলোকে সভা বসিল। ইহাতে যেরূপ তাড়াতাড়ি দৃষ্ট হয় তাহাতে রামচন্দ্রের অবতারত্ব স্থাপনই যেন এই তিন সর্গের উদ্দেশ্য। তাড়াতাড়ির আর এক কারণ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়, প্রক্ষেপকার বিশেষ বিরক্ত করিয়া লিখিলে পাছে পাঠকেরা বাল্মীকির সহিত তাঁহার রচনার পার্থক্য বুঝিতে পারেন এই জন্য যত শীঘ্র পারিয়াছেন আপনার বক্তব্য শেষ করিয়া লইয়াছেন। এমন কি সীতা যে যোগমায়া সে কথাও বলিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। ৫ম এই কয়েক সর্গের প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে শুদ্ধ যে আমাদের সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা নহে, টীকাকার অষ্টাদশ সর্গের প্রথম শ্লোকের টীকায় বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। মূলে আছে—

নিবৃত্তে তু ক্রতৌ তস্মিন্ হয়মেধে মহাত্মনঃ।
প্রতিগৃহ্যামরা ভাগান্ প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্॥"

টীকাকার বলেন "হয়মেধে" অর্থাৎ "পুত্রেষ্টিযুক্তে হয়মেধে" অর্থাৎ পুত্রেষ্টিযুক্ত অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে। বাস্তবিক এরূপ অর্থ ধরিলে বিষ্ণুর অবতারত্ব স্বীকারের ন্যায় যারপর নাই প্রয়োজনীয় ঘটনার উল্লেখ কোথায়।

৬ষ্ঠ বাল্মীকি নারদপ্রদর্শিত আদর্শ দেখিয়া আলেখ্য চিত্র করিতেছিলেন এবং প্রতিভাবলে আরও ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন। মূল আদর্শে বিষ্ণুর অবতারত্ব স্বীকার সম্বন্ধে যখন কিছুই নাই, তখন তাঁহার পক্ষে ও এ বিষয়ে নিরস্ত থাকাই সম্ভব।

বাল্মীকি নিজকৃত রামায়ণে রামচন্দ্রকে দেবতা বলিয়া পরিচয় দিতে বড়ই কুণ্ঠিত। সমগ্র সাতকাণ্ডে দুই এক স্থানে রামচন্দ্রকে দেবতা বলা হইয়াছে। রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বুঝিলে তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণকারের ন্যায় সূতিকাগৃহেই কৌশল্যা কর্ত্তৃক শিশু রামচন্দ্রের পূজার ব্যবস্থা

করিতেন।" (অধ্যাত্ম রামায়ণ ৭২—৮০ শ্লোক)।

[আমরা পণ্ডিত প্রবর শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত রামায়ণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইহা বোম্বাই ও কাশী হইতে প্রকাশিত বিশুদ্ধ পুস্তকের অনুসৃত। পাঠকদিগের নিকটে অনুরোধ তাঁহারা যেন মূল রামায়ণের সহিত এই প্রবন্ধ মিলাইয়া দেখেন।]

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৪৬৷৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১৩৮৴১৫
সমষ্টি	৩৩৮৪৸৶৫
ব্যয় ...	৭৪৸৵০
স্থিত ...	৩৩০৯৸৶৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৪০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৮১৬ শকের কার্ত্তিক মাসের দান	১৪০৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৭৸০
শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী কুণ্ডু দিনাজপুর	৫৲
" " ব্রজমোহন সাঁড়বা গোপীনাথপুর	৩৷৵০
" " চন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত সেওড়াফুলি	৩৷৵০
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, মেদিনীপুর	৩৷৵০
" " পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা	৸০
" " ব্রাহ্মসমাজ, ধর্ম্মপুর	৷৵০
শ্রীমতী ধর্ম্মদাসী দেবী শ্রীবাটী	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল মিত্র, লক্ষ্ণৌ	৵০
" " মণিলাল মল্লিক কলিকাতা	৩৲
" " হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, ঐ	৩৲
" " সুরেশচন্দ্র দত্ত ঐ	২৲
" " দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ঐ	১৲
" জয়গোপাল সেন, ঐ	১৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একখণ্ড নগদ বিক্রয়	৷৵০
	২৭৸০
পুস্তকালয়	৩৸০
যন্ত্রালয়	৬৬৷০
গচ্ছিত	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৪৷৷০
পুস্তক বিক্রয়ের কমিসন ..	৩৷৶১০
সমষ্টি	২৪৬৷৷৶১০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২২৷৴১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২১৷৷৶১৫
পুস্তকালয় ...	৯৲১০
যন্ত্রালয় ..	৭৷৴১৫
গচ্ছিত ...	১৪৵১০
সমষ্টি	৭৪৸৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

পঞ্চষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণেপ্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার সময় ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ভ্রম সংশোধন।

গতবার "ঈশ্বরের প্রতি প্রেমোক্তি" যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল যাহার শিরে "শ্রীযুক্ত গোসাঁইদাস সরকারের বিরচিত মানস নলিনী" কাব্য অবলম্বন করিয়া লিখিত" এই বাক্য ছিল মুদ্রাকর প্রমাদে তাহা ছাপা হয় নাই।
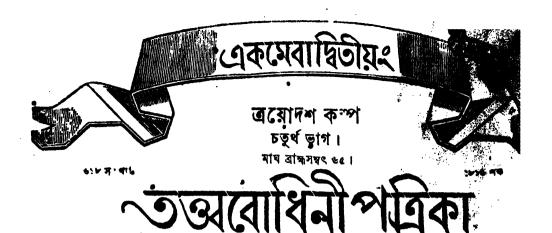
ত্রয়োদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৫।

৬১৮ সংখ্যা ১৮১৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

পঞ্চষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকালে ৮ঘটিকার সময় ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শান্তিনিকেতনে চতুর্থ বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব।

বীরভূমির সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, নির্ম্মল প্রভাতকাল, নানারূপ তরুরাজি বিরাজিত সুপ্রশস্ত উদ্যান, শীতের মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ু সমস্তই ব্রহ্মে মন সমাহিত করিবার অনুকূল। সর্ব্ব প্রথম ঘণ্টারব হইল। তখন সকলে ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মঙ্গল গীত গাহিতে গাহিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর সমস্ত প্রান্তর মুখরিত করিয়া শঙ্খধ্বনি হইল। মন্দির মধ্যে সুপ্রশস্ত ধূপাধারে সুগন্ধি ধূপ প্রধূমিত হইতে লাগিল। পরে আচার্য্যেরা বেদী গ্রহণ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নোক্ত প্রকারে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

আজ এই শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির উদার সদাব্রত উপভোগ কর। নগরের জনতায়, সংসারের কোলাহলে শান্তিজলের প্রত্যাশায় বৃথায়ই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ; এখন, এই পবিত্র স্থানে আসিয়া, পিপা-

[illegible] প্রচুর পরি- [illegible] ক সুশীতল [illegible] ন্দর কিরণে [illegible] র্য্যামী পরম [illegible] তির গম্ভীর [illegible] ও প্রকৃতির [illegible] র্শন কর এবং [illegible] লাহলে সেই [illegible] ময় পরমাত্মাকে

[illegible] মধ্যে, বহির্জ্জগতে [illegible] লে আমাদের পিপা- [illegible]। কেবল বহির্জ্জগতে [illegible] অভ্যাস করিলে ফল [illegible] খানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, [illegible] হান্ উদার ভাব দেখিতে [illegible] নেই প্রকৃতির নিয়ন্তা সেই [illegible] পরমপুরুষকে দেখিতে পা- ইব। কিন্তু অন্তর্জ্জগতে তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, আ-ত্মার আত্মা রূপে দেখিতে অভ্যাস করিলে ফল এই হইবে যে, যেখানেই থাকি না কেন এবং যে অবস্থাতেই থাকি না কেন— রোগের মধ্যে, আরোগ্যের মধ্যে, সুখের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, সম্পদের মধ্যে বিপ-দের মধ্যে—সকল স্থানে এবং সকল অব-স্থাতেই সেই শান্তিদাতা, জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণপতিকে দেখিতে থাকিব। অন্যত্র তাঁহাকে দেখা দূর করিয়া দেখা এবং আত্মাতে তাঁহাকে দেখা নিকট করিয়া দেখা এবং তাহাই প্রকৃষ্ট দর্শন। অত-এব আত্মাতেই তাঁহাকে বিশেষরূপে দে-খিতে চেষ্টা কর।

পরমাত্মা যেমন এই অসীম আকাশের মধ্যে মহতো মহীয়ান্ হইয়া বিরাজ করি-তেছেন, সেইরূপ এই শরীরমধ্যস্থিত আত্মার মধ্যেও অণোরণীয়ান্ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই আত্মাই সেই পর-মাত্মার প্রতিবিম্ব। ঈশ্বরের জ্ঞানের ছায়া আমরা আত্মার জ্ঞানে দেখিতে পাই; তাঁহার মঙ্গলভাবের ছায়া, তাঁহার প্রেমের ছায়া সকলই আমরা আত্মাতেই প্রতি-বিম্বিত দেখি। কিন্তু আমরা অতি ক্ষুদ্র জীব; আমরা ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ ধারণ করিতে পারি না। আমাদের আত্মাতে তাঁহার যতটুকু প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং আত্ম-জ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা প্র-ত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। আত্মজ্ঞান যত উজ্জ্বল হইবে, পরমাত্মজ্ঞানও ততই পরিস্ফুট হইবে। আত্মজ্ঞানই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিবার একইমাত্র উপায়। এই কারণে ঋষিরা আত্মাকে পরমাত্মার "হিরণ্ময় কোষ" বলিয়াছেন।

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥"

যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁ-হারা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

সূর্য্য যেমন জগৎকে প্রকাশিত করি-বার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও প্রকাশ করে, সেইরূপ আমাদের আত্মাতে যে সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য সকল নিহিত আছে, তাহা যেমন পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি সত্য সকল প্রকাশ করে, সেইরূপ আ-ত্মার অস্তিত্বও প্রকাশ করে। সহজজ্ঞান-বলেই আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। আত্মার সহজজ্ঞানের প্রতি আমা-দের সংশয় উপস্থিত হইলে কেবল আত্ম-জ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান কেন, কোন প্রকার জ্ঞানেরই ভিত্তি থাকিতে পারে না। ভার-

তের উন্নতমনা ঋষিরা তাঁহাদের পরিপুষ্ট সহজজ্ঞানে ব্রহ্মকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া জগত দেখিয়া আপ্তকাম হইতেন। বর্ত্তমানকালে পাশ্চত্য পণ্ডিতেরা, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকগণ, জড়জগত হইতে ক্রমে ব্রহ্মকেন্দ্রে পৌঁছিতে গিয়া অনেক সময়ে সহজজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া নিরাশ হৃদয়ে জড়জগতেই ফিরিয়া আইসেন এবং আত্মতত্ত্বে সংশয়পূর্ণ হয়েন। জড়তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল সত্য সহজজ্ঞান প্রকাশ করে, তাহা তাঁহারা অবিচলিতচিত্তে গ্রহণ করেন কিন্তু আত্মতত্ত্ব বিষয়ক যে সকল সত্য প্রকাশ করে, তাহা তাঁহারা সহজে গ্রহণ করেন না।

সহজজ্ঞানের বলেই আমরা আমাদের "আমিত্বে" নিঃসংশয় হই। আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, কার্য্য করিতেছি, কিন্তু 'আমি' যে এই সকল কার্য্য করিতেছি, তাহা যুক্তিতর্কের দ্বারা সপ্রমাণ করা যায় না, তথাপি সহজজ্ঞানের বলেই বিশ্বাস করি যে আমার কৃত কার্য্য 'আমি'ই করিতেছি।

এই 'আমি' বা আত্মা নিরবয়ব এবং দেহ হইতে স্বতন্ত্র। যেমন বৈজ্ঞানিকদিগের অবলম্বিত দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ প্রভৃতি আত্মার জ্ঞানলাভের দ্বারমাত্র কিন্তু তাহারা আত্মা নহে, সেইরূপ শরীরের ভিন্ন অংশ আত্মার জ্ঞানলাভের বিভিন্ন দ্বার স্বরূপমাত্র; আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত। এই কারণে শরীরের এক অংশ বিনষ্ট হইলে বা শরীরে নূতন পরমাণু সংযুক্ত হইলে, যাহা প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে, আমিত্বজ্ঞানের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কেবল তাহাই নহে। আমার চিন্তা, জ্ঞান প্রভৃতি কার্য্য বিশেষরূপে জানিতেছি এবং জানিতে পারি কিন্তু সেই সকল কার্য্যের একটী শারীরিক [illegible] বিষয় অপরের [illegible] জানিতেছি না [illegible] নিতে পারি না। [illegible]তরাং [illegible] দেখিতেছি যে আমি [illegible] কত বিভিন্ন। আত্মা বিষয়ী [illegible] যাহা কিছু এই বিষয়ীর [illegible] ভাসিত হইতেছে, [illegible] বিষয়। প্রতিদিন যে অগণ[illegible] চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র আকাশে [illegible] তেছে; যদি কখনো ইহা [illegible] বার, ভাবিবার বিষয়ী প্রা[illegible] তাহা হইলেও ইহা ঘটিতে [illegible] কল্পনা করিতে পারি—ইহা [illegible] তের ঘটনা মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে[illegible] যদি এই ঘটনাগুলি বিষয়ীভূত বা [illegible] ভাসিত হয়, তাহা হইলেই জানি[illegible] সেই সকল প্রতিভাস দেখিবার, [illegible] ভাবিবার একজন বিষয়ীও আছে। আমাদের অন্তর্জগতের কার্য্যও এমন যে তাহারা প্রত্যেকেই এক একটী বিষয়মাত্র—জড়জগতের ঘটনা নহে এবং আত্মাই সে[illegible] সকলের বিষয়ী এবং সুতরাং পরোক্ষভাবে বহির্জগতেরও সকল কার্য্যেরই আত্মা বিষয়ী। তাই আত্মজ্ঞানী শুদ্ধচিত্ত পিপ্পলাদ ঋষি বলিয়াছেন "এষহি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।"

আমাদের এই আত্মা সদ্বস্তু এবং অবিনশ্বর; প্রতিভাস বা প্রতিভাসিত বিষয় সকল সদ্বস্তুর বিপরীত এবং ক্ষণস্থায়ী। সহজজ্ঞান হইতেই আমরা এই জ্ঞানলাভ করিতেছি। অদ্যকার যে আমি, কল্যকারও সেই আমি; দশবৎসর পূর্ব্বেও যে আমি, দশ বৎসর পরেও সেই আমি। এই আমি দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বা

...ঙ্গ বিলুপ্ত বা
...তরাং এই দেহ
... বিনষ্ট হইব,
... অসম্ভাবনাই
...খন যে আমি,
... আমি থাকিব,
... ইহলোকে যে
... পারে লোক-
... থাকিব।
...একটু আলোচনা
...তে পারিবে যে
... ইচ্ছাশক্তিকে আ-
... প্রাপ্ত হই না কিন্তু
... প্রসূত হয়। এই
... আধ্যাত্মিক শক্তি।
... তাহা নিবারণ করিতে
... শক্তি প্রয়োগ করিয়া-
...জানেন যে এই শক্তি প্রকৃ-
... শক্তি এবং এই ইচ্ছাশক্তি-
রই বল কামনা সকল নিবারণ করিতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে জাগতিক কোন শক্তিই বিনষ্ট হইতে পারে না—তবে আমরাও বলিতে পারি যে এই ইচ্ছাশক্তিরও কোনকালেই বিনাশ নাই; সুতরাং সেই অবিনশ্বর ইচ্ছাশক্তি যে আত্মা হইতে প্রসূত হয় সেই আত্মা কিছুতেই বিনশ্বর হইতে পারে না—সর্ব্বতোভাবেই অবিনশ্বর।

আজ এই উৎসবের দিনে আমি ভাবের উদ্দীপক কথা সকল না বলিয়া এই আত্মজ্ঞানের দার্শনিক কথা সকল বলিতে কেন প্রবৃত্ত হইলাম? ভাব চিরস্থায়ী হয় না; জ্ঞান সত্যবস্তু—ইহা একবার অন্তরে প্রবেশ করিলে সহজে পরিত্যাগ করে না। এই কারণেই আমি আত্মা সম্বন্ধীয় দুই চারিটী কথা বলিলাম।

বর্ত্তমানে যুবকেরা একদিকে নাস্তিকতার পক্ষপাতী বৈজ্ঞানিকদিগের সুরচিত মনোরঞ্জক বিষয় সকল পাঠ করেন, অপরদিকে তাঁহারা কি গৃহে পিতামাতার নিকট, কি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের নিকট, কোথায়ও ধর্ম্মবিষয়ে হৃদয়গ্রাহী সত্য উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন না; এই সকল কারণে তাঁহারা বৈজ্ঞানিকদিগের নাস্তিকতার পক্ষপাতী কথা সকল নির্ব্বিচারে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখেন এবং পরিণামে তাহার বিষময় ফলভোগ করেন। এই পুণ্যস্থান ভারতভূমি, সত্যধর্ম্মের, অধ্যাত্মধর্ম্মের আদিজননী এবং এই কারণে ইহাঁর যশোগীত সমস্ত সুসভ্য জগতে নিশিদিন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে, আজ সেই ভারতের সন্তানগণ কথায় কথায় ধর্ম্মকে উপহাস করেন, ঈশ্বরকে উড়াইয়া দেন এবং নাস্তিবাদের গুরু, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের কথাকে অভ্রান্ত বেদবাক্য ও তাঁহাদিগকে ইষ্টদেবতা জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

এই অধর্ম্মভাবের গতিরোধ করা যদি আবশ্যক হয়, তবে সকলে আত্মজ্ঞানপরায়ণ হউন, গৃহে পিতামাতা ব্রহ্মমহিমা শ্রবণ করাইতে থাকুন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা সুনীতি শিক্ষা দিতে থাকুন; সকলের সমবেত চেষ্টায় এবং ঈশ্বরের কৃপায় অধর্ম্মভাবকে দূর করিতে কি সময় লাগে? বিলাতে ছাত্রগণ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার দেশভ্রমণে বহির্গত হন; আমাদের দেশেও তীর্থপর্য্যটন সাধুতার একটী লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু আজ কাল তীর্থপর্য্যটন অনেক সময়ে অসাধুতার লক্ষণ বলিয়া উক্ত হয়, কারণ অধিকাংশ তীর্থই দুর্ণীতি ও দুরাচারের আধার হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায়

আমরা যদি সময়ে সময়ে এই শান্তিনিকেতনের কোন নিভৃত নির্জ্জন স্থানে আসিয়া ধ্যানপরায়ণ হই, তাহা হইলে আমাদের অন্তরে অতি সহজে আত্মতত্ত্বের অনেক নিগূঢ় সত্য প্রকাশিত হইবে। যখন আমরা আত্মা হইতে চক্ষু তুলিয়া এই মুক্ত সুবিশাল আকাশের দিকে চাহিব তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে

"যশ্চাসাবাদিত্যে যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি স একঃ"

যিনি ঐ গগনমধ্যবর্ত্তী সূর্য্যে আছেন এবং যিনি এই শরীরপিঞ্জরস্থ আত্মাতে আছেন, তিনি একই পরমেশ্বর। তখন আমরা সকল জীবাত্মার, সকল জগতের প্রতিষ্ঠাভূমি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র দর্শন করিব—

"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ। ঈশানোভূতভব্যস্য স এবাদ্যঃ স উশ্বঃ॥"

তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে,তিনি সম্মুখে; তিনি উত্তরে, তিনি দক্ষিণে; তিনি ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা; তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন।

তাই বলি, হে প্রেমাস্পদ ভ্রাতৃগণ! আজ যখন এই শুভদিনে,এই পবিত্র ক্ষণে, এই অতি রমণীয় স্থানে সমাগত হইতে পারিয়াছি, তখন যেন এই শুভ অবসরকে বৃথা নষ্ট করিয়া না দিই। হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দাও, ব্যাকুল অন্তরে সেই প্রিয়তম সখাকে আহ্বান কর—তবেই তোমরা তাঁহার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইবে। ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে ডাকিতে না পারিলে, তাঁহার জন্য প্রাণের বাস্তবিক পিপাসা না থাকিলে যতই কেন সুন্দর স্থানে গমন কর, যতই কেন বিদ্যাশিক্ষা কর, কিছুতেই তাঁহার দর্শন পাইবে না—যেমন শূন্য হৃদয়ে যাইবে, তেমনি

শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া
হাকে লাভ ক
থাকে, তবে
আর বিজন
তাঁহার দেখা
তোমাদের মুখ
ধারণ করিবে;
করিতে সাহস করিবে
প্রাণকে একবার দে
ড়িয়া আর কিছুই
বোধ হইবে না—"না
হি কিঞ্চিৎ" তাঁহার পর
আর কোন পদার্থ নাই
নিলে সকল জানার পরিসমা
হার উপরে জানিবার
নাই।
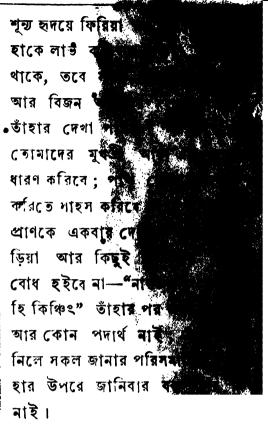
হে ভ্রাতৃগণ! আইস
এই মহান্ মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ কর

"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন; এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্ববক্তব্যের সহিত শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের একটী হৃদয়স্পর্শী উপদেশ পাঠ করিলেন।

[illegible] আমরা ক্ষুদ্র [illegible]। জানি না [illegible] করিব, কোথা- [illegible] আমাদের বাক্য [illegible] যে তাঁহার [illegible] হইলাম তাহা [illegible] ক্য। যাঁহারা [illegible] ন্যস্ত আমলক- [illegible] এতক্ষণ আমরা [illegible] জ্বলন্ত নিশ্বাসে [illegible] াইতে পারিলাম [illegible]। এখানে আমরা [illegible] বলিতে আসি নাই, [illegible] শুনাইতে আসি নাই, [illegible] বস্তুতই দুর্বল। এক্ষণে [illegible] উপদেশ দিব তাহাও ঋষি- [illegible] ন এই নির্জন প্রশান্ত তপো- [illegible] চিন্তায় সিদ্ধকাম হইয়াছেন, [illegible] কৃপায় এই ভারত আবার ব্রহ্মনামে [illegible] গ্রত হইয়াছে, যাঁর এই মহতী কীর্ত্তি [illegible] ই অগ্নিময় মহাবাক্যে। ঋষিবাক্য [illegible] চীন হইলেও চির নূতন। সকলে [illegible] ক্তসহকারে অবহিত হইয়া শুন, এতকাল যাহা পাও নাই ইহাতে তাহাই মিলিবে।”

পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মধুর গম্ভীর স্বরে ভক্তিভরে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সুখে পরিবৃত হইয়া, সেই মলিন সুখের আস্বাদনে বিভোর হইয়া, আমরা এখানে এমন ভাবে অবস্থান করিতেছি, যে বুঝি আমাদিগকে সেই মহাকালের আহ্বানে ইহলোকের পর-পারে যাইতে হইবে না। সহস্র কুটিলতা সহস্র জটিলতার মধ্যে থাকিয়া উর্ণনাভের ন্যায় চারিদিকে এমন করিয়া কল্পনার জাল বিস্তার করিয়াছি, যে বুঝি এই ভাবেই চিরজীবন অতিবাহিত হইবে। চারিদিকে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বসিয়া রহিয়াছি, মনে করিতেছি এত সাবধানতাকে বিফল করিতে পারে কাহার সাধ্য। সন্তান সন্ততির স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের প্রেম, ধন ঐশ্বর্য্যের মোহিনী শক্তি দিয়া এমন করিয়া নিবিড় মোহ অন্ধকার রচনা করিয়াছি, যে তাহার ছায়ায় বসিয়া আত্মার জীবন ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষীণ ক্রন্দনও আর কর্ণগোচর হয় না।

যখন এইরূপে আমাদের জীবনের পরিমিত দিনগুলি একে একে চলিয়া যাইতেছে, যখন রহস্যময় চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত, ওষধি বনস্পতির চিত্তহারী মনোরম সৌন্দর্য্য, পূর্ণচন্দ্রের প্রাণদ জ্যোৎস্না, আমাদিগকে কোন মতেই অনন্তের দিকে প্রবোধিত করিয়া তুলিতে পারিতেছে না, যখন আত্মার গভীরতম প্রদেশে অবগাহন করিবার সকল আশা এককালে তিরোহিত হইয়াছে, তখনই দেবপ্রসাদ আমাদের মস্তকের উপরে অবতীর্ণ হয়, ঈশ্বরের মৃতসঞ্জীবন ঔষধ আমাদিগকে জাগাইয়া তোলে, এবং প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখাইয়া দেয়।

যখন সিদ্ধার্থ রাজসুখে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছিলেন, তখন কে তাঁহাকে সংসারের দীনতা দেখাইয়া দিল, যখন গৌরাঙ্গ দেব সাংসারিক ভাবে উন্মত্ত ছিলেন, কোথা হইতে প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইল, যে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া জগৎকে বৈরাগী হইতে উপদেশ দিলেন, ভক্তির বন্যায় সমুদায় বঙ্গদেশ ভাসাইয়া দিলেন। যখন রাজা রামমোহন রাজধানী হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতে

ছিলেন, কে তাঁহাকে অমানুষিক বল প্রদান করিল, যে তিনি নবীন বয়সে প্রচলিত ধর্ম্মে অনাস্থাবান হইয়া সত্য-ধর্ম্মের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করিলেন, হিমাচলও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। কোথা হইতে দেবেন্দ্রনাথের অতুল ঐশ্বর্য্যের ভোগ আড়ম্বরের মধ্যে উপনিষদের ছিন্ন পত্র আসিয়া পড়িল যে তিনি তাহাতে

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।"

এই যাহা কিছু ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, পাপচিন্তা ও বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না, এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়া উদাসী হইলেন, দেহ ধন যৌবন সকলই ঈশ্বরের নিকটে আহুতি দিলেন।

যে সকল আর্য্য ঋষিগণ আজীবন কাল অরণ্যে হোম যাগ তপস্যা লইয়া বিব্রত থাকিতেন, যাঁহারা স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃশ্য, তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে ত ব্রহ্মনাম নিনাদিত হইবেই, তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ ত ব্রহ্মবান হইবেনই, কিন্তু যখন সময়ের আমূল পরিবর্ত্তনের অন্তে গৃহস্থের গৃহে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া দাবানলের ন্যায় দিগ্‌ দিগন্তের কলুষরাশি ভস্মীভূত করিতে থাকে, জনসমাজের মোহযবনিকা অনাবৃত করিয়া দেয়, পথহারা মানবকুলকে বিপথ হইতে সুপথে আনয়ন করে, তখনই আমরা ঈশ্বরের বিসদৃশ করুণা অনুভব করিয়া স্তব্ধপুলকে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকি।

ঈশ্বরের পাপতাপহারী মলয়হিল্লোল —তাঁহার শুভ দেবাশীর্ব্বাদ আমাদের সকলের উপরে নিয়তকাল বহমান হইতেছে, আমরা তাঁহা[illegible] বুঝিয়া বলিয়া কখন বা সুখে উৎফুল্ল হই, [illegible] বা ঘোর ক্রন্দনরবে গগনভোগ প্রতিধ্বনিত করি, কখন বা নিরাশায় হৃদয়ের জীবনপ্রদীপ ম্লান করিয়া তুলি।

যদি ঈশ্বরের মধুর আহ্বান শ্রবণ করিতে চাও, যদি তাঁহার করুণার সুশীতল স্পর্শসুখ অনুভব করিতে চাও, যদি পাপভগ্ন মলিন আত্মার স্বাস্থ্যবিধানে প্রয়াসী হও, তবে তুমি তোমার সুখ সম্পদের গণ্ডী হইতে ভোগায়তন ক্ষুদ্র জগৎ হইতে বাহিরে আইস, যাও একবার মহামহিমান্বিত হিমাচলের অভ্রভেদী অচলশিখরে, যাও সাগরসঙ্গমে, যাও চিরশান্তিময় নির্জ্জন গহনে, যাও জনশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। সেখানে বৈরাগ্যের যে উপদেশ পাইবে, তাহা আর কোথাও পাইবে না, সেখানে আত্মবিসর্জ্জনের যে শিক্ষা পাইবে, তাহা আর জগতে মিলিবে না, সেখানে যে শান্তিরসের আস্বাদন পাইবে, তাহাতে তোমার সকল ব্যাকুলতার অবসান হইবে। ভীতি ও বিস্ময়ের সম্মিলনে হৃদয় উদার উদাস ভাব ধারণ করিবে।

হিমালয়ের পদপ্রান্তে নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া ঋষিগণ সাধনা করিতেন বলিয়া বেদ উপনিষদের গুরু গম্ভীরভাব আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িল। হিমাচল দর্শনে দেশ দেশান্তর ভ্রমণে রামমোহনের অস্থিমজ্জায় ব্রহ্মতেজ তড়িৎবেগে সঞ্চারিত হইল। হিমালয়প্রবাসে দেবেন্দ্রনাথে প্রাচীন ঋষিপ্রকৃতি ফিরিয়া আসিল। তিনি কত বলিলেন, কত লিখিলেন, এখন আর বলিতে পারেন না, বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আইসে। উদ্যানপ্রান্তে ঐ যে প্রস্তরময় আসন দেখিতেছ, ঐখানে বসিয়া তিনি এই

াপনার হৃদয়ের অস্তমিত মহি- ীবন্ত দেবতাকে ন উপদেশকের া মানিত, শাস্ত্র- সত্যের আলোক লিত।

মি আমাদের নিম্ন- । তটিনী নির্ঝর গহন হইতে বঞ্চিত করিয়া মরা তোমার অনন্ত- র্ত্তি সহজে দেখিতে পাই রমিত দেবদেবীর উপা- জড়াইয়া পড়িয়াছি। মূল আর ফিরিতে পারিতেছি ানে তোমার স্বপ্রকাশ মহি- করিতেছ। এই যে বিশাল প্রান্তর চারিদিকে ধূধূ করিতেছে, এই যে মঠচূড়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সাক্ষীরূপে এখানে বিরাজ করিতেছে এখানে কি আমরা তোমার ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পবিত্র ছবি দর্শন করিব না, তোমার জীবন্তভাব কি গ্রহণ করিতে পারিব না। এই প্রান্তরের শূন্যতা দিয়া যদি হৃদয়কে পূর্ণ করিতে না পারিলাম তবে আর আমাদের আশা কোথায়। এমন নিস্তব্ধতার মধ্যে যদি তোমাকে দেখিতে না পাইলাম; তবে আর কি হইল। খুলে দাও হৃদয়ের কপাট, ছাড় সংসারের নীচ কামনা। ঐ দেখ সংসারের আবরণ উন্মুক্ত হইল। চারিদিক স্পন্দহীন হইয়া আসিল। মোহবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। কি এক নূতন আনন্দ, নবতর পবিত্রতা, স্বর্গীয় আলোক চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিল। যোগানন্দ প্রেমানন্দের উৎস উৎসারিত হইল। কি এক নূতন সপ্তক হৃদয়ের ভিতরে বাজিয়া উঠিল। শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার চির রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইয়া আসিল, কি অনির্ব্বচনীয় সুখ কি স্বর্গীয় তৃপ্তি। জিহ্বা স্পন্দহীন, বাক্য আর কি বলিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। মন্দিরের সোপান পরম্পরায় বহু সংখ্য ভোজ্য সুসজ্জিত ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্র বাবু তথায় দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিলেন "অদ্য পৌষ মাসের সপ্তম দিবসে ব্রহ্মপ্রীতিকামনায় এই সমস্ত সবস্ত্র ভোজ্য অনাথ দীন দুঃখী ও আতুরদিগের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইল।" এ বৎসর প্রার্থীর সংখ্যাও যথেষ্ট হইয়াছিল।

দিবা দ্বিতীয় প্রহর। চতুর্দ্দিকে দোকান পসার বসিয়াছে এবং স্থানীয়লোকে উৎসবক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঐ সময় সাধারণের হৃদয়ের সুশিক্ষার উদ্দেশে রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান গীত হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে তাঁহার সর্ব্বস্ব দান স্ত্রী পুত্র বিক্রয়, সর্প দংশনে পুত্রের মৃত্যু, শ্মশানে পুনর্মিলন এই সমস্ত করুণরসোদ্দীপক গীতাভিনয়ে অনেকেরই অশ্রুপাত হইয়াছিল।

অনন্তর রক্ত সন্ধ্যায় আকাশ সুরঞ্জিত এবং রক্তাভ সূর্য্য প্রান্তরের পশ্চিম প্রান্তে অস্তমিত হইল। বিচিত্র বর্ণের কাচনির্ম্মিত বিশাল ব্রহ্মমন্দির আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। সকলে পুনরায় ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। উপাসনারম্ভে শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীমৎ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন করিলেন—

এই অমৃতময় সময়ের গুরুতর কল্যাণ

কার উদ্দেশ্য স্মরণ কর, এখনকার কর্ত্তব্য অবধারণ কর। আমরা সেই রাজাধিরাজ ত্রিভুবননাথের চরণতলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপাসনার জন্য উপবেশন করিয়াছি। তাঁহার উপাসনা আমাদের আত্মার অন্ন, তাঁহার উপাসনা যুগযুগান্তরে লোকলোকান্তরে আমাদের গতি ও উন্নতির নিদান। তরুলতা ভূধর নদী আকাশের মেঘাবলী ও বিদ্যুৎ নক্ষত্রাদি তাহাদের স্রষ্টাকে জানে না কিন্তু তাহারা নিঃশব্দে দিবা রজনী তাঁহার মহান্ মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। আমরা জানিয়া শুনিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে উপবেশন করিয়াছি। আমাদিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যেন সেই কৃতজ্ঞতা অর্পণে আমাদের হৃদয়পূর্ণ উপাসনাঞ্জলি তাঁহার চরণে উপহার দিতে আমাদের মনের কিছুমাত্র অবহেলা প্রদর্শিত না হয়। যেন নিমেষমাত্র সেই বিষ্ণুর পরমপদ চিন্তনে স্খলিতান্তঃকরণ হইয়া না পড়ি। আমরা বেদমন্ত্রে তাঁহার মহাস্তুতি পাঠ করি, সুসঙ্গীতের ভাবতরঙ্গে তাঁহার বন্দনা করি, আর বক্তৃতার বাক্য বিন্যাসে তাঁহার স্বরূপ ও সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যাই করি, কিন্তু তাহার প্রত্যেক শব্দ-বিকাশের ও প্রত্যেক ভাব সঞ্চারের মধ্যে যেন তাঁহাকেই ওতপ্রোতভাবে দর্শন করি। যদি তাঁহাকে আমাদের আত্মাতে দীপ্যমান না দেখিলাম তবে কাহার চরণে আমাদের হৃদয়ের এই পূজোপহার প্রদান করিব? যদি বিশুদ্ধ হৃদয়ে ভক্তিপুষ্প চয়ন না করিলাম তবে কি দিয়া সেই হৃদয়নাথের পূজা সম্পন্ন করিব? তিনি যে অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, ইহকালে পরকালে দীপ্যমান রহিয়াছেন। মোহনিদ্রাতে যদি নিদ্রিত থাকি, আবরণে আবদ্ধচক্ষু হইয়া অহর্নিশি সংসারচক্রেই ঘুরিতে থাকি তবে আর তাঁহার এই দীপ্যমান আবির্ভাব দেখিতে পাই না এবং তাঁর অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রাণের অশ্রু তাঁহার চরণে বর্ষণ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি না। অতএব সমাহিত হও। যিনি আমাদিগের পূজা গ্রহণের জন্য এখনি এখানে বর্ত্তমান, এই আলোকমালার মধ্যে যাঁহার বিমল কিরণরাজি প্রকাশ পাইতেছে, যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে আমাদের আত্মার মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার পূজা এবং অদ্যকার উৎসবানন্দ উপভোগ কর।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা শেষ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিলে শাস্ত্রী মহাশয় ব্যাখ্যান বিবৃত করিয়া পাঠ করিলেন।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি এই প্রার্থনা করিলেন।

নাথ! আজ এই উৎসবের দিনে, কি পবিত্র স্থানেই বসিয়া তোমার উপাসনা করিতেছি। ইহা প্রকৃতই শান্তিনিকেতন। সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র অনন্ত আকাশের সহিত মিলিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতেই আমার এই আত্মা-নদী তোমার সৌন্দর্য্য-সাগরে যাইয়া মিলিত হইতেছে। চারিদিকে স্তব স্তুতি আনন্দরব শুনিয়া, আমি তোমার আনন্দ-সমুদ্রে অবগাহন করিতেছি। জগদীশ! ধন্য তোমার করুণা, যে তুমি আমাকে এ প্রকার আনন্দভোগের অবসর দিলে। জানি না যে আমি কি প্রকারে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। আমি ভক্তিভরে তোমাকে

দ কর, যেন
হইয়া তো-
নে নিশাথে
আর তোমা

থাকি, কে-
মন।
মায় দেখা দাও

তুমি আমাকে এই
উত্তীর্ণ কর।
ত্য বস্তু আর তোমার
করিব। ইহারা এই
ন জন জীবন যৌবন স্ত্রী
।। সংসারে দিন রাত্রি
হইতেছে। প্রাতে দো-
টিত হইয়া সরোবর আলো-
কিত করিয়া রহিয়াছে, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই সে মলিন হইল। কুমুদ সন্ধ্যার সময় প্রস্ফুটিত হইয়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে ক্রীড়া করে, রজনীর অবসান হইতে না হইতে সে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এখানকার গোলাব পুষ্প কণ্টকহীন নহে। এখানে মধুচক্র হইতে মধু আহরণ করিতে গেলেই, মধুমক্ষিকার দংশন সহ্য করিতে হয়। এ সংসারের প্রকৃতিই এইরূপ। সত্যই ইহা মৃত্যুর প্রতিকৃতি। "এখানকার সকল সুখ দুঃখ রূপে পরিণত হয়।" এখানকার সুখ, দুঃখের সহিত এপ্রকার জড়িত আছে, যে এ সুখকে সুখই বলিতে ইচ্ছা করে না। "উন্মীলি নিমীলয়ে" তাহা উন্মীলিত হইয়াই নিমীলিত হয়।

এ সংসার-আতপের মধ্যে মধ্যে একটু একটু ছায়া আছে বটে, কিন্তু সে ফণিফণার ছায়া। তাহা শান্তি বৃদ্ধি না করিয়া বরং আশঙ্কাই বৃদ্ধি করে।

এখানে যে পুত্র ছায়ার ন্যায় অনুগত, প্রথম বয়সে যাহার সুশীলতা দেখিয়া মনে হয়, এ আমার বৃদ্ধাবস্থার যষ্টি স্বরূপ হইবে, হা! সে অকালে সংসার হইতে বিদায় লইয়া, পিতা মাতাকে নিরাশার নীরে নিমগ্ন, ও কঠিন মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত করিতেছে।

এখানে দুঃখার্দ্ধকারিণী সুখদ্বিগুণকারিণী প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা এই সংসার আলো করিয়া রহিয়াছে, ক্ষণপরেই রঙ্গভূমির আলোকের ন্যায় সহসা নির্ব্বাপিত হইয়া সংসারকে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতেছে। এখানে কি ধনী কি নির্দ্ধন, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি রাজা কি প্রজা, বিপত্তি কাহাকেও ছাড়ে না।

এই যে সম্রাট—যিনি রাজার রাজা, যাঁর দ্বারদেশে লক্ষ লক্ষ প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে, যুদ্ধের সময় যাঁর এক অঙ্গুলির ইঙ্গিতে কোটি কোটি তলবার নিষ্কোষিত হইয়া বিপক্ষের ভীতি সঞ্চার করে, কালবশে তিনিও শত্রুহস্তে বন্দী হইতেছেন। শত্রু এক মুষ্টি অন্ন মাপিয়া দিবে, তবে তাঁহার উদর পূর্ণ হইবে। শত্রুর করুণার উপর তাঁহার জীবন নির্ভর করিতেছে। কখন শিরশ্ছেদনের আদেশ হইবে, এই আশঙ্কাতেই তিনি কম্পিত-কলেবর। হায়! এখানকার সমুদায় অনিত্য সম্পদরূপ কুসুমেই এইরূপ বিষ-কীটই প্রচ্ছন্ন থাকে। অতএব অনিত্য সম্পদ আর তোমার নিকটে কি প্রার্থনা করিব। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা তুমি জান। তুমি যাহা বিধান করিবে, আমি তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব। সম্পদ বিপদ তোমার মঙ্গল হস্ত হইতে আইসে জানিয়া যেন নির্ভয় হইতে পারি। নাথ! তুমিই এই

অন্ধকার জগতের আলো। পার্থিব বিষয়-জনিত আনন্দ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপের ন্যায়। ইহা একটি একটি করিয়া নিভিতে পারে। প্রবল ঝঞ্ঝা উঠিলে এককালে সবগুলিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু তুমি যদি প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়াকাশে উদিত থাক, তাহা হইলে অন্ধকার আর কোথায় থাকে।

হে শিব সুন্দর! তোমার মত জ্যোতির্ম্ময়—তোমার মত সুন্দর কে কোথায় দেখিয়াছে, কে কোথায় শুনিয়াছে। যে একবার তোমার প্রেমানন দেখিয়াছে, তোমার সহবাস-সুখে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে, সে তাহার তুলনা আর কোথাও পায় না। আমরা মাতার স্নেহপূর্ণ আনন দেখিয়াছি, পতিব্রতার প্রেমপূর্ণ মুখকমল দেখিয়াছি, শিশুর সহাস্য মুখচন্দ্রমা দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার প্রসন্নবদনের তুলনা কেবল তোমাতেই আছে। ইহার পরীক্ষা আমরা এখানেই করিতে পারি। যখন সংসার হইতে মনকে উঠাইয়া লইয়া আমরা প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে তোমার পূজা করিতে থাকি—তোমার স্পর্শসুখ অনুভব করিতে থাকি, তখন এ পৃথিবীর যে যত প্রিয় পাত্র হউক না কেন, সে যদি সে পূজায় কোনরূপে বাধা দেয় তখন কি মনস্তাপই উপস্থিত হয়! কি বজ্রাঘাতই মস্তকে পড়ে! ইহাতেই সেই স্বর্গীয় সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব হে দেব! আমি কায়মনোবাক্যে তোমার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতেছি তোমারই প্রদত্ত এ দেহমন আত্মা তোমাকেই প্রত্যর্পণ করিতেছি। তুমি হৃদয়ের রাজা হইয়া হৃদয়ে থাক, হৃদয় উজ্জ্বল হউক। তুমি জিহ্বায় নৃত্য কর, জিহ্বা অমৃতময় মধুময় হউক। তুমি আমার মস্তকে থাক আমার সকল জ্বালা [illegible] হউক। তুমি জ্ঞানসমুদ্র, আমি অজ্ঞান। আমি যাহা বুঝিতে পারিব না, তুমি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিও। আমার দূর দৃষ্টি [illegible] আমি যাহা দূর হইতে দেখিতে [illegible]ব না, তুমি তাহা আমাকে দেখাইয়া দিও। আমি অতি দুর্ব্বল, তোমার অনন্ত শক্তির কণামাত্র আমাকে কৃপা করিয়া দিও, তাহাই সংসার-সংগ্রামে আমাকে রক্ষা করিবে। নাথ! এ সংসারে প্রকৃত প্রস্তাবে আমারে আমার বলে, এমন লোক দেখি না, তুমি একবার আমাকে আমার বলিয়া আদর কর, তাহা হইলেই সকল দুঃখ দূর হইবে।

"কাতর আমার প্রাণ সংসারে, ওগো পিতা দাও তব চরণে স্থান।

কি অন্ধকার চারিদিকে; কি ঝঞ্ঝাবাত; সংসার-সাগরের কি ভীষণ গর্জ্জন। ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে! কোথা তুমি—কোথা তুমি—কোথা তুমি, দেখা দেও—রক্ষা কর।

"অকূল ভবসাগরে তার হে তার হে।
চরণ-তরি দেহি অনাথনাথ হে।
দুর্গতি নিবারণ, দুর্দ্দিন তিমির হর,
পাপ তাপ নাশ হে।"

হে ভয়বিহ্বলের পরিত্রাতা, তুমি হৃদয়ে থাকিয়া অভয় দান কর। আমি নির্ভয় হই। তুমি তোমার আনন্দ অমৃতরূপে আমার আত্মায় বিরাজ কর, আমি চিরসুখী হই। যেন তোমার অক্ষয় আনন্দ আমাকে ইহলোক ও পরলোকে সুখী করে। এই তোমার নিকটে আমার ভিক্ষা, এই তোমার নিকটে আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ত হইয়া সভাভঙ্গ
স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া
পর্ব্ব আরম্ভ হইল।
াহলে ক্ষুভিত হইয়া
ূপোদ্গত গোলকের
াকে সেই বিস্তীর্ণ প্রা-
রাজি দৃষ্ট হইতে লা-
গা! কি বিষম কলরব!
ার্ব্ব শেষ হইয়া গেল।
। সর্ব্বাবয়বে সকলের
হল। বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ
তত্ত্বাবধানে সকলেই
হইয়াছিলেন। কাহারই
কছুমাত্র ক্লেশ হয় নাই।

...গের গর্ভ সংস্কার।

পারসীক কন্যার সন্তান সম্ভাবনা হইলে তাহার আত্মীয় স্বজন মধ্যে আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। হিন্দুস্ত্রীর পঞ্চামৃত ভক্ষণের ন্যায় উহাদেরও পঞ্চম মাসে নানা প্রকার কৌলিক কার্য্য সাধন করিতে হয়। পঞ্চম মাসে কন্যা নব বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া শ্বশুরগৃহ হইতে পিত্রালয়ে গমন করিয়া থাকে। তথায় কন্যার মাতা পুনরায় এক প্রস্থ নূতন বস্ত্র কন্যাকে প্রদান করেন। কিছু দিন পিত্রালয়ে বাস করিয়া কন্যা আবার স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

হিন্দুজাতির মধ্যে সপ্তম ও নবম মাসে সাধ ভক্ষণ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। পারসীকদিগেরও সপ্তম বা নবমে অর্থাৎ এই দুই মাসের যে কোনটিতে একবার মাত্র সাধ দিবার প্রথা আছে। পারসীরা স্বাধকে "অঘারণি" বলেন। আমাদের দেশে অগ্রহায়ণ মাসে নবীন শ্যামল ধান্য ক্ষেত্রে শীষ উদ্গমের সময় বুঝিতে পারিয়া কৃষকেরা ধানের সাধ দিয়া থাকে। ঐ সাধ দেওয়াকে অঘ্রাণি অথবা অঘাণি বলে। অঘ্রাণী শব্দ অগ্রহায়ণ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। বোধ হয় অগ্রহায়ণ মাসে প্রচলিত ধানের সাধ দিবার এই প্রথা হইতে পারসীকদিগের সাধ ভক্ষণ এইরূপ নাম অঘারণি হইয়া থাকিবে। সপ্তম অথবা নবম মাসে নির্দ্দিষ্ট শুভ দিনে কন্যার শ্বশ্রূ বধূকে এক প্রস্থ নব বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহার পিত্রালয়ে মিষ্টান্ন মৎস্য দধি ও দুগ্ধ ইত্যাদি প্রেরণ করিয়া থাকেন। কন্যার মাতাও আবার লৌকিকতা ও ভদ্রতার অনুরোধে ঐ সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া তাহার সহিত শর্করাক ও শস্য এবং মধ্যাহ্নকালে নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী বৈবাহিকের আলয়ে প্রেরণ করেন। অপরাহ্নে কন্যার শ্বশ্রূ একটি পূর্ব্বদ্বারী গৃহের মেঝেতে চুন ও নানা প্রকার রঙ্গিনগুঁড়া দিয়া মৎস্য বৃক্ষ ময়ূর ইত্যাদি চিত্র বিচিত্র করিয়া আলিপনা দিয়া রাখেন। হিন্দুজাতির ন্যায় পিটুলী না করিয়া, শুষ্ক চূর্ণেই উহারা আলিপনা দিয়া থাকেন। উক্ত গৃহের মধ্য স্থলে একটি অনতিউচ্চ কাষ্ঠাসনে কন্যা নব বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া দণ্ডায়মানা থাকে; কন্যার কপালে একটি কুঙ্কুমের ফোঁটা দিয়া তাহার শ্বশ্রূ গুবাকপত্র খর্জ্জুর নারিকেল ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য তাহার বক্ষের নিকট অঞ্চলে বাঁধিয়া দেন। এই সমস্ত বাঁধিয়া লইয়া কন্যা পিত্রালয়ে আগমন করেন। এই সময়ে কন্যার আত্মীয়া ও সহচরীরা প্রায় সকলেই এক একটি পাত্রে মঙ্গল চিহ্ন স্বরূপ কিছু গোধূম ও মিষ্টান্ন লইয়া সহযাত্রী রূপে কন্যার পিত্রালয়ে সমাগত হয়েন।

সকলে পিত্রালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে কন্যার মাতা তণ্ডুল নারিকেল ও ডিম্ব প্রভৃতি দ্বারা কন্যাকে বরণ করিয়া কন্যার সমক্ষেই নারিকেল ও ডিম্ব বিদীর্ণ করেন। অনন্তর কন্যা প্রথমে দক্ষিণ পদ উত্তোলন পূর্ব্বক পিত্রালয়ে প্রবেশ করিয়া একেবারে যে গৃহটি সূতিকাগার রূপে ব্যবহৃত হইবে সেই গৃহে প্রবেশ করে। তথায় উপনীত হইয়া এক হস্তে একটা প্রজ্জ্বলিত দীপ ও অপর হস্তে জলপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সূতিকা গৃহ মধ্যে সাত বার প্রদক্ষিণ করে ও মধ্যে মধ্যে জল পাত্র হইতে অল্প অল্প জল নিক্ষেপ করে। আলোক ও জল লইবার অর্থ এই যে ভাবী নবকুমার যেন চিরকাল সৌভাগ্য-সূর্য্যালোকে বিচরণ এবং বহু ভোজ্য-পেয় সমাকীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে জীবন-ধারণ করিতে পারে। অনন্তর কন্যার মাতা তাহার পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া আবার নূতন বস্ত্র পরিধান করান এবং অধিকতর পরিমাণে গোধূম ও মিষ্টান্নের সহিত তাহাকে স্বামিগৃহে প্রেরণ করেন। যাইবার কালে কন্যার কপালে সিন্দুর বিন্দু দিয়া দেন।

তার পর সূতিকাগৃহ। সূতিকাগৃহটি পূর্ব্বাস্য হইলেই ভাল হয়। পারসীকদিগের উদ্বাহপ্রথাতে বলা হইয়াছে যে হিন্দুজাতির ন্যায় পাত্র ও পাত্রী বিবাহ কালে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করে। প্রসবকালেও কন্যা পূর্ব্বদ্বারী গৃহে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করে। পারসীকেরা ঈশ্বরের প্রতিরূপ সূর্য্যকে পূর্ব্ব দিকে উদিত হইতে দেখেন এই জন্য উহাঁরা পূর্ব্বদিককে অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। পূর্ব্বদিক অতি মঙ্গলদায়ক এই সংস্কার থাকাতে সকল শুভকার্য্য পূর্ব্বাস্য হইয়া করিতে হয়। ইহাঁদিগের সূতিকাগৃহ হিন্দুদিগের অপেক্ষা অশুচি বলিয়া বিবেচিত হয়। সূতিকাগৃহে লৌহনির্ম্মিত খট্টা ভিন্ন অন্য কোন গৃহসজ্জা থাকে না। প্রসবের পর কন্যার ব্য[illegible] সমস্ত শয্যা প্রসৃতি থাকে সে সমস্তই হয় পরিত্যক্ত না হয় ত ইতর জাতি মধ্যে বিতরিত হয়। সূতিকাগৃহের কোন প্রকার দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পবিত্র অগ্নিদেবকে উহাঁরা অপবিত্র করিতে চাহেন না। প্রসূতি ও সন্তান উভয়েই অস্পৃশ্য বলিয়া কেহই তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। যদি শিশু সূতিকাগারে পীড়িত হয় তাহা হইলে বরং তাহাকে স্নান ও গোমূত্র স্পর্শ করাইয়া কোন উপায়ে কথঞ্চিৎ শুচি করিয়া গৃহান্তরে লইয়া যাইতে পারা যায় কিন্তু প্রসূতিকে সেই গৃহে অবরুদ্ধ থাকিতেই হইবে। প্রসূতির পীড়া হইলে যদি চিকিৎসক দেখাইবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে চিকিৎসক নিজ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর পরিধান পূর্ব্বক সূতিকাগারে প্রবেশ করেন ও তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া স্নানান্তে নিজবস্ত্র পরিধান করেন।

হিন্দুজাতির ন্যায় উহাঁদের সূতিকাগার সর্ব্বনিম্নতলে ও গবাক্ষহীন অন্ধকারময় গৃহেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। অবশ্য ধনবান পারসীকেরা সূতিকাগারের জন্য আলোক ও বায়ু বিশিষ্ট গৃহ নির্ব্বাচন করিয়া রাখেন বটে কিন্তু মধ্যবিত্তেরা প্রায়ই অপকৃষ্ট স্থানেই সূতিকাগার নির্ম্মাণ করেন। পারসীক রমণীদিগকে সূতিকাগারে চল্লিশ দিন বন্দী হইয়া থাকিতে হয়।

গর্ভাবস্থায় পারসীকদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে হিন্দুজাতির পঞ্চামৃত ও সাধভক্ষণ এবং

। উহাদের
ন্দুর সহিত
সমুদায় পরি-
দিন সূতিকাগারে
পারসীকদিগের
থাও নাই। রাজ-
চল্লিশ দিন গত না
শু সন্তানকে বাহির
য় উহাদের নিকট
হা গ্রহণ করিয়া থা-
াস্ত্রে বার দিন মাত্র
। ঐ সময়ে সাধারণের
ন এককালে নিষিদ্ধ

...র আবির্ভাব।

কলিযুগের শেষে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া মানবগণের অবস্থাও অতিশয় শোচনীয় হইবে; এবং সত্যযুগের আবির্ভাবে পুনরায় চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে—সমস্ত পুরাণ শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কলিযুগের ধর্ম্মবুদ্ধিহীন মানবের হৃদয়ে, সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবামাত্র কিরূপে পুনরায় ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে, সে বিষয়ে পুরাণবক্তা ঋষিগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে আমরা হরিবংশের ১৪৩ অধ্যায় হইতে এতৎ সম্পর্কীয় ব্যাসোক্তির আবশ্যক অংশ পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১৪৩ অধ্যায়—(কলিযুগের অন্তকালে লোক সমূহের অবস্থা বর্ণনকরত মহর্ষি বেদব্যাস বলিতেছেন,) "ধর্ম্মের দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না। মানবদিগের পরমায়ু সীমা ন্যূনাধিক ত্রিংশৎ বৎসর হইবে। মানবগণের স্বাস্থ্যের কথা কি বলিব, সকলেই দুর্ব্বল, বিষয়ব্যাকুল ও রজোগুণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং রোগবশত সকলেরই ইন্দ্রিয়শক্তি একেবারে পরিক্ষীণ হইয়া আসিবে। তখন আয়ুক্ষয় নিবন্ধন হিংসাবৃত্তিতে আর প্রবৃত্তি থাকিবে না। সাধুজনশুশ্রূষা ও সাধু দর্শন প্রার্থনীয় হইয়া উঠিবে। দুর্ব্যবহার সকল দূরীভূত হইলে ক্রমশঃ সত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিবে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইলেই লোক ধর্ম্মানুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবে এবং স্বজননাশ নিবন্ধন আর কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইবে না।

"এইরূপে মানবগণ সত্য, দান ও প্রাণ রক্ষণে যত্নবান্ হইলেই ক্রমশঃ চতুষ্পাদ ধর্ম্মের সঞ্চার হইতে থাকিবে। তখন লোকের মনে ধর্ম্মই সুস্বাদু বস্তু বলিয়া বিশ্বাস জন্মিলে, যেমন ক্রমশঃ ধর্ম্মলোপ হইয়া আসিয়াছিল, তেমনি আবার ক্রমশঃ ধর্ম্মের বৃদ্ধিদশা উপস্থিত হইবে। ধর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ হইলেই আবার সত্যযুগের উদয় হইবে (১)। সত্যযুগে সদাচারের বৃদ্ধি ও কলিযুগে সদাচারের ক্ষয় হইয়া থাকে। ...... বিধাতা যেমন বিধান করিয়া দিয়াছেন সেই অনুসারে আবহমান কাল এইরূপ পরিবর্ত্ত ঘটিয়া আসিতেছে। জীবলোক ক্ষণকালও একভাবে স্থায়ী নহে; নিয়তই ক্ষয় ও উদয় সম্পর্কে পরিভ্রমণ করিতেছে।"

এই খানে হরিবংশের ১৪৩ অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

---

(১) লোকে পাপানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া ও পাপের বিষময় ফল ভোগ করিয়া পাপকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে যত্নবান্ হইলে সত্য যুগের আবির্ভাব হয়, অথবা সত্য যুগের আবির্ভাব হইলে মানবগণের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে?—এই প্রশ্নের ব্যাসদেব এখানে যে মীমাংসা করিয়াছেন, পাঠকগণকে তাহার প্রতি মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

বশিষ্ঠ।

ভার্য্যাসহ সমাসীন শান্ত ঋষিবর,
সম্মুখে গম্ভীরস্নেহ শোভে হোম গবী
কাঞ্চন সৌগন্ধে সৌম্য সুধা দুগ্ধ স্রবি,
দুর্ব্বাদলে পরিস্নপ্ত শ্যামল প্রান্তর;
ঋষি বালকেরা শুভ্র পবিত্র অন্তরে
স্তব্ধতল তপোবনে করে বেদ গান;
জাহ্নবীর উপকূলে চির তীর্থ স্নান;
দুহিতা সায়াহ্নে শুভ অতিথির তরে
ঋষিদের সুমধুর অভিরুচি কর
অরণ্যের সুরভি অর্ঘ্য নীবার আনে;
পরিতৃপ্ত উৎকৃষ্ট সোমরস্ পানে
পুণ্য সমীরিত স্তব আশীর্ব্বাদ বর;
সমাসীন ঋষিদের ধীরোদাত্ত স্বরে
আশ্রমের শুকেরাও সামগান করে।

সমালোচনা।

মূলধর্ম্ম সাধন। শান্তিনিকেতনের মঠধারী পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত। দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। ইহা একখানি হিন্দী পুস্তক। ব্রহ্মজ্ঞানই যে বেদাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন যে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ, এই দুইটী বিষয়ই প্রধানত গ্রন্থকার বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কতক সহায়তা হইবে আশা করা যায়।

হাসি ও খেলা। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। এইখানি ছোট ছোট ছেলেদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ছেলেদের নীরস উপদেশ সকল গলগ্রহ হইয়া পড়ে। তৎপরিবর্ত্তে আমোদের সহিত উপদেশ দিতে পারিলে তাহা ছেলেদের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। ইংরাজীতে এইরূপ অনেক পুস্তক আছে কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ পুস্তক অতি বিরল। যোগীন্দ্র বাবু এইরূপ পুস্তক রচনা করিয়া আমাদের ধন্য[illegible]ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থে জাতীয় ভাবের পরিপোষক, নী[illegible] অথচ আমোদজনক দুই একটী গল্প থাকিলে [illegible] হইত। আর "ময়না"র ন্যায় আমরা সচরাচর যে সকল প[illegible] দেখিতে পাই ও জানি, তাহাদের বিষয়ে আরও [illegible] কটী কথা থাকিলে ভাল হইত। ছেলেরা জীবজন্তুর বিবরণ এবং জীবনী অধিক ভাল বাসে। পুস্তকখানির কাগজ বান্ধাই প্রভৃতি বহিরাবরণ অতি সুন্দর। মোটের উপর পুস্তকখানি বেশ্ হইয়াছে।

সংবাদ।

গত পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র রায় সস্ত্রীক শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী গিরিবালা দেবী। ইনি কাশীস্থ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি স্মৃতিতীর্থের কন্যা। সংস্কৃত বাঙ্গলা ও উর্দ্দু ভাষায় ইঁহার বেশ অধিকার আছে। ইনি অতি সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা। ইঁহাদের প্রবাসস্থান জকাই চা-বাগান। ঈশ্বর এই দম্পতীর ধর্ম্মনিষ্ঠা অটল রাখিয়া ইঁহাদিগকে সর্ব্বাংশে সুখী করুন।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীড।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বতন ট্রষ্টীগণের মধ্যে বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী, বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র, বাবু উমেশচন্দ্র বসু, বাবু বামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় এবং ইতিপূর্ব্বে সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ট্রষ্টীর কার্য্য হইতে অবসৃত হওয়ায় অবশিষ্ট একমাত্র ট্রষ্টী বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমাজের ট্রষ্টডিডের ৭ দফার নিয়মানুসারে মৃত ও অবসৃত ট্রষ্টীগণের স্থানে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে উক্ত ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া যথারীতি ট্রষ্টীনিয়োগপত্র

তারিখে

ঃ—

কুর, শ্রীযুক্ত বাবু
ীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর
বু বিধুভূষণ বন্দ্যো-
ক্ত বাবু প্রসন্নকুমার

—শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

ব্যয়।

অগ্রহায়ণ মাস।

ব্রাহ্মসমাজ।

আয় … …	৪২৭।৵২
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৩০৯৸৶৩
সমষ্টি … …	৩৭৩৭।/৫
ব্যয় …	৩১৩৸/৬
স্থিত …	৩৪২৩।৶/১১

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ … …	৩৩৯৸৵৮

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৮১৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসের দান	১৪০৲

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	৪৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	১৲
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন চারিকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদপ্রাপ্ত	১৯১॥২
পুরাতন বাতিল কাগজ বিক্রয়ের মূল্য	৩।৵৬
	৩৩৯৸৵৮

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা …		৩৯॥০
শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী,	গড্ডা	৬৲
„ „ দিগম্বর দত্ত,	ক্ষীরপাই	৪৲
„ „ গোকুলকৃষ্ণ সিংহ,	হুগলী	৩।৵০
„ „ মহেন্দ্রনাথ হালদার,	দক্ষিণপারুলিয়া	১৸৵০
„ „ যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী মুন্সেফ, জঙ্গিপুর		৬৸০
„ „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র,	কলিকাতা	৩৲
„ „ কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী,	ঐ	২৲
„ „ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	ঐ	১৲
„ „ নীলকমল মুখোপাধ্যায়,	ঐ	৩৲
„ „ হরিমোহন নন্দী,	ঐ	২৷০
„ „ উমাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ,	ঐ	২৷০
„ „ ব্রজনাথ দত্ত,	ঐ	৩৲
„ „ জয়গোপাল সেন,	ঐ	১৲
		৩৯॥০

পুস্তকালয় … …	৪।/০
যন্ত্রালয় … …	৩৬৲
গচ্ছিত … …	৪॥৶৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩৲
সমষ্টি	৪২৭।৵২

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ … …	১৭৯৸৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা …	৩২॥৶০
পুস্তকালয় …	১৮৶০
যন্ত্রালয় ..	৮৩৶৩
সমষ্টি	৩১৩৸/৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ত্রয়োদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ ।
ফাল্গুন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫ ।

৬১৭ সংখ্যা ১৮১৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ওঁ ।

(নিশীথে)

১

এই যে উপরে করে
তারাগুলি জ্বল্ জ্বল্
স্বরগ-আলোক ঝরে
চমকে ধরণীতল ।

২

গ্রহ উপগ্রহ তারা
কা'র এ অগণ্য লোক ?—
শোভা পায় যেন তা'রা
অন্ধকারে দীপালোক ।

৩

বাস্তবিক কত বড়
গগনে গোলক সব !
ঐশ্বর্য্য এ কার জড়'
জগতের কে বাসব ?

৪

দেখি এ ঐশ্বর্য্যে, বুঝি
ক্ষুদ্র আমি কিপ্রকার ;
ধূলি ল'য়ে কিবা যুঝি—
জ'মে মোর কি বিকার !

৫

—লাগে, এ আকাশে চাই,
ভব যেন কারাগার ;
জাগে রে কি মুক্ততাই
মহিমা এ জাগে কার ?

৬

চারিদিকে সব সুপ্ত
শান্তভাব অভিরাম
জগতে কে যেন গুপ্ত
অনুভবি !—কি আরাম !
(অনুভবি অবিরাম ।)

৭

ব'সে আকাশের তলে
ঘন হয় অনুভব—
বুঝিরে, কাহার বলে
চলিতেছে এই ভব ।

৮

তিনি কি আশ্চর্য্য ! যিনি
সৃজিলেন বিশ্ব এই ;—
সকল আশ্চর্য্যে জিনি
বিরাজেন শুধু সেই ।

———

পঞ্চষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ বৃহস্পতিবার।

নির্ম্মল প্রাতঃকাল। শীতল বায়ু বহিতেছে। সূর্য্যপ্রকাশে সমস্ত সুপ্রকাশিত। পক্ষী সকল মধুর স্বরে কলরব করিতেছে। আজ ব্রহ্মোৎসব। উপাসকেরা দলে দলে কৃত্রিম উদ্যানপথ দিয়া উপাসনামণ্ডপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। পরে যথা সময়ে বন্দনগাথা গীত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখীন হইয়া নিম্নোক্ত বিষয়টী পাঠ করিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান।

আজিকার এই আনন্দ কোলাহল কিসের জন্য? আমাদিগকে আজ কে এখানে আনয়ন করিলেন? কিসের বলে আমরা আকৃষ্ট হইয়া দূরদূরান্তর হইতে এখানে আগমন করিলাম? সুমধুর ব্রহ্মনামের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়াই আমরা আজ এখানে আসিয়াছি; পবিত্র ওঁঙ্কারের স্নেহপূর্ণ সুগম্ভীর ধ্বনি দিবানিশি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে; এতদিন সংসারের মোহময় কোলাহলে মগ্ন থাকিয়া তাহা শুনিতে পাই নাই—আজ তাহা শুনিতে পাইয়া আমরা ব্যাকুল-প্রাণে ছুটিয়া আসিয়াছি। ইহারই জন্য আজ এত আনন্দ-কোলাহল। আমরা পরমমাতা বিশ্বপিতা হইতে দূরে দূরে বিচরণ কবিতেছিলাম; আজ সম্বৎসর পরে তাঁহার অতুল স্নেহ অনুভব করিবার জন্য সকল ভ্রাতা, সকল বন্ধু একত্র মিলিত হইয়াছি, ইহাতেই আমাদের এত উৎসব, এত আনন্দ। আজ তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি; সূর্য্যের অন্তরে, শুভ্র আকাশের মাঝে, ওষধির মধ্যে, বনস্পতির মধ্যে, সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে আজ তাঁহাকে দেখিতেছি; আবার আমাদের প্রতিজনের স্বীয় আত্মাতে এবং সমাগত সজ্জনদিগের প্রশান্ত মুখশ্রীতেও তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি; তাঁহাকে আজ উর্দ্ধেতে অধোতে, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে এবং অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছি। এক সময়ে ভারতের ঋষিরা গহন অরণ্যের নিভৃত নিলয়ে সমাগত হইয়া তারস্বরে ব্রহ্মমহিমা গান করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, আর আজ আমরা এই সজন লোকালয়ে সম্মিলিত হইয়া তাহাই করিতেছি—কি আনন্দ! কি আনন্দ!

যে সত্যধর্ম্মের নামে আমরা সমাগত হইয়াছি, এই সত্যধর্ম্ম নূতনপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম নহে; ইহা প্রতি মানবের চিরন্তন ধর্ম্ম, সমগ্র ভারতের অতি পুরাতন ধর্ম্ম এবং সমগ্র জগতের সনাতন ধর্ম্ম। ভারতের ঋষিরাই সর্ব্ব প্রথমে এই ধর্ম্মকে দেবভাষায় সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও আমাদের আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই একই পরমেশ্বর। "যশ্চাসাবাদিত্যে যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি স একঃ" ঐ যিনি আদিত্যে, যিনি এই আত্মাতে, তিনি একই পরমেশ্বর। তাঁহারা আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইয়া সুমার্জিত বুদ্ধি দ্বারা উজ্জ্বল সহজ জ্ঞানে ধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় সত্য লাভ করিয়া আমাদের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন। আমরা তাহা দেখিয়া শুনিয়া কৃতজ্ঞতাভরে অবনতমস্তক হইতেছি এবং সমস্ত জগৎ অবাক্ দৃষ্টিতে ভারতের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছে।

কিন্তু সেই আত্মজ্ঞানী ঋষিদিগের সময়ে ভারতে পার্থিব সভ্যতারও অত্যন্ত

বিস্তার হইয়াছিল; ক্রমে ভারতবাসী আর্য্য-সন্তানেরা বিষয়বিলাসে নিমগ্ন থাকিয়া আত্মজ্ঞান হারাইতে লাগিলেন এবং সত্য-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিলেন। এই অধর্ম্মের পথ হইতে ভারতবাসী-দিগকে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাতে বুদ্ধদেব দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু তিনিও ধর্ম্মের দিকে সমস্ত ভারতের গতিমতি ফিরাইতে পারিলেন না। বরঞ্চ তাঁহার ব্রহ্মনামবিহীন উপদেশে যখন লোকেরা নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকিল, তখন কতিপয় মহাত্মা ব্যক্তি হিতেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ঘোর নাস্তিকতা অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রতিবিম্বও ভাল, এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা মূর্ত্তিপূজার প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই মূর্ত্তি সংখ্যা দু-একটী করিয়া বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে ৩৩ কোটি সংখ্যায় পরিণত হইল। ইহাতে যে সাময়িক কিঞ্চিৎ সুফল হইয়াছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না; কিন্তু পরে ইহা যথেষ্ট কুফল উৎপাদন করিয়াছে। উপধর্ম্মের উপলক্ষে, দেবদেবীর উদ্দেশে কত-না নরবলি পশুবলি, কত-না ভীষণ কাণ্ড সংসাধিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানেও মূর্ত্তিপূজা এই ভারতে বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কৃতবিদ্যমণ্ডলীর অনেকে বাল্যকাল হইতে মূর্ত্তিপূজাতে অভ্যস্ত থাকাতে তাঁহাদের সহজজ্ঞান মোহ-আবরণে আবৃত থাকে—তাঁহারা মূর্ত্তিপূজার বাহিরে যাইতে চাহেন না। আবার অনেকে মূর্ত্তিপূজায় আপনাদের জ্ঞান প্রীতি ভক্তিকে চরিতার্থতা লাভ করিতে না দেখিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া উপনীত হয়েন—তাঁহাদের অন্তরে, অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্মের প্রতি অতিসাংঘাতিক এক উপেক্ষার ভাব আসিয়া পড়ে; তাঁহারা প্রকৃত সত্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ভ্রমবশত স্থির করেন যে, ধর্ম্ম, ঈশ্বর পরকাল বলিয়া কোন পদার্থই নাই—লোকেরা কুসংস্কারবশত মূর্ত্তি গড়িয়া ঈশ্বর আখ্যা দিয়া পূজা করে, ধর্ম্ম ও পরকাল বালকদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কল্পনা মাত্র। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে, কৃতবিদ্যমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মকে ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই অন্তরে ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষার ভাব বিদ্যমান। মূর্ত্তিপূজা যখন তাঁহাদের জ্ঞানে সায় পায় না; ইহাতে যখন তাঁহাদের প্রেমভক্তি চরিতার্থ হয় না, তখন তাঁহারা যে মূর্ত্তিপূজাকে সত্যধর্ম্ম নহে ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং তৎসঙ্গে যে প্রকৃত সত্যধর্ম্মেরও প্রতি বিমুখ হইতে পারেন, তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করিলে আমাদের সে ভয় নাই যে, ইহাতে জ্ঞান সায় পাইবে না অথবা প্রেমভক্তি চরিতার্থ হইবে না। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক, তাঁহাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনার প্রতি উপেক্ষার ভাব আসিতেই পারে না। তাঁহাদের জ্ঞানপ্রেমভক্তি যতই বিস্তৃত ও উদার আকার ধারণ করিবে, ব্রহ্মজ্ঞানও ততই উজ্জ্বল হইবে; প্রেম-ভক্তির সহায়তায় জ্ঞান সুবিমল হইবে এবং জ্ঞানের সহায়তায় প্রেমভক্তি একনিষ্ঠ ও দীপ্তিমান্ হইবে।

আমরা যখন চক্ষু নিমীলিত করিয়া আত্মার দিকে চক্ষু ফিরাই, তখন দেখি যে, আত্মাতে গভীর নিহিত একটী শ্রদ্ধাভাব আছে; সেই শ্রদ্ধাভক্তির সুগন্ধি পুষ্প-

মাল্যে আমরা আমাদের পরমপিতা, পরমমাতা, পরমসখা পরমাত্মাকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হই। আমরা দেখি যে, এই শ্রদ্ধাভাব কোন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না; ইহা অনন্তস্বরূপের চরণতলে গিয়া বিশ্রাম করিতে চাহে। এই শ্রদ্ধাভক্তি যোগে আমরা যেমন সেই মহান্ পরমেশ্বরকে আমাদের দয়াময় পিতা বলিয়া জানিতে পারি, সেইরূপ আমরা আপনাদিগকেও তাঁহার সন্তান বলিয়া জানি এবং এই শ্রদ্ধাভক্তিযোগেই আমরা তাঁহাকে ভক্তবৎসল ও মঙ্গলময় বলিয়া জানিতে পারি ও জগতে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করি।

এই শ্রদ্ধাভক্তি মিথ্যা পদার্থ নহে—ইহা অতীব সত্য পদার্থ। যে শ্রদ্ধাভাবের প্রাবল্যে এককালে বৈদিক ধর্ম্ম সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছিল; যাহার বলে ঋষিরা সংসারের সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া উপনিষদের সত্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন; এই সেদিন পর্য্যন্ত যে ভক্তিভাবের ও প্রেমের স্রোতে চৈতন্যদেব সমস্ত বঙ্গভূমিকে উন্মত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে সেই শ্রদ্ধাভক্তি মিথ্যা নহে; তাহা অতি গুরুতর সত্য এবং সেই শ্রদ্ধাভক্তি যে অনন্তপুরুষের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে, তিনিও পরম সত্য, প্রত্যক্ষ সত্য, পরম মঙ্গলস্বরূপ মহান্ আত্মা।

পরমাত্মাকে আত্মাতে প্রত্যক্ষ দেখিয়া যেমন দয়াময় পিতা বলিয়া উপলব্ধি করি, তেমনি তাঁহাকে শুদ্ধমপাপবিদ্ধং বলিয়াও জানি। সেই পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের আত্মাতে নীতিজ্ঞান নিহিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পুণ্য লাভে এত স্পৃহা, এত চেষ্টা এবং পাপের প্রতি এত ঘৃণা। আমাদের নিকটে "কর্ত্তব্য" কথাটী কথামাত্র নহে; এই কথার এক গভীর আধ্যাত্মিক বল আছে। যে বীরহৃদয় পুরুষ সন্তোষের সহিত আপনার সমুদয় সুখসম্পদ বিসর্জ্জন দিয়াও কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হয়েন, তাঁহার সে বীরোচিত উৎসাহ কি কর্ত্তব্য কথামাত্র হইতে আসিতে পারে? এরূপ মনে করা ভ্রমের একশেষ। এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনুষ্যের উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞানও পাইয়াছি। আবার ঈশ্বর কেমন আশ্চর্য্যরূপে মস্তিষ্কের সহিত হৃদয়ের, জ্ঞানের সহিত ভাবের সম্মিলন করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে আমরা সদনুষ্ঠান করিলে আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হই এবং অসদনুষ্ঠান করিলে আত্মগ্লানিতে মর্ম্মদগ্ধ হইয়া যাই। এই সকল জ্ঞান ও ভাবকে চর্চ্চা ও অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট করিতে পারে কিন্তু ইহাদের বীজ সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহাদের বীজ পরমেশ্বরই আমাদের আত্মাতে রোপণ করিয়া দিয়াছেন।

যেমন চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যানে ঈশ্বরকে দয়াময় পিতা এবং শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া জানিতে পারিলাম, সেইরূপ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া এই জগতের অন্তরালে দেখি—

"বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে। তিনিই ইহার স্রষ্টা, তিনিই ইহার রচয়িতা, তিনিই ইহার আশ্রয়। তিনি যেমন

এই ব্রহ্মচক্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি তাঁহারই ইচ্ছাতে এই ব্রহ্মচক্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে "যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।" বিজ্ঞান আমাদিগকে এই মূলসত্য শিক্ষা দিতে পারে না—"প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে।" একমাত্র আত্মার সহজ জ্ঞানেই ইহা প্রতিভাত হয়। আমরা জানিতেছি যে, জগতের সকল বস্তুই সাবলম্ব ও অপূর্ণ। জড়শক্তির সহিত প্রাণনশক্তির, প্রাণনশক্তির সহিত আত্মশক্তির, এইরূপে জগতের সকল শক্তিই পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ—পরস্পরের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। এই সকল হইতে আমরা ইহাও জানিতেছি যে এই অপূর্ণ জগতের কোন বস্তুই আপনাপনি উদ্ভূত হইতে পারে না। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রাকৃতিক কারণই দেখাইতে পারে, তাহার অকৃত কারণ দেখাইতে পারে না। কিন্তু আমাদের আত্মা কারণ হইতে কারণান্তরে গিয়া সেই আদি কারণ পরমেশ্বরে না পৌঁছিয়া থাকিতে পারে না। আমি যেমন সহজজ্ঞানে জানিতেছি যে আমার কৃত কার্য্যের প্রকৃত কারণ আমার ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট আত্মা, সেইরূপ জগৎকেও যখন আমরা আত্মাতে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখি, তখনই সহজেই জানিতে পারি যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ সেই ইচ্ছাময় মহান্ আত্মা। তিনিই অকৃত কারণ, তিনিই আদিকারণ; তিনি "অকৃত, অমৃত পুরুষ, বিশ্বভুবনপতি।"

ঈশ্বরকে যেমন আমরা জগতের স্রষ্টা বলিয়া জানিতেছি, তেমনি আবার তাঁহাকে জগতের রচয়িতা ও নিয়ন্তা বলিয়াও জানিতেছি। তিনি এই জগতের মধ্যে যেমন জড়শক্তি প্রেরণ করিয়াছেন, তেমনি প্রাণীদিগের দেহে প্রাণনশক্তিও প্রেরণ করিয়াছেন; তিনিই আবার মানবদেহে কি অপূর্ব্ব কৌশলে ক্ষুদ্র জীবাত্মাকে স্থাপন করিয়া তাহাকে জ্ঞানের অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। সেই পূর্ণজ্ঞান এই জগতে কেমন সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম স্থাপন করিয়াছেন; তাঁহারই অখণ্ড নিয়মে চরাচর বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে বলিয়াই জ্যোতির্ব্বেত্তা গ্রহউপগ্রহের গতির নিয়ম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছেন; উদ্ভিদতত্ত্ববেত্তা উদ্ভিদ সকলের জন্মজরার, জীবতত্ত্ববিদেরা জীবগণের প্রাণনকার্য্যের, এবং আত্মজ্ঞেরা আত্মতত্ত্বের নিয়ম সকল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছেন। প্রাকৃতিক ঘটনা সকল আকস্মিক ভাবে ঘটিলে তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালীর নিয়ম আবিষ্কৃত হইতে পারিত না।

এস, ঈশ্বরকে এই প্রকারে আত্মার মধ্য দিয়া—আত্মার জ্ঞানের সকল অঙ্গের মধ্য দিয়াই দেখিতে চেষ্টা করি, তবেই সর্ব্বত্র তাঁহার পরিচয় পাইয়া আপ্তকাম হইব এবং তাঁহাকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত দেখিয়া তাঁহারই ক্রোড়ে বাস করিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হইব। এস, বিস্ফারিতনেত্রে প্রভাতের সূর্য্যকিরণরঞ্জিত অসীম আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করি; মুদিতনেত্রে আত্মার অন্তরে দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ শুদ্ধস্বরূপ অবগত হই এবং উভয় হইতেই তাঁহার পরিপূর্ণ অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করি।

আজ এই উৎসবের মধ্যে অনেকে ভাবাবেশে তাঁহার আভাস পাইতেছেন, কিন্তু আমাদিগকে জ্ঞানের দ্বার দিয়া তাঁহাকে আত্মার মধ্যে স্থিরতর রাখিতে হইবে, ভাবাবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে হইবে না; মহাবিনাশপ্রাপ্তি হইতে রক্ষা পাইতে চাহিলে তাঁহাকে ভাবের

মধ্যে জ্ঞানের মধ্যে, সুখের মধ্যে দুঃখের মধ্যে, উৎসবের আনন্দকোলাহলে, বিপদের কশাঘাতে সর্ব্বত্র ও সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে দেখিতে হইবে; মৃত্যুমাঝে তাঁহাকে অমৃতসোপান জানিতে হইবে—তবেই আমাদের অধ্যাত্মযোগ সিদ্ধ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ সার্থক হইবে।

হে পরমাত্মন্! তুমি কৃপাদৃষ্টিতে যখন এই বঙ্গদেশের প্রতি চাহিয়াছ, তখন ইহার প্রতি আর বিমুখ হইও না। আমরা জানি যে আমরাই সংসারমোহে ও স্বকৃত পাপে মুগ্ধ হইয়া তোমা হইতে দূরে থাকিতে চাহি; কিন্তু হে সত্যস্বরূপ, ধ্রুবজ্যোতি সনাতন ব্রহ্ম! তুমি আমাদের সেই মোহ, সেই পাপ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তোমার সহবাস লাভ করিতে দাও। "লয়ে যাও জননী মৃত্যু হতে অমৃতে"; তোমার প্রসন্নমুখ একবার আমাদের সম্মুখে প্রকাশ কর। তোমাকে ছাড়িয়া এ সংসারে পরিত্রাণ নাই, মুক্তি নাই। হে স্বপ্রকাশ! আমাদের নিকটে তুমি স্বীয় মহিমাতে প্রকাশিত হও—ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সকলকে এইরূপে উদ্বোধিত করিলেন।

আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের গৃহপ্রতিষ্ঠার দিন। তাই আজিকার দিন আমাদের স্মরণীয় ও আদরণীয়। আজ এগারই মাঘের মহা মহোৎসব। অতএব সমাগত সকলে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা উপলব্ধি কর। অদ্যকার সূর্য্যের পুণ্য কিরণ, আকাশের নির্ম্মল আনন্দময় ভাব, ব্রাহ্ম হৃদয়ের নির্ম্মল প্রফুল্লকর উৎসাহ এ সকলের মধ্যে ঈশ্বরের পুণ্যজ্যোতি অবলোকন কর। আইস আজ ভ্রাতা ভগিনী, আইস আজ বন্ধুবান্ধব আবাল বৃদ্ধ নরনারী দীনদুঃখী পাপী তাপী সাধু অসাধু সকলে একহৃদয়ে ব্রহ্মোৎসব উপভোগ কর। কৃপাময় পরমেশ্বরের অপার প্রীতি অনুভব কর। আইস 'যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্বং নমোভিঃ' নমস্কার পূর্ব্বক তোমাদের ও আমাদের সেই চিরন্তন ব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি। 'অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে' হে অনাদিমৎ পরমেশ্বর তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, এক্ষণে তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ কর।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

আজ আমরা যাঁর উপাসনার জন্য মিলিত হইয়াছি তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা। এই মাত্র আমরা বেদবাক্যে তাঁহার যে স্তবস্তুতি করিলাম তাহা তাঁহার রাজসিংহাসনের সন্নিহিত হইয়াছে। মুক্ত হৃদয়ে যে প্রার্থনা করিলাম তিনি তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি জ্ঞানজ্যোতিতে আমাদের মধ্যে বিরাজমান। এই পবিত্র মুহূর্ত্তে একবার জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে দেখিয়া লও। এমন ভুবনমোহন রূপ আর কখন দেখ নাই। এই যে উষার স্নিগ্ধ প্রকাশ, ঐ যে রক্তচ্ছবি সূর্য্য, এই যে সম্মুখের শোভন উদ্যানে বিচিত্র বর্ণের পুষ্প এই সমস্ত তাঁহারই রূপের ছায়া। যিনি হৃদয়মন্দিরে একবার সেই অলৌকিক রূপ দেখিতে পান তাঁহার সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়। তাঁহার হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ ও সমস্ত সংশয়চ্ছেদ হয়। কিন্তু এই অরূপীর রূপ আত্মায় প্রত্যক্ষ করা বড়ই কঠিন কথা। ইহার জন্য

বিশেষ রূপ আপনাকে প্রস্তুত করা আবশ্যক। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের কথা অনেকেই ব্রহ্মদর্শনে আপনার যোগ্যতা স্থাপনের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না। অল্প দিনে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে সাধনে বীতরাগ হন। হয় তো অনেকেই এককালে ধর্ম্মও ব্রহ্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে বিচরণ করেন। কিন্তু একবার স্থিরচিত্তে বুঝিয়া দেখ এই পৃথিবীতেই যখন সামান্য লোকের পক্ষে একজন উচ্চপদস্থ অনায়াসলভ্য নহেন তখন যাঁর এক ইঙ্গিতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইতেছে তুমি স্বল্পায়াসে তাঁর দর্শন প্রত্যাশা কর একি দুরাশা।

ব্রহ্ম আমাদের দূরে নহেন তিনি অন্তরে। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে চিত্তের স্থৈর্য্য চাই। চিত্তের স্থৈর্য্য সহকারে অনুরাগবহ্নি সন্ধুক্ষিত করিতে হইবে; তবে নিশ্চয়ই এক দিন না এক দিন তাঁর দর্শন পাইবে। কিন্তু এই চিত্তস্থির করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রায় প্রত্যেকেই নানারূপ বাসনা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। পুত্রাদি কামনা লইয়া আকুল। ইহার নিবৃত্তি না হইলে মনের স্থৈর্য্য লাভ কদাচ হয় না। যিনি যে পরিমাণে এই সমস্ত কামনা বিসর্জ্জন দিতে পারেন তাঁহার চিত্ত সেই পরিমাণে স্থির হয়। যে গৃহে দেবতার বাস গৃহীমাত্রেই তাহা সর্ব্বতোভাবে পবিত্র রাখিতে প্রয়াস পান। কিন্তু যে জীবন্ত জাগ্রত দেবতা প্রত্যেকের আত্মারূপ, নিভৃত নিলয়ে বাস করিতেছেন এই সকল মলিন কামনা দূর করিয়া তাহা সতত পবিত্র রাখ তবেই চিত্তের স্থৈর্য্য লাভ হইবে। আবার চিত্ত স্থির হইলেও বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে সময় প্রতীক্ষা করিতে হইবে। পুরাণাদি পাঠে জানা যায় কোন ঋষি তপঃসাধনের জন্য যুগযুগান্তকাল একাসনে উপবিষ্ট। বল্মীক মৃত্তিকায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রোথিত, জটাজালে পক্ষিরা নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই ব্যাপক কালেও তাঁর ব্রহ্মদর্শন ঘটিতেছে না। এই কথার ভিতর কোনরূপ কবিকল্পনা থাকিলেও ইহা নিশ্চয় সত্য যে ঈশ্বরলাভার্থ যোগ্যতাসিদ্ধি বিশেষ আবশ্যক। ইহার জন্য সময়ের কোনরূপ সীমা থাকিতে পারে না। যিনি যে পরিমাণে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবেন তাঁহার সিদ্ধিলাভ ততই সুলভ হইবে। তবে এত অস্থৈর্য্য কেন? ঋষিসেবিত স্বাভাবিক ও সরল পথ আশ্রয় করিয়া অল্পে অল্পে আপনাকে উপযুক্ত কর কালে অবশ্যই ব্রহ্মদর্শন হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যসাধারণ ধর্ম্ম। ইহা কেবল তোমার কি কেবল আমার নয়। অতএব এই ধর্ম্মসাধনের জন্য যে প্রণালী মনুষ্যসাধারণের পক্ষে সঙ্গত তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিও। ব্রহ্মকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হও কিন্তু চঞ্চল হইও না। তদ্দর্শন পথ নিতান্ত দুর্গম। চাপল্যে পদস্খলনের খুব সম্ভাবনা। জ্ঞানে অটল হও। ভক্তিকে দৃঢ় কর কালে নিশ্চয়ই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

ব্রহ্মন্! যে দিন সকলে, রোগশয্যার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া শোকাশ্রুর সহিত আমাদিগকে বিদায় দিবে সেই দিন স্মরণ করিলে বড় ভীত হই। চক্ষের এই দুইখানি কবাট একবার পড়িয়া গেলে পরে যে কি দেখিব কিছুই জানি না এই জন্য প্রাণের পিপাসা যে ইহজীবনেই একবার তোমাকে দেখি। যদি ইহজীবনে তোমায় দেখিতে পাই তবে ভবিষ্যতের ঘোর অন্ধকার আর আমাদিগকে

বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না। কারণ তুমিই সেই অন্ধকারের একমাত্র আলোক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় স্ববক্তব্য এইরূপে বিবৃত করিলেন।

যাঁহারা সমাজতত্ত্ব, দেশ বিদেশের শাসনপ্রণালী, আধ্যাত্মিক জগতের ঐতিহাসিক রহস্য, মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, অভাব বোধ না হইলে নূতন মত নূতন ভাব নূতন কৌশল বিকশিত হইবার আবশ্যকতা দাঁড়াইতে পারে না। সমাজেই বল, রাজত্বের ভিতরেই বল, ধর্ম্মজগতেই বল যতদিন তাহারদের মধ্যে প্রাণক্রিয়া চলিতে থাকিবে, ততদিন এই নিয়মের ব্যভিচার একেবারেই অসম্ভব। এদেশে আধ্যাত্মিক জীবনস্রোত সময়ে সময়ে প্রবল বেগে বহমান হইয়াছিল, এই জন্য আমরা অজ্ঞান-অন্ধকারের ভীষণতার মধ্যে বেদের জ্ঞানকাণ্ড পাইলাম। কর্ম্মকাণ্ডের ভীতিজনক বাহুল্যের অন্তে নীতিশিক্ষাপ্রদ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিলাম। শূন্যবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের পশ্চাতে বেদান্তের গভীর মীমাংসার মধ্যে সেই পরিপূর্ণ পরমেশ্বরের পবিত্র প্রশান্ত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলাম। আবার যখন অন্ধকারের ঘোরঘটা দিগ্বলয় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, আধ্যাত্মিক প্রাণের মৃদুনাড়ী, তাহার জীবননিশ্বাস প্রায় অনুভূত হইতেছিল না, বেদান্তের উজ্জ্বল রশ্মি যখন তাহার দুর্ব্বল চক্ষু কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না, তখন পুরাণের কাহিনী তন্ত্রের সাধন চারিদিক অধিকার করিয়া লইল। যতদিন জীবনস্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, ততদিন নূতন সত্য সহজেই সাধারণের সম্মুখে উজ্জ্বল ভাবে আবির্ভূত হইল; সে অবস্থা চলিয়া গেলে ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের ঘন আবরণ সত্যকে ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া তাহার দিব্য কান্তিকে ম্লান করিয়া ফেলিল। অবতারবাদ জড়বাদ মূর্ত্তিপূজা শাস্ত্রের অনুশাসন দুর্জ্জয় পরাক্রমে সাধারণের মধ্যে বিহার করিতে লাগিল। চৈতন্যের শিক্ষা, তাঁহার ভক্তিশাস্ত্র যুগান্তর আনিবার জন্য সহস্র চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনমতেই মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিল না; পতিত ভারত দুর্ব্বল বঙ্গদেশ একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া আবার গাঢ়তর সুষুপ্তির মধ্যে ডুবিয়া গেল। তখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। পরে জ্ঞানের আলোচনায় পূর্ব্বদিক আলোকিত হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময়ে মৃতসঞ্জীবন ঔষধ হস্তে লইয়া, সত্যের দিব্য কান্তিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া যুগযুগান্তরব্যাপী কালনিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম, আমারদের পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম, বেদবেদান্তনিহিত একেশ্বরবাদ, স্বর্গীয় দুন্দুভি বাজাইয়া দিলেন।

যদি সময়ের আহ্বান, ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়া আপনার জীবনকে নিয়মিত করিতে চাও, যদি আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিবার বাসনা থাকে, যদি আত্মার ক্রন্দন নীরবে সহ্য করিতে অপারগ হইয়া থাক, তবে এই মোক্ষপ্রদ পবিত্র ধর্ম্মকে জীবনের অবলম্বন, অনন্তপথের সম্বল করিয়া অনন্তপ্রয়াণের অভিমুখীন হও, জ্ঞান ও ভক্তির যুক্তবেণীতে স্নান করিয়া অক্ষয় ফল লাভ কর।

বিদ্যুৎপ্রভায় নিবিড় অন্ধকারের মোহ যবনিকা ভেদ করিয়া কিসের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের মধ্যে সমুদিত হইলেন? আমারদের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা

এমন কিছু ঘটে নাই যাহার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, চরিত্রহীনতার মাত্রা এতকিছু বর্দ্ধিত হয় নাই যাহার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আগমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে অতৃপ্তি, তাহার মর্ম্মগ্রহণে অসামর্থ্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থানের হেতুভূত। যদি ঈশ্বরের এই মহৎ দানের গুরুত্ব অনুভব করিতে চাও, যদি তাঁহার সঞ্জীবন ঔষধের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে নিজ নিজ দীনতা ও অভাবের দিকে লক্ষ্য কর, যে ব্যাপককালের মহাব্যাধির হস্তে পড়িয়া তোমাদের চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহার বিষয় স্মরণ কর, তবেই বর্ত্তমান কালের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগিতা বুঝিতে পারিবে। সাবধান ঈশ্বরের অযাচিত দান পাইয়াছ বলিয়া তাহার অপব্যবহার করিও না।

পুণ্যসলিলা গঙ্গা হিমালয়ের শিরোদেশ হইতে বহির্গত হইয়া নানা শাখা নদে মিলিত হইয়াছিল বলিয়া অজেয় বিক্রমে মহাসমুদ্রের দিকে ছুটিতে পারিয়াছে। কিন্তু যখন আবার ত্রিবেণী সঙ্গমে আসিয়া তাহার বিপুলকায়া ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন মুক্তবেণীতে প্রবাহিত হইল, তখনই তাহার পূর্ব্বসামর্থ্যের খর্ব্বতা ঘটিয়াছে। এই তিনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হও, দেখিবে চারিদিকে বালুকাস্তূপ ধূধূ করিতেছে, সলিলরাশি তাহার ভিতরে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, মধ্যদেশে সংকীর্ণ স্রোত ক্ষীণবেগে বহিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্ঞান-ভক্তি-প্রীতি-সমন্বিত পবিত্র স্রোত যাহা এতদিন পুরাণ-তন্ত্রের জটিলতার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় অদৃশ্যভাবে বহিতেছিল, যখনই তাহার সকল আবরণ সকল বাধা বিদূরিত হইয়া গেল, তখনই সে দুর্দ্দম তেজে বহিতে আরম্ভ করিল, তাহার পবিত্র মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া দেব মনুষ্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সহস্র সহস্র লোক সেই পুণ্য বারিতে অবগাহন করিয়া গতি মুক্তির সরল পথ দেখিতে পাইল, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা পাইল। এই ভাবেইত প্রচার চলিয়াছিল। কিন্তু এই সাধনসাপেক্ষ উন্নততম ধর্ম্ম কৃচ্ছ্রসাধ্য দেখিয়া আমরা নিজের দোষেই ইহার স্বর্গীয় ভাবের খর্ব্বতা সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আমরা তপস্যা দ্বারা ধ্যানযোগে আত্মার কল্যাণ সাধন করিতে না পারিয়া ইহাকে সংসারের নীচতার ভিতরে সামাজিক রাজনৈতিক সংস্কারের মধ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা পাইতেছি। এবং এই সকল তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রবাহিত করিতে গিয়া ইহার অজেয় শক্তিকে দুই মুক্ত বেণীতে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি, এবং আমারদের ভাবী আধ্যাত্মিক অমঙ্গলের পথ অনাবৃত করিয়াছি। আমরা বুঝিতেছি না কোথায় আমাদের পদস্খলন হইয়াছে এবং কোথায় গিয়া আমাদের সর্ব্বনাশের পরিসমাপ্তি হইবে।

হে পরমাত্মন্! আমাদের কি মোহ। তুমি আমাদের আত্মার কল্যাণের নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মকে এই অসহায় বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছ। আমরা রোগে আতুর শোকে কাতর হইয়াও ইহার বলে তোমার উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনুষ্যজন্মকে সার্থক করিব। চারিদিকে পাশ্চাত্যশিক্ষা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মধ্যে পড়িয়া যাহাতে আমরা হৃদয়কে সরস রাখিতে পারি, এইজন্য তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমাদের সহায় করিয়া দিয়াছ। কিন্তু আমরা তোমার এই অযাচিত

দানের মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কালব্যাপী কুসংস্কারের ভিতরে পড়িয়া আধ্যাত্মিক জীবন মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, তুমি সঞ্জীবনী সুধা প্রেরণে আমাদিগকে সচকিত করিবার চেষ্টা পাইলে কিন্তু আমরা তোমার অমোঘ ঔষধের প্রয়োগবিধি অভ্যাস করিতে জানিলাম না। কোথায় তুমি তোমার স্বর্গের মন্দাকিনী জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রখর স্রোত আমাদের মধ্যে বহমান করিয়া দিলে যে আমাদের আত্মার মোহমলা জন্মের মত ধৌত বিধৌত হইয়া যাইবে; কিন্তু আমরা তোমার সেই স্বর্গীয় স্রোতকে নানা পথে ফিরাইয়া দিলাম। তোমার মহান উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। কোথায় তুমি সত্যের আলোকে আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়া দেবতাদিগের সহিত একপদবীতে বসিবার অধিকার দিলে, কিন্তু আমরা মর্ত্ত্যের ধুলিকণা, মর্ত্ত্যের আনন্দ লইয়া বিভোর হইয়া রহিলাম। কোথায় তুমি তোমার বৈরাগ্যমন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষিত করিলে, কিন্তু আমরা জানি না কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এখানে বৈরাগ্যের অগ্নি, কি সুখের মলয়হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে তাহা আমাদের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। ভগবন্! আমাদের এ আত্মবঞ্চনার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? আমরা সত্য সত্যই কি তোমার জন্য ত্যাগ করিতে পারিয়াছি। অতৃপ্ত বাসনাকে জিজ্ঞাসা করি, নিরাশাজনক উত্তর পাইয়া মর্ম্মাহত হই। তোমার উদ্যত বজ্র কি হিমাচলের শিখরদেশ, উন্নত শৃঙ্গ ভগ্ন করিতে বিব্রত থাকিবে, আর আমরা তোমার সন্তান পাষাণসমানকঠিন হৃদয় লইয়া অনাহতভাবে এখানে বিচরণ করিতে থাকিব। তুমি আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ কর, তোমার ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে শিক্ষা দাও, আমারদের সকল বল বীর্য্য তোমার সাধনে নিয়োগ কর, বৈরাগ্যের পথে তপস্যার পথে আমাদিগকে পরিচালিত কর। আমাদিগকে সংযত কর, তোমাকে দেখিয়া চক্ষুর ঘোর কাটিয়া যাউক, সকল ধ্বন্দা চলিয়া যাউক, সকল কোলাহল বিদূরিত হউক, আমরা তোমাকে একবার প্রশান্ত হৃদয়ে নিরীক্ষণ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং :

রাত্রিকালে বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র পুষ্পে সুসজ্জিত উৎসবক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য হইলে নিম্নোক্ত এই বেদগান হইল।

ঋগ্বেদ ৭ মণ্ডল ৮৬ সূক্ত।

বরুণ দেবতা, বসিষ্ঠ ঋষি।

ধীরা ত্বস্য মহিনা জনূংষি বি যস্তস্তম্ভ রোদসী চিদুর্বী।
প্র নাকমৃষ্বং নুনুদে বৃহন্তং দ্বিতা নক্ষত্রং পপ্রথচ্চ ভূম ॥১

১। এই বরুণ দেবের কার্য্য সকল গম্ভীর ও মহীয়ান্; ইনি এই বিস্তীর্ণ দ্যুলোক ও ভূলোককে স্বস্ব স্থানে অবস্থিত রাখিয়াছেন; ইনি (দিবসে) উজ্জ্বল ও বৃহৎ আদিত্যকে এবং (রাত্রিকালে) দর্শনীয় নক্ষত্রমণ্ডলকে প্রেরণ করেন এবং ইনি এই পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন।

উত স্বয়া তন্বা সংবদে তৎকদা ম্বন্তু র্বরুণে ভুবানি।
কিং মে হব্যমহৃণানো জুষেত কদা মৃড়ীকং সুমনা অভিখ্যং ॥ ২

২। আমি আপনি কি আপনাকেই ইহা বলিতেছি? কবে বরুণ দেবের সমীপস্থ হইব? তিনি কি আমার স্তোত্র অক্রুদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিবেন? কবে আমি সুমনা হইয়া সেই সুখদাতা বরুণ দেবকে দেখিতে পাইব?

পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষূপো এমি চিকিতুষো বিপৃচ্ছং।
সমানীমিম্মে কবয়শ্চিদাহুরয়ং হ তুভ্যং বরুণো হৃণীতে ॥৩

৩। হে বরুণ দেব! সেই পাপ (যাহার জন্য তোমাকে এখন দেখিতে পাইতেছি না) আমি তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে সে কি পাপ। আমি জিজ্ঞাসু হইয়া জ্ঞানীদিগের নিকটে গমন করিয়াছি; সেই পণ্ডিতেরা সকলেই আমাকে এই একই কথা বলেন যে "বরুণ দেব তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন"।

কি মাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ং।
প্রতন্মে বোচো দূড়ভ স্বধাবো হব ত্বানেনা নমসা তুর ইয়াং ॥ ৪

৪। হে বরুণ দেব! আমি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে তোমার স্তোতা ও সখা যে আমি, আমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? হে দুর্দ্ধর্ষ! হে তেজস্বিন্! আমাকে সেই পাপ বলিয়া দাও, যাহাতে আমি নিষ্পাপ হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক শীঘ্র তোমার নিকটে যাইতে পারি।

অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোঽব যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ।
অব রাজন্ পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠং ॥ ৫

৫। আমাদিগের পৈতৃক পাপ সকল বিমোচন কর; আমাদিগের স্বশরীরকৃত পাপ সকলও বিমোচন কর। রাজন! প্রায়শ্চিত্তান্তে পশুতর্পণকারী চৌরের ন্যায় এবং রজ্জুবন্ধন হইতে বৎসের ন্যায় বসিষ্ঠকে পাপ হইতে বিমুক্ত কর।

ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ।
অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে স্বপ্নশ্চনেদনৃতস্য প্রযোতা ॥ ৬ ॥

৬। হে বরুণ দেব! এই পাপ আমাদের স্বেচ্ছাকৃত নহে, ইহা অবশকৃত পাপ; সুরা, ক্রোধ, অক্ষ এবং অজ্ঞান এই সকলই পাপের কারণ। বয়স্ক ব্যক্তিরাও কনিষ্ঠদিগকে পাপে প্রবৃত্ত করায়; আবার স্বপ্নও অনৃতের প্রেরক।

অরং দাসো ন মীড়্হুষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েঽনাগাঃ।
অচেতয়দচিতো দেবো অর্যো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি ॥ ৭

৭। প্রভু সমীপে দাসের ন্যায় আমি নিষ্পাপ হইয়া সেই ইষ্টদাতা জগৎপালক বরুণ দেবের উপাসনা করি। সর্ব্বদর্শী প্রভু বরুণদেব অজ্ঞানীকে জ্ঞানদান করুন এবং তাঁহার স্তোতাকে ধনবান্ করুন।

অয়ং সু তুভ্যং বরুণ স্বধাবো হৃদি স্তোম উপশ্রিতশ্চিদস্তু।
শং নঃ ক্ষেমে শমু যোগে নো অস্ত যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮

৮। হে তেজস্বিন্ বরুণ! তোমারই উদ্দেশে রচিত এই স্তোত্র তোমার সমীপে উপনীত হউক। আমাদিগের যোগক্ষেম নিরুপদ্রব হউক; দেবগণের সহিত তুমি সর্ব্বদাই আমাদিগকে তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদের দ্বারা রক্ষা কর।

পরে একটী সঙ্গীত গীত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোল্লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অপৌত্তলিক ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম।

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং।
ভবাম্বোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

যে পরমদেবতা আমাদিগকে আজ এই সভামণ্ডপে আনয়ন করিয়াছেন, সেই সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই এবং তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করি।

যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কত শতসহস্র সূর্য্য

পরিভ্রমণ করিতেছে; যে ব্রহ্মাণ্ডে "যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক"; যেখানে ঐ অসীম আকাশস্থিত এক একটী নক্ষত্র এক একটী সূর্য্যসমান, সেখানে আমাদের এই পৃথিবী কত ক্ষুদ্র। আবার যে পৃথিবীতে শত শত সাধু মহাত্মা ব্যক্তি ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মোক্ষ-পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, সেখানে আমার ন্যায় দীনহীন মলিন বঙ্গবাসী কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর। আমার সাধ্য কি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় বিশুদ্ধ ধর্ম্মের সম্যক্ গুণ কীর্ত্তন করিতে পারি। আমি আমার দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার মধ্যে এমনি আবদ্ধ যে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ন্যায় উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের পক্ষসমর্থন করিয়া বিশেষ যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে পারিব, সে আশা করি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান আছেন, তেমনি অনন্তকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন, আমরা তাহা গ্রহণ করি বা নাই করি; আমরা তাহার পক্ষে দুটো কথা বলি বা নাই বলি। তবে আমি আজ এখানে কিছু বলিতে দাঁড়াইয়াছি কেন? এই যে সাধু-সজ্জনদিগের সমাগম হই-য়াছে, ইহঁদিগের নিকটে প্রাণের আশা ভরসার কথা বলিবার লোভ কে সম্বরণ করিতে পারে? আমিও সেই লোভে পড়িয়াই এখানে দণ্ডায়মান হইয়াছি এবং আমার ইহাও আশা আছে যে, আমার আশাভরসার কথা সমাগত সাধু সজ্জন-দিগের হৃদয়স্পর্শ করিবে এবং তাঁহাদিগের হৃদয়োত্থিত সহানুভূতি-বিশিষ্ট মুখশ্রীতে ঈশ্বরের মঙ্গলকিরণ দেখিতে পাইব।

আজই বা এত সাধু মহাত্মাদিগের সমাগম হইল কেন? অনন্ত আকাশে প্রতিদিন যে প্রভাততপন পূর্ব্বসমুদ্রকে রঞ্জিত করিয়া উদিত হয়, আজও প্রভাতে সেই সূর্য্যই উদিত হইয়াছিল প্রতি-দিন যেমন অযুতকোটি গ্রহনক্ষত্র নৈশ গগনকে হীরকখচিত করে, আজও সেই-রূপ নৈশ গগন হীরকখচিত হইয়াছে। প্রতিদিন যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আমা-দিগের জীবনদান করে, আজও সেই বায়ুই আমাদিগের জীবনদান করিতেছে। প্রতি-দিন যে জাহ্নবী বসুন্ধরাকে শস্যশ্যামল করিয়া প্রবাহিত হয়, আজও সেই জাহ্নবীই প্রবাহিত হইতেছে। তবে আজ এই সাধুসজ্জনদিগকে এখানে নব উৎসাহে, নব আনন্দে, জাগ্রতভাবে আসিতে দেখি কেন? ইহাঁরা কি এই গৃহপ্রাঙ্গনকে সুস-জ্জিতমাত্র দেখিতে ইচ্ছা করিয়া এখানে আসিয়াছেন? ইহাঁরা কি সঙ্গীতের সুমধুর স্বরমাত্র শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে আসিয়াছেন? আমার তাহা হৃদয়ে লয় না। গৃহপ্রাঙ্গন প্রতি বৎসরই সুস-জ্জিত হয়, তাহাতে নূতনত্ব কোথায়? এই গৃহপ্রাঙ্গন অপেক্ষা কত শত গিরি-কানন উপবন অধিকতর সুসজ্জিত আছে, কিন্তু আজ তো তাহারা আমাদিগকে প্রলোভন দেখাইতে পারিতেছে না। সঙ্গীতের সুমধুর স্বরই যদি এই সাধু-সমাগমের কারণ হয়, কত মধুরতর সঙ্গীত আরও কতস্থানে গীত হইতেছে, কিন্তু সেই সকলতো আজ আমাদিগকে প্রলো-ভিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। তবে আজ কিসের কারণে এই সাধুসমাগম? অদ্যকার দিনে কি নূতনত্ব আছে যে, তাহার বলে আকৃষ্ট হইয়া আজ আমরা এই শুভ স্থানে সমাগত হইয়াছি?

অদ্য ব্রহ্মোৎসবের দিবস। এই ব্রহ্মোৎসবে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর স্বয়ং আমা-দিগকে আনয়ন করিয়াছেন। তিনি চির-

পুরাতন হইয়াও এই ব্রহ্মোৎসবের নূতনত্ব বিধান করিতেছেন। তাঁহারই প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আমরা নবোদ্যমে নবোৎসাহে বৎসরান্তে পুনরায় একত্র সম্মিলিত হইয়াছি। আজ আমরা তাঁহার করুণা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছি। আজ, সুহৃৎগণ, এস, দ্বেষহিংসা হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করি। যখন পৌত্তলিকতা এবং তীব্র জাতিবিরোধের ন্যায় বলবৎ সম্প্রদায়বিদ্বেষরূপ বিষকীট, উভয়ে মিলিত হইয়া এই পবিত্র ভারতভূমির অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জরাজীর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময়ে ঈশ্বর যে উদারহৃদয় মহামনা ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন, তাঁহার মনে একটা গুরুতর অভাব বোধ হইতে লাগিল। কি সত্যধর্ম্মের উপরে সকলে মিলিতে পারে, কিসে পরস্পরের মধ্য হইতে উপধর্ম্মমূলক বিরোধ বিবাদ চলিয়া যাইতে পারে, এই প্রশ্নই তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। তৃষ্ণা দিয়া তৃষাতুরের জন্য যিনি জলের সৃজন করিয়া দিয়াছেন, ক্ষুধা দিয়া যিনি ক্ষুধাতুরের জন্য অন্নের সৃজন করিয়া দিয়াছেন, তিনিই তাঁহার হৃদয়ের সেই অভাব পূরণ করিয়া দিলেন। সেই মহানুহৃদয় ক্ষণজন্মা পুরুষ একাকী নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের সকলেরই মধ্যে অত্যন্ত উদার ও অসাম্প্রদায়িক সত্য ধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি তাঁহাই প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনিই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ত্তমান কালে সাম্প্রদায়িকতারূপ বাঁধ ভাঙ্গিবার প্রথম সূত্রপাত করিলেন।

জগতে যতগুলি ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সকলগুলিই প্রায় সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর দ্বারা আবদ্ধ। প্রায় সকল ধর্ম্মেই এমন এক এক সাম্প্রদায়িক ভাব, সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান বিদ্যমান আছে, যাহা অবলম্বন না করিলে সেই সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মনেই হয় না যে ধর্ম্ম সিদ্ধ হইল। কোন ধর্ম্ম বলিল যে অমুক মহাপুরুষকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানিতে হইবে; কোন ধর্ম্ম বলিল যে অমুক মহাপুরুষকে ঈশ্বরের একমাত্র প্রেরিত বলিয়া মানিতে হইবে। একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মেই সাম্প্রদায়িকতার এতটুকুও গন্ধ পাওয়া যায় না, দ্বেষহিংসার উল্লেখ নাই, আত্মাভিমানের স্ফীতি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদারভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে 'মনুষ্যমাত্রেরই আত্মাতে ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাওয়া যায়। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি কালবিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই।' যেমন পৃথিবীর যাবতীয় নদী সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ একমাত্র পরমেশ্বরই সকল মনুষ্যেরই গম্যস্থল। "নৃণামেকো-গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব।" এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন অতীত কালের ধর্ম্ম, তেমনি বর্ত্তমান কালেরও ধর্ম্ম; যেমন বর্ত্তমান কালের, তেমনি ভবিষ্যত কালেরও ধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন বঙ্গদেশের ধর্ম্ম, তেমনি সমগ্র ভারতেরও ধর্ম্ম; যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র পৃথিবীরও ধর্ম্ম; যেমন পৃথিবীর, তেমনি ইহা প্রতিজনেরও ধর্ম্ম; ইহাই সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম এবং ইহাই মানবের সহজ ধর্ম্ম।

আজকাল আমরা এই সনাতন সত্যধর্ম্মের—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে বিশেষ আশান্বিত হইতেছি। চারিদিক হইতেই

অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অন্বেষণে সকলকেই ব্যস্ত দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে—ইউরোপে, আমেরিকায়—এই বিষয়ের বিশেষ আন্দোলনই দেখা যাইতেছে; সেখানে মহাত্মা লোকেরা ধর্ম্মবিষয়ক দলাদলিতে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া এখন ধর্ম্মের এমন কতকগুলি মূলসত্য অন্বেষণ করিতেছেন, যেগুলিতে তাঁহারা নির্ব্বিবাদে একত্র মিলিতে পারেন। এই বিষয়ের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, ধর্ম্মের এই মূলসত্য অন্বেষণের প্রারম্ভ ভাগে ব্রাহ্মধর্ম্মই বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। কি পরিতাপের বিষয় যে, আমরা তেমন শোভনসুন্দর, আকাশের ন্যায় মুক্ত ও উদার ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। আমরা দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের যে তরঙ্গ পশ্চিম সমুদ্রে গিয়াছিল,এখন তাহা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বিস্তৃত আকারে ভারতে আসিয়া লাগিয়াছে। এখন, ব্রাহ্মধর্ম্মের, তাঁহাকে যে নামেই অভিহিত কর না কেন,—ব্রাহ্মধর্ম্মের দুর্দ্ধর্ষ তেজ নিরীক্ষণ করিয়া নাস্তিকেরাও ভয়ে কম্পমান হইতেছে, আপনাদিগকে নাস্তিক বলিতে ইচ্ছা করে না, বরঞ্চ তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য সকল গ্রহণ করিতেছে। আমাদের এইটুকু দুঃখ যে, আমরা যে এতদিন অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিয়া আসিতেছি, স্বদেশীয়গণ তাহা তত আদরে গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু যেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহার প্রশংসা করিলেন, অমনি স্বদেশীয়গণ তাহার প্রতি আদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহাতে আমরা যে এক ধর্ম্মধনে ধনী ছিলাম, সেই ধর্ম্মবিষয়েও কত পরাধীন, কত দুর্ব্বল, কত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল কেন্দ্র দুইটী—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। পরমাত্মা সমুদ্র, জীবাত্মা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী। সমুদ্র না থাকিলে যেমন কোন স্রোতস্বতী থাকিতে পারে না, পরমাত্মাকে ছাড়িয়া জীবাত্মার অস্তিত্বই সম্ভবে না। পরমাত্মা সূর্য্য, জীবাত্মা চন্দ্র। সূর্য্যের কিরণেই যেমন চন্দ্র কিরণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ পরমাত্মার অস্তিত্বে জীবাত্মার অস্তিত্ব, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানে জীবাত্মার পরিমিত জ্ঞান, তাঁহার অনন্তত্বেই জীবাত্মার পরিমিত ভাব। পরমাত্মা আতপ, জীবাত্মা ছায়া। যেমন আতপ ব্যতীত ছায়া থাকিতে পারে না, তেমনি পরমাত্মার আশ্রয় ব্যতীত জীবাত্মার সত্তার সম্ভব হয় না। "ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি" ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞেরা তাঁহাদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় (পরস্পর ভিন্ন) করিয়া বলেন। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অতি মধুর সম্পর্ক। তিনি পিতা, আমরা পুত্র। "সনো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা" তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের বিধাতা।

আমরা যেমন আত্মপ্রত্যয় অবলম্বনে পরমাত্মাকে জানিয়া কৃতার্থ হইতেছি, প্রাচীন ঋষিরাও তাঁহাদের পরিপুষ্ট ও সুমার্জ্জিত সহজজ্ঞানে ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেমন সহজে পরমাত্মাকে "একাত্মপ্রত্যয়সারং" একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ই যাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ—বলিলেন। তাঁহারা কেমন বলের সঙ্গে বলিলেন

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে॥"

তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বারা, কি

চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হন না; যে ব্যক্তি বলে যে, তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন? "এই আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করিতে গেলে একেবারে যুক্তির মূল ছেদন করা হয় এবং মহাভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয়। তাহা হইলে আপনার অস্তিত্বে, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে এবং কার্য্য-কারণের অস্তিত্বে সংশয় জন্মিয়া বুদ্ধি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর না করেন, তিনি কথনো জ্ঞানগোচর নিত্য সত্য মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ পুরুষকে নিঃসংশয়রূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না, প্রতি তর্কের তরঙ্গে তিনি অস্থির হন এবং ঈশ্বরসহবাস-জনিত সুনির্ম্মলা শান্তি কদাপি লাভ করিতে পারেন না।" *

ব্রাহ্মধর্ম্মের কেন্দ্রদ্বয় পরমাত্মা ও জীবাত্মা এবং তাহার ভিত্তি আত্মপ্রত্যয়, এই কারণে একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হইতে পারে; কারণ এই তিনটী সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে, জাতি নির্ব্বিশেষে, ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিজস্ব। ইহার বাহিরে গিয়া পরিমিত সৃষ্ট কোন বস্তুকে ঈশ্বরের সিংহাসনে রাখিয়া তাহার পূজা আরম্ভ করিলেই তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা আসিবে। সাম্প্রদায়িকভাব প্রবেশ করিলেই সত্যধর্ম্ম কলুষিত হইয়া যাইবে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া বেদ যাঁহাকে বারম্বার ঘোষণা করিয়াছেন এবং আমাদের আত্মাও যাঁহাকে ঐ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া সহজেই জানিতেছে, যাঁহার স্বরূপই হইল অনন্তত্ব, তিনি কথনো দেশে, কালে, জ্ঞানে, শক্তিতে, কি কোন বিষয়ে পরিমিত হইতে পারেন না। "নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ" ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হন নাই। ইনি নির্ব্বিকার, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব।

এই আত্মপ্রত্যয় অবলম্বনে আমাদিগের এমন দুইটী প্রধান বিঘ্ন বাঁচাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে চালাইতে হইবে—পরিমিত সৃষ্ট বস্তুর পূজা এবং নাস্তিকতা। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মতরণী বর্ত্তমান সংসারস্রোতের প্রতিকূলে চলিতেছে, কিন্তু যতক্ষণ ইহা আমাদিগকে লক্ষ্যস্থান ব্রহ্মধামে লইয়া না যাইবে, ততক্ষণ ইহা আর কোথায়ও দাঁড়াইতে পারিবে না—স্রোতের একদিকে সৃষ্ট-বস্তুর পূজারূপ প্রস্তররাশি, তথায় লাগিলেই তরণীখানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে; অপর দিকে নাস্তিকতার "কাছাড়-ভূমি," তথায় লাগিলেই প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তরণীকে একেবারে জলমগ্ন করিয়া দিবে। আমরা যদি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-তরণীকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মধামের দ্বারে পৌঁছিতে পারি, তবে, যেমন হরিদ্বার হইতে ভগীরথ কর্ত্তৃক আনীত গঙ্গা-নদী আর্য্যাবর্ত্তকে শস্যশ্যামল, ফলফুলে সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মধামযাত্রীর প্রত্যেকেই ব্রহ্মধামের দ্বার হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের এমন এক এক প্রবল স্রোত আনয়ন করিবেন, যে সকল স্রোত কেবল বঙ্গদেশকে কেন, কেবল ভারত-বর্ষকে কেন, সমগ্র জগৎকে আপ্লাবিত করিয়া দিবে এবং জ্ঞানপ্রেমভক্তি পবিত্রতা প্রভৃতি শস্যসমূহ উৎপাদিত করিয়া এই কঠিন ধরণীকে শ্যামল করিয়া তুলিবে।

আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কিরূপ অসাম্প্রদায়িক, সাম্প্রদায়িকতার কঠিন শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার কি কঠোর ব্রহ্মাস্ত্র, তাহার

* ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ম খণ্ড, ১২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য।

পরিচয় ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। এই ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের মূল মন্ত্র এই "সর্ব্বস্রষ্টা, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, অপ্রতিম ও নিরবয়ব পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ উপাসনা দ্বারাই আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।" এই ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে যিনি বিশ্বাস করিবেন, তিনিই ব্রাহ্ম, তিনিই ব্রহ্মোপাসক; আর এই ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে কে না সম্পূর্ণ সায় দিবে? ঈশ্বর স্বয়ং সকলের মিলনের ভিত্তিভূমি করিয়া এই উদার ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ প্রেরণ করিয়াছেন। যতদিন পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধমূলক এই বীজ অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে; ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলপ্রকার সাম্প্রদায়িক বন্ধন চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারিবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অসাম্প্রদায়িক বলিয়াই ইহা সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। কেহ কেহ বলেন বটে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলে ধারণা করিতে পারে না এবং সুতরাং ইহা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নহে—তাহা নিতান্তই ভ্রম। আমি অসভ্য সাঁওতালদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা আকাশের দিকে কেমন প্রশস্তভাবে হাত বাড়াইয়া বলিল যে তাহাদের প্রধান দেবতা ঐ আকাশের মধ্যে। কবীর বড় বিদ্বান্ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীত দেখ—কি গভীর জ্ঞানের কথা—

পানিমে মীন পিয়াসীরে
মোহ শুনত শুনত লাগে হাসিরে।
পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘট বরতে খোজত ফেরত উদাসীরে।
আত্মজ্ঞান বিনা নরভটকে কেয়া মথুরা কেয়া কাশীরে।
কহত কবীর শুন ভাই সাধো সহজ মিলে অবিনাশীরে।

জলের মধ্যে মৎস্য বাস করিয়াও তৃষ্ণাতুর, এ কথা শুনিয়া আমার হাসি আসিতেছে। সকল বস্তুতেই পূর্ণব্রহ্ম, আর লোকে উদাসী হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া ফেরে। আত্মজ্ঞান বিনা মনুষ্যের মথুরাই বা কি আর কাশীই বা কি। কবীর বলে, শুন ভাই সাধু, অবিনাশী পরব্রহ্মকে সহজেই পাওয়া যায়।

নানক কি সুন্দর ভাষায় বলিতেছেন

"থাপিয়া ন জায়ি কীতা নু হোই
আপি আপ নিরঞ্জন সোই।"

কেহ তাঁহাকে কোথাও স্থাপনা করিতে পারে না; কেহ তাঁহাকে হাত দিয়া গড়াইতেও পারে না;—আপনাতে আপনি, নিরঞ্জন তিনি। এইরূপে একদিকে কবীর, নানক, দাদু, প্রভৃতি সাধক—যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, অপরদিকে উপনিষদাদির জ্ঞানী ঋষিগণ, ইহাঁদের দিকে চাহিয়া দেখিলে কোন প্রকারে অস্বীকার করিতে পারি না যে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদ্বান্ অবিদ্বান্, ধনী দরিদ্র সকলেরই উপযোগী। তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম একথা বলেন যে, যে পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া আত্মার অন্তরাত্মাকে অন্বেষণ করিবে, তাহারই নিকটে সেই স্বপ্রকাশ প্রকাশিত হইবেন।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।"

যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

"ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাঁহারে, প্রেম দাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি; যে জন যায় নাহি ফেরে।"

ভ্রাতৃগণ! আইস, আমরা এই অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে পরব্রহ্মের পূজা করিয়া কৃতার্থ

হই। সমস্ত হৃদয়ের সহিত সেই এক-মেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের জয়ঘোষণা করি। সংশয় ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান করি এবং জাগ্রৎ হই। যে ব্রহ্ম-বিদ্যা অবলম্বন করিয়া এক সময়ে এই ভারতবর্ষ উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং যে ব্রহ্মবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া আজ আমরা এত হীন হইয়া পড়িয়াছি, এস, সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে প্রাণ-পণে অবলম্বন করি, অচিরাৎ উন্নতি দেখিতে পাইব। কে বলে যে ব্রহ্ম-বিদ্যা আজ মৃতপ্রায়? ব্রহ্মবিদ্যার উৎ-পত্তি যখন অবিনশ্বর ঈশ্বর হইতে, তখন তাহা মৃতপ্রায় হইবে কিরূপে? তাহা যদি মৃতপ্রায় হইবে, তবে তাহা কি প্র-কারে আজ আমাদিগের অন্তরে প্রাণ আনয়ন করিতে সক্ষম হইল? এস, সেই ব্রহ্মবিদ্যার বলে প্রাণবান্ হইয়া 'সকল ছলনা ছাড়ি বিমল করি অন্তর করি স্বার্থ বলিদান সত্যের উদ্দেশে।' অপমান অব-নতি প্রভৃতি অমঙ্গলরাশি নিমেষে ঘুচিয়া যাইবে এবং ভারতের উপরে পুনরায় মঙ্গ-লবায়ু প্রবাহিত হইবে। এস, সকলে একহৃদয়ে পরস্পরকে বলি

"এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।"

এই আত্মস্বরূপে অবস্থিত নিত্য পর-মাত্মাই জ্ঞেয়, ইঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই।

"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃত লাভের সেতু।

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

তাঁহাকেই জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির অন্য পথ নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গম্ভীর স্বরে এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

যিনি অসীম আকাশে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি রাজাধিরাজ ত্রিভুবন পালক, যাঁহার শাসনে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষে ধাবিত হইতেছে, যিনি সকলের পিতা মাতা ও পরম গুরু, যাঁহার করুণা আমরা নিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত উপভোগ করিতেছি, যিনি হৃদয়ে হৃদয়ে বর্ত্তমান, যিনি সকল আত্মার অন্ত-রাত্মা, যিনি প্রীতির এক মাত্র প্রস্র-বণ, তিনি এই ব্রহ্মোৎসবের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি এই পবিত্র মাঘের একাদশ দিবসের উৎসাহদাতা। তিনি শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। আমরা যে-মন তাঁহার উপাসনার জন্য এখানে উপ-স্থিত হইয়াছি, সম্বৎসর পরে উৎসবের উদয়ে যেমন আমরা একহৃদয় হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি-পুষ্প-অঞ্জলি দিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি, তেমনি সেই মহান বিভু সর্ব্বাশ্রয় এক-মেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ-পুরুষ আমাদিগের পূজা গ্রহণের জন্য এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, এখানকার প-বিত্র সমীরণ তাঁহার পবিত্রতার সঙ্গে বহ-মান হইতেছে। সেই জ্ঞান-জ্যোতি এখান-কার এই জ্যোতিকে বিদীর্ণ করিয়া আমার-দিগকে অবলোকন করিতেছেন, এই আলোকের মধ্যে সেই বিশ্বতশ্চক্ষুর জ্ঞান-চক্ষু অনিমেষ রহিয়াছে, তাঁহার মাতৃ-স্নেহ-

দৃষ্টি আমারদিগকে উৎসাহ দিতেছে, সেই উৎসাহে পূর্ণ হইয়া আমরা তাঁহার ক্রোড়ের অভিমুখীন হইতেছি। তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে প্রকাশিত রহিয়াছেন, আইস আমরা সকলে মিলিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিয়া জীবনকে সার্থক করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই উপদেশ প্রদান করিলেন।

আমরা এই মাত্র শুনিলাম যে "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ" যৌবনেই ধর্ম্মশীল হইবে। যৌবনেই মানবজীবনের সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয়। প্রস্ফুটিত কুসুমের সম্পদ যেমন তাহার সুগন্ধ, যৌবন- সৌন্দর্য্যে ধর্ম্মভাবই তাহার সম্পদ। পুষ্পিত বৃক্ষের গন্ধ যেমন দূরে প্রবাহিত হইয়া জনগণকে আমোদিত করে, সেইরূপ যে জীবন হইতে ধর্ম্মের সৌরভ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে সে জীবন দূরস্থ মানব-হৃদয়কে প্রেমার্দ্র করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও অনুরাগ-রঞ্জিত করে এবং সেই জীবনই পরকালের সম্বল সংগ্রহ করিয়া স্বর্গদ্বারে উপনীত হইতে পারে। অতএব যৌবনেই ধর্ম্মশীল হইবে। এই সময়েই মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকল প্রবল হইয়া উদ্দাম অশ্বের ন্যায় আপনাপন বিষয়ের প্রতি তাহাকে বহন করে এবং রিপুসকল তস্করের ন্যায় তাহার হৃদয়কন্দরে প্রবেশ করিয়া তাহার সুমতিকে বিনাশ করিয়া দুর্ম্মতিকে তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা পায়। যিনি ধীর, প্রাজ্ঞ, তিনি সুবুদ্ধিবলে সেই পরাক্রান্ত ইন্দ্রিয়দিগকে ধর্ম্মরজ্জুতে বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে সুপথে নিয়মিত করেন এবং শম দম উপরতি সাধন দ্বারা রিপুগণের বল খর্ব্ব করিয়া তাহাদিগকে আত্মার অধীনস্থ করেন। এ সংসারে এই প্রকার ব্যক্তিরই জয়। যাহারা অনুচিত পাপকার্য্যের প্রতি মনকে আসক্ত হইতে দেয় তাহারা পরলোকজ্ঞানবিহীন নির্ব্বোধ। তাহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া ক্ষুদ্র কামনার বিষয়েরই পশ্চাৎ গমন করে, "তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্" তাহারা বিস্তৃত মৃত্যুর পাশেই বদ্ধ হয়। তাহারা আপাতমনোরম অস্থায়ী বিষয়-সুখ লাভ করিয়াই তুষ্ট থাকে, কিন্তু ধীর ব্যক্তি সেই ধ্রুব অমৃত রসের আস্বাদন পাইয়া সেই রস-স্বরূপ তৃপ্তিহেতু পরমেশ্বরে আপনার সকল কামনা বিন্যস্ত করেন, তিনি অসার সংসারের নিকৃষ্ট বিষয়-সুখ প্রার্থনা করেন না। ধর্ম্মই এই অমৃত রস লাভের উপায়। ধর্ম্ম-সাধন দ্বারা পবিত্র হইয়া পবিত্রস্বরূপকে পাওয়া যায়। জ্ঞান ও ধর্ম্ম মানবের হৃদয়-কন্দরস্থ অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত করিয়া তথায় সেই প্রকাশবান্ পরমেশ্বরের পবিত্র মঙ্গল-জ্যোতি বিস্তার করে।

"ধর্ম্মোবিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।"

ধর্ম্ম বিশ্বজগতের আশ্রয়, সংসারে লোকেরা ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষের নিকট গমন করে, ধর্ম্মে পাপ অপনীত হয় এবং ধর্ম্মে সকলই প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, এই জন্য ধর্ম্মই সকল পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মের পুরস্কার বিষয়-সুখের আকর ধন-ধান্য, হয় হস্তী সাম্রাজ্য লাভ অথবা ইন্দ্রত্ব পদ লাভও নহে। ধর্ম্মের পুরস্কার স্বয়ং সেই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম যাঁহার প্রার্থনীয়, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মানন্দ যাঁহার লক্ষ্য, ধর্ম্ম তাঁহার অনুকূল হইয়া তাঁহারই প্রার্থ-

নীয় প্রিয়তমকে তাঁহার নিকট আনিয়া দেন।

ব্রহ্মলাভাকাঙ্ক্ষী ধার্ম্মিক এবং বিষয়-কামী সংসারী এই উভয়েরই উপরে ধর্ম্মের হস্ত রহিয়াছে—ধর্ম্ম একজনের হৃদয়-বন্ধু এবং আর এক জনের কঠোর শিক্ষক, কারণ দুই জনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন নীচ স্বার্থপরতা, হৃদয়ের কুটিল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সংসারে বিচরণ করে আর একজন ঈশ্বরলাভের উদ্দেশে সংসারধর্ম্ম পালন করেন। ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিয়া যাহারা কেবল অহরহ বিষয়েতে অনুরক্ত রহিয়াছে মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় ঈশ্বর তাহাদের নিকট অপ্রকাশিত রহিয়াছেন। সে অমৃতরূপ আনন্দমুখ তাহারা দেখিতে পায় না। সেই বিষয়লোলুপ মোহান্ধ ব্যক্তিরা সুশীতল বারিজ্ঞানে মরীচিকাকে আলিঙ্গন দিতে যায়, আরো উত্তপ্ত হইয়া ফিরিয়া আইসে—নিরাশা তাহাদিগের রসনাকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। তাহারা অন্যায়ার্জ্জিত সম্পত্তি ও পাপপ্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে চাহে না, তাঁহা হইতে আরো দূরে থাকিবার চেষ্টা করে, সুতরাং নির্ভয় হইতে পারে না। তাহারা বিষয়াকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা না দেখিয়া শোকই করিতে থাকে। ঈশ্বরের ন্যায়দণ্ড তাহাদের মস্তকের উপর উদ্যত বজ্রের ন্যায় উত্থিত দেখে এবং ঈশ্বরের ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং রুদ্রমূর্ত্তি তাহাদিগের হৃদয়কে সর্ব্বদা কম্পিত করিতে থাকে। তাহাদিগকে এই সকল যন্ত্রণা তাড়না কেন ভোগ করিতে হয়? সেই পরম গুরু, পাপীর দণ্ডবিধাতা মঙ্গলময়ের অভিপ্রায় এই যে তাহারা বিষয়সুখেতেই তৃপ্ত না থাকুক। তাহারা আপনার হীন লক্ষ্য পরিত্যাগ করুক, তাহারা সর্প-সমাকুল ভীষণ অরণ্য হইতে আপনার পিতার আলয়ে ফিরিয়া আসুক, যেখানে মোহ শোকের বল নাই, সংসারযন্ত্রণার ধার নাই, পাপ তাপের অধিকার নাই।

এই পৃথিবী ও ঐ অগণ্য লোকলোকান্তর এবং তদুপরিস্থ অসংখ্য অগণ্য জীব, নানা পদার্থ ও বিবিধ ভিন্ন ভাবরাশি যাঁহার স্বহস্তলিখিত জীবনচরিত্র রূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং এই সৃষ্টির রচনা-কৌশল যাঁহার অশেষ বিজ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে, যে ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি প্রতিদিন যথানিয়মে সেই মহেশ্বরের তত্ত্ব-রস পান করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন, প্রত্যহ নিয়মিত রূপে তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার শক্তি, তাঁহার দয়া, তাঁহার স্নেহ, তাঁহার প্রীতি আমাদের জীবনে কি অতুলনীয় ভাব বিস্তার করিতেছে তাহা চিন্তা করেন এবং তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করিয়া সেই সর্ব্বসাক্ষী সনাতন পুরুষকে অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান দেখেন, তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রেমধারা উত্থিত হইয়া সেই অনন্ত প্রেমসাগরে প্রবাহিত হয় এবং তিনি সেই অনুপম প্রেমরসের আস্বাদ পাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাই ভোগ করিতে ব্যস্ত থাকেন। সংসারের সকল সুখই তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হইয়া উঠে।

তিনি কি পুণ্যবান্ ব্যক্তি, যিনি বহু ত্যাগ ও বহু অন্বেষণ পরে সকল কামনার পরিসমাপ্তি অনন্ত সুখের আকর সেই অজর, অমর, অভয় পুরুষকে লাভ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কি ভাগ্যবান্ যিনি সর্ব্বত্র তাঁহার আবির্ভাব জাজ্বল্যমান দেখিতেছেন। তিনি যখন চক্ষু উন্মীলন করেন তখন দেখেন যে স-

কল বিশ্বের একাধিপতি ও পরমাশ্রয় সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন এবং যখন তিনি চক্ষু নিমীলন করেন, তখন স্তব্ধ হইয়া সেই চেতনের চেতনকে, আত্মার আত্মাকে অন্তরে দর্শন করেন। সেই ঈশ্বরপরায়ণ ভাগ্যবান্ পুরুষ এই প্রভাকরকিরণে ঈশ্বরেরই প্রভা, চন্দ্রমণ্ডলে তাঁহারই শোভা, নক্ষত্রগহনে তাঁহারই জ্যোতি, পুষ্পে পুষ্পে তাঁহারই সৌন্দর্য্য, মাতার হৃদয়ে তাঁহারই স্নেহ,দয়ালুর হৃদয়ে তাঁহারই দয়া এবং সকল বিশ্বে তাঁহারই ভাবের আবির্ভাব দেখিয়া অমৃত স্রোতে অবগাহন করিতে থাকেন। তিনি জ্ঞানচক্ষে দেখিতে থাকেন যে সেই ভক্ত যোগীর ঈশ্বর সত্যের সত্য প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন মঙ্গল স্বরূপ। যে মঙ্গলময়ের জ্ঞান ও শক্তিতে এই বিচিত্র বিশ্ব আবির্ভূত হইয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাঁহার সেই নিগূঢ় তত্ত্ব ভাবিতে গিয়া মন স্তব্ধ হয়। যিনি ব্রহ্মগতপ্রাণ, ধর্ম্ম যাঁহার অন্নপানের ন্যায় আত্মার পুষ্টিসাধক ও অনন্তের পথে সহায় তিনি দিনে নিশীথে সমভাবে তাঁহার করুণা অনুভব করেন। তিনি দেখেন সেই জগৎপ্রসবিতা এই সূর্য্যের উদয়াস্ত সময়ের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" চিরকাল যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা বিধান করিতেছেন এবং সূর্য্য অস্ত হইয়া গেলে রজনীতেও "এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।" যখন আমরা নিদ্রাতে অবিভূত থাকি তখনও তিনি জাগ্রত থাকিয়া আমাদিগের কাম্য বস্তু সকল নির্ম্মাণ করিতেছেন। ঈশ্বরের এইরূপ করুণা সন্দর্শন করিয়া ভক্তহৃদয় বিগলিত হয় এবং তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে থাকে। তাঁহার কণ্ঠও নীরব থাকিতে পারে না, মধুরস্বরে গাহিয়া উঠে—

"অপার করুণা তোমার জগতের জনক, জননী অখিলবিধাতা।

নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব, কি দিব তোমায়, কি আছে আমার।

সব মোর লহ তুমি প্রাণ, হৃদয়, মন, তোমা বিনা চাহি না চাহি না কিছু আর,

সম্পদ বিষসম তোমায় ছাড়িয়ে; না জানি কি রস পায় বিষয়-রসে তোমারে ভুলিয়ে।"

যেমন পিতার জীবন পুত্রদিগের সুখের নিমিত্ত, যেমন দয়ালুর জীবন অনাথের দুঃখ নিবারণের জন্য, সেইরূপ সেই ধর্ম্মাবহ পাপনুদ ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম কেবল জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত। যিনি যে পরিমাণে তাঁহার মঙ্গল নিয়মের অধীন হইয়া চলিবেন তৎপরিমাণে তিনি শান্তি ও সুখ লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার নিয়মের অধীন হইয়া চলিলে যদি এক গুণ স্বর্গীয় সুখ লাভ হয়, তাঁহার প্রেমের প্রেমিক হইয়া তাঁহার নিয়মের অধীন হইয়া চলিলে তাহার শত গুণ সুখ লাভ করা যায় এবং মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। তিনি পুরাণ পুরুষ, তিনিই প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য মুক্তহস্ত। অতএব এস আমরা সকলে মুমুক্ষু হইয়া তাহার শরণাপন্ন হই।

"তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তৎপরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয় এই প্রার্থনা করিলেন।

নাথ! আজি ব্রহ্মোৎসব—অতি পবিত্র দিন, এই শুভদিনে শুভক্ষণে হৃদয়পদ্ম তোমার কিরণস্পর্শে সহজেই প্রস্ফু-

টিত হইয়া তোমার চরণে অবনত হই-তেছে। ব্রহ্মানন্দ আজি এই স্থানকে অধিকার করিয়া কি অমৃত রসেই ইহাকে অভিষিক্ত করিতেছে। একটি নয়, দুইটি নয়, শত শত হৃদয়পদ্ম এই আনন্দহ্রদে প্রস্ফুটিত হইয়া তোমার চরণতলে কি শোভাই ধারণ করিয়াছে। কি মনোহর দৃশ্য! ব্রহ্মানন্দের উৎস আজি তুমিই খুলিয়া দিয়াছ। সে পবিত্র জলে স্নান করিয়া কি সুখ কি শান্তি! হে শান্তিদাতা তোমার প্রদত্ত এ সুখ শান্তি লাভ করিয়া কি বাক্যে তোমার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব তাহা খুজিয়া পাই না। তথাপি প্রাণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ব্যাকুল; সে এখন অন্তরে অন্তরে যাহা কিছু নীরবে তোমার নিকটে প্রকাশ করি-তেছে, তুমি কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ কর, সে চরিতার্থ হউক। হে পরমাত্মন্! তুমি আজি অন্তরে সাক্ষাৎ পিতা মাতা রূপে দেখা দিতেছ, তোমার হস্তাবলম্বন প্রাপ্ত হইয়া এখন আমরা কেমন নির্ভয় হইয়াছি। ভব-ভয় আজ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে। যেন এমনিই নি-র্ভয় হইয়া উৎসাহের সহিত চিরদিন তো-মার চরণ সেবা করিতে পারি, তুমি এই-রূপ আশীর্ব্বাদ কর। এমন কি আছে যাহা তোমার আশীর্ব্বাদে না হইতে পারে।

আমি যোড়করে আজি তোমার আশী-র্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তোমার আশীর্ব্বাদে আমি যেন পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিরুদ্বেগে তোমার উপাসনা করিতে পারি। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা আমাকে জ-ন্মের মত পরিত্যাগ করুক। তোমার মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস যেন অচলের ন্যায় আমার আত্মায় স্থির থাকে। নাথ! আ-মার ইচ্ছা দিন রাত্রি তোমার ঐ মঙ্গলরূপ জ্ঞানচক্ষে—বিশ্বাস চক্ষে দেখি, কিন্তু দীন হীন আমি—তাহা আমার ভাগ্যে ঘটেনা। আমার ইচ্ছা

"চাহি সদা তোমার সঙ্গে থাকি,
কেমনে মোহ আসি ভুলায় সে মন।
কেমনে পাব আমি তোমায়,
দেখা দাও ভবতিমিরে।"

হে অনাথ-নাথ! তুমি আমাকে বি-বেক ও বৈরাগ্য দাও, আমার প্রাণ উদাস হউক। অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি ও মমতা জনিত যে যন্ত্রণা, তাহা হইতে তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে দয়াময়! এশুভ দিনে তোমার নিকটে এ সংসারের অনিত্য বস্তু আর কি প্রার্থনা করিব? ইহারা এই আছে এই নাই। ধন জন জীবন যৌবন স্ত্রী পুত্র সকলি অস্থায়ী। সংসারে দিন রাত্রি এই অস্থায়ী পদার্থের অভিনয় হই-তেছে।

প্রাতে দেখিলাম পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবর আলোকিত করিয়া আছে, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই সে মলিন হইয়া গেল। কুমুদ সন্ধ্যার সময় প্রস্ফুটিত হইয়া জ্যোৎ-স্নার সঙ্গে ক্রীড়া করে, রজনীর অবসান হইতে না হইতেই সে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এখানকার গোলাপ পুষ্প কণ্টক-হীন নহে। এখানে মধুচক্র হইতে মধু আহরণ করিতে গেলেই মধুমক্ষিকার দংশন সহ্য করিতে হয়। এ সংসারের প্রকৃতিই এইরূপ। সত্যই ইহা মৃত্যুর প্রতিকৃতি। "এই সংসার সুখের স্থান নহে, ঈশ্বর এ সংসারকে সুখের স্থান করিয়া দেন নাই। এখানকার সকল সুখ দুঃখরূপে পরিণত হইতেছে। যাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাই, সে শত্রুর রূপ ধারণ করিতেছে। যাহার নিকট

হইতে সকল প্রত্যাশা করা যায়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যেখানে কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করি, সেখানে কৃতঘ্নতা। যেখানে নির্ভর করিতে যাই, সেই সেই স্থান হইতেই ফিরিয়া আসি।”

এখানকার সুখ, দুঃখের সহিত এপ্রকার জড়িত আছে, যে এ সুখকে সুখই বলিতে ইচ্ছা করে না॥ “উন্মীলি নিমীলয়ে” উন্মীলিত হইয়াই নিমীলিত হয়।

এ সংসার আতপের মধ্যে মধ্যে একটু একটু একটু ছায়া আছে বটে, কিন্তু সে ফণি-ফণার ছায়া। তাহা শান্তি বৃদ্ধি না করিয়া বরং আশঙ্কাই বৃদ্ধি করে। এখানে যে পুত্র ছায়ার ন্যায় অনুগত, প্রথম বয়সে যাহার সুশীলতা দেখিয়া মনে হয়, এ আমার বৃদ্ধাবস্থায় যষ্টিস্বরূপ হইবে, হা! সে হয়ত অকালে সংসার হইতে বিদায় লইয়া পিতা মাতাকে নিরাশা নীরে নিমগ্ন ও কঠিন মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত করিতেছে। এখানে দুঃখার্দ্ধকারিণী সুখদ্বিগুণকারিণী ভার্য্যা এই সংসার আলো করিয়া রহিয়াছে, ক্ষণ পরেই হয় ত রঙ্গভূমির আলোকের ন্যায় সহসা নির্ব্বাপিত হইয়া, সংসারকে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতেছে। এখানে কি ধনী কি নির্দ্ধন, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি রাজা কি প্রজা, বিপত্তি কাহাকেও ছাড়ে না।

এই যে সম্রাট—যিনি রাজার রাজা, যার দ্বারদেশে লক্ষ লক্ষ প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে, যুদ্ধের সময় যাঁর এক অঙ্গুলির ইঙ্গিতে কোটি কোটি তলবার নিষ্কোসিত হইয়া বিপক্ষের ভীতি সঞ্চার করে, কালবশে তিনিও শত্রুহস্তে বন্দী হইতেছেন। শত্রু এক মুষ্টি অন্ন মাপিয়া দিবে, তবে তাঁহার উদর পূর্ণ হইবে।

শত্রুর করুণার উপর তাঁহার জীবন নির্ভর করিতেছে। কখন্ শিরশ্ছেদনের আদেশ হইবে, এই আশঙ্কাতেই তিনি কম্পিতকলেবর। হায়! এখানকার সমুদায় অনিত্য সম্পদরূপ কুসুমেই এইরূপ বিষ-কীটই প্রচ্ছন্ন থাকে। অতএব অনিত্য সম্পদ আর তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা তুমি জান। তুমি যাহা বিধান করিবে, আমি তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব। সম্পদ বিপদ তোমার মঙ্গল-হস্ত হইতে আইসে জানিয়া যেন নির্ভয় হইতে পারি। নাথ! তুমিই এই অন্ধকার জগতের আলো। পার্থিব বিষয় জনিত আনন্দ-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপের ন্যায়। ইহা একটি একটি করিয়া নিভিতে পারে। প্রবল ঝঞ্ঝা উঠিলে, এককালে সবগুলিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু তুমি যদি প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়াকাশে উদিত থাক, তাহা হইলে অন্ধকার আর কোথায় থাকে।

হে শিব সুন্দর! তোমার মত জ্যোতির্ম্ময়—তোমার মত সুন্দর কে কোথায় দেখিয়াছে, কে কোথায় শুনিয়াছে। যে একবার তোমার প্রেমানন দেখিয়াছে, তোমার সহবাস-সুখে তৃপ্তি লাভ করিয়াছে, সে তাহার তুলনা আর কোথাও পায় না। আমরা মাতার স্নেহপূর্ণ আনন দেখিয়াছি, পতিব্রতার প্রেমপূর্ণ মুখকমল দেখিয়াছি, শিশুর সহাস্য মুখচন্দ্রমা দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার প্রসন্নবদনের তুলনা কেবল তোমাতেই আছে। ইহার পরীক্ষা আমরা এখানেই করিতে পারি। যখন সংসার হইতে মনকে উঠাইয়া লইয়া আমরা প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে তোমার পূজা করিতে থাকি—তোমার স্পর্শসুখ অনুভব করিতে থাকি, তখন এ পৃথিবীর

যে যত প্রিয় পাত্র হউক না কেন সে যদি সে পূজায় কোন রূপে বাধা দেয়, তখন কি মনস্তাপই উপস্থিত হয়! কি বজ্রাঘাতই মস্তকে পড়ে! ইহাতেই সেই স্বর্গীয় সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব হে দেব! আমি কায়মনোবাক্যে তোমার পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিতেছি। তুমি হৃদয়ের রাজা হইয়া হৃদয়ে থাক, হৃদয় উজ্জ্বল হউক। তুমি জিহ্বায় নৃত্য কর, জিহ্বা অমৃতময় হউক। তুমি আমার মস্তকে থাক আমার সকল জ্বালা বিদূরিত হউক। তুমি জ্ঞানে অনন্ত, আমি অজ্ঞান, আমি যাহা বুঝিতে পারিব না, তুমি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিও। আমার দূরদৃষ্টি নাই, আমি যাহা দূর হইতে দেখিতে পাইব না, তুমি তাহা আমাকে দেখাইয়া দিও। আমি অতি দুর্ব্বল, তোমার অনন্তশক্তির কণামাত্র আমাকে কৃপা করিয়া দিও তাহাই সংসার-সংগ্রামে আমাকে সম্যক রূপে রক্ষা করিবে। আমি অশ্রুপূর্ণ লোচনে আজি তোমাকে বলিতেছি,

কাতর আমার প্রাণ সংসারে, ওগো পিতা দাও তব চরণে স্থান।

কি অন্ধকার চারিদিকে; কি ঝঞ্ঝাবাত; সংসার সাগরের কি ভীষণ গর্জ্জন! ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে। কোথা তুমি—কোথা তুমি—কোথা তুমি, দেখা দাও রক্ষা কর।

"অকুল ভব সাগরে তার হে তার হে।
চরণ-তরি দেহি অনাথ নাথ হে।
দুর্গতি নিবারণ, দুর্দ্দিন তিমির হর;
পাপ তাপ নাশ হে।"

হে ভয়বিহ্বলের পরিত্রাতা, তুমি হৃদয়ে থাকিয়া অভয় দান কর আমি নির্ভয় হই। তুমি তোমার আনন্দ অমৃত-রূপে আমার আত্মায় বিরাজ কর, আমি চিরসুখী হই॥ যেন তোমার অক্ষয় আনন্দ আমাকে ইহলোক ও পরলোকে সুখী করে। এই তোমার নিকটে আমার ভিক্ষা, এই তোমার নিকটে আমার প্রার্থনা।

অনন্তর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। বহুপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে বড় একটা লোক হইত না। অনেকেই ইহাকে বিদ্বেষ দৃষ্টিতে দেখিতেন কিন্তু সে কাল আর নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে এ দেশেরই ঋষিসেবিত প্রাচীন ধর্ম্ম ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজের কোনও উৎসব উপলক্ষে বিশেষ জনতা হইয়া থাকে। স্বদেশ ও বিদেশের বিস্তর ভদ্রলোক এই উৎসবানন্দ ভোগ করিবার জন্য সমাগত হইয়া থাকেন। এমন কি আমরা বহুচেষ্টা করিয়াও কোনরূপে তাঁহাদের জন্য স্থান সঙ্কুলন করিয়া উঠিতে পারি না। ইহা দেখিয়া এমন আশা হয় এখনও যে বিদ্বেষটুকু আছে কালে তাহাও চলিয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধারণে পরিগৃহীত হইবে এবং এই ১১ মাঘের মহা মহোৎসবে প্রত্যেকের গৃহে আমাদের পুরাণ ব্রহ্ম পূজিত হইবেন। ব্রহ্মকৃপায় আমাদের এই আশা অচিরাৎ পূর্ণ হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত আকাশে।
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি।
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে নব সুখ, নব প্রাণ নব
দিবা আশে।

কি দেখিব কি জানিব, না জানি সে কি
আনন্দ,
নূতন সংসার আপন মনমাঝে।
সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয় মুখে
চলে যাব গান গাহি, কে রহিবে আর দূর
পরবাসে।

(মনুসংহিতা)

প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্ততে।
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতের্বিদ্যতে ফলং॥

যে ব্যক্তি প্রথম কল্পোক্ত কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়া আপৎকাল বিহিত প্রতিনিধি অনুষ্ঠান করে ঐ দুর্ব্বুদ্ধির পারলৌকিক অভ্যুদয়ফল লাভ এবং প্রত্যবায় পরিহার হয় না।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫ পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৯০ ⁄৬
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৪২৩৷৴১১
সমষ্টি	৩৭১৩৷৴৫
ব্যয় ...	৩১৯৷৴০
স্থিত	৩৩৯৪ ৵৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৫৬৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৮১৬ শকের পৌষ মাসের দান	১৪০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত	২৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৲
" " বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
	১৫৬৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৩১৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নাথ,	খলিলপুর	৩৵০
" " মহিমচন্দ্র মজুমদার	রংপুর	৩৵০
" " হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়,	মেদিনীপুর	৩৲
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ,	নোয়াখালি	১৸৵০
" বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন	কলিকাতা	১৲
" " কন্নুলাল বর্ম্মন্	ঐ	৩৲
" " কুঞ্জবিহারী দেব,	ঐ	১৷০
" " অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩৲
" " গোবিন্দলাল দাস	ঐ	৩৲
" " গোপলচন্দ্র দে	ঐ	১৲
" " রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৷০
" " কানাইলাল দাস	ঐ	৩৲
" " উমেশচন্দ্র দেব	ঐ	৩৲
		৩১৷৵০

পুস্তকালয়	৪৯৶০
যন্ত্রালয়	৮০৲
গচ্ছিত	৪৷৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৬৷০
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	৬৷৵৬
সমষ্টি	২৯০ ⁄৬

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ ...	১৬৩৸৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩০ ৵৩
পুস্তকালয়	১৮৷০
যন্ত্রালয়	৮৪। ৩
গচ্ছিত	২২৷৶৩
সমষ্টি	৩১৯৷৶০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২০শে ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার।
সম্পাদক।

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ঋগ্বেদ।

বরুণ দেবতা, বসিষ্ঠ ঋষি।

১। এই বরুণদেবের কার্য্য সকল গম্ভীর ও মহীয়ান্, যিনি এই বিস্তীর্ণ দ্যু-লোক ও ভূলোককে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত রাখিয়াছেন; যিনি দিবসে উজ্জ্বল ও বৃহৎ আদিত্যকে এবং রাত্রিকালে দর্শনীয় নক্ষত্র মণ্ডলকে প্রেরণ করেন এবং যিনি এই পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন।

২। আমি ইহা কি আপনাকে আপনি বলিতেছি? আমার কথা কি তিনি শুনি-তেছেন না? কবে আমি বরুণদেবের অন্তরে স্থান পাইব, কবে তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া আমার বাক্য শ্রবণ করি-বেন? আমার স্তোত্র কি তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতেছেন? আমি কখন্ প্রসন্ন-মনে সেই সুখদাতাকে দেখিব?

৩। হে বরুণদেব, আমি কি পাপ করিয়াছি, তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যে পাপের জন্য তোমাকে দেখিতে ব্যা-কুলচিত্ত হইয়াও দেখিতে পাই না। আমি জ্ঞানী দূরদর্শীদিগের নিকটে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছি, সেই পণ্ডিতেরা সকলে এই একই কথা বলিয়াছেন, "বরুণ দেব তোমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন।"

৪। আমাতে কি গুরুপাপ আছে, হে বরুণদেব! যাহার জন্য তোমার এই স্তোতা ও সখাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছ। হে দুর্দ্ধর্ষ হে তেজস্বি, সেই পাপ আমাকে বলিয়া দেও যাহাতে আমি তাহা ত্যাগ করিয়া নিষ্পাপ হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক শীঘ্র তোমার সমীপে উপনীত হইতে পারি।

৫। আমাদিগের পৈতৃক পাপ-সকল বিমোচন কর; আমাদিগের স্বশরীরকৃত পাপ সকলও বিমোচন কর। হে রাজন্, যে সকল দোষ চৌরের ন্যায় গোপনে করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, রজ্জুবন্ধন হইতে মুক্ত বৎসের ন্যায় পাপ-বন্ধন হইতে বসিষ্ঠকে মুক্ত কর।

৬। হে বরুণদেব, পাপ অতিক্রম করিতে আমরা সকল সময়ে সমর্থ নহি; সুরা, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, অক্ষক্রীড়া, অজ্ঞান অভিভূত করিয়া আমাদিগকে পা-পেতে প্রবৃত্ত করে, আবার জ্যেষ্ঠেরাও কনিষ্ঠদিগকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়, এমন কি স্বপ্নও অনৃত পাপের প্রবর্ত্তক।

৭। দাসের ন্যায় প্রভুকে, ইষ্টদাতা, বিশ্বনিয়ন্তা, পরমদেবকে পূজা করিয়া আমি নিষ্পাপ হই; সেই সর্ব্বদর্শী পরমদেব অজ্ঞানীকে জ্ঞান দিয়া চেতন করুন, এই স্তোতাকে সমৃদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন।

৮। হে তেজস্বি বরুণদেব, তোমার উদ্দেশে রচিত আমার এই স্তোম তোমার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হউক; যোগক্ষেমে আমাদের মঙ্গল হউক; তুমি দেবতাদিগের সহিত মঙ্গল আশীর্ব্বাদ দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। ওঁ স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ।

জ্ঞানী হইয়া সরল ভাবে অবস্থান করিবে। বসিষ্ঠ ঋষি তাহারই একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি কেমন বালকের ন্যায় সরল ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রকৃত জ্ঞানে কোনও রূপ কুটিলতা থাকিতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞানী প্রকৃত সরল। যে ব্যক্তি প্রকৃত সরল হইয়া বসিষ্ঠ ঋষির ন্যায় হৃদয়ের পাপমলা প্রক্ষালন করিয়া বিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধকে দেখিতে চায় সেই তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং তিনি তাহার মস্তকে মঙ্গল আশার্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন।

সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

গীতা।

আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক অতীত হইতে চলিল, একদিকে উপধর্ম্মের ভ্রান্ত মত অপর দিকে নাস্তিকতা এই দুইটী বিঘ্ন অপসারিত করিবার জন্য ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখাইয়াছেন যে এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমির যাহা সনাতন ধর্ম্ম,তাহা নাস্তিকতার সহস্র কূটতর্কে টলিবার নহে। তাহা অটল এবং তাহাই জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের মূলভিত্তি। কিন্তু আজকাল কি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে, কি প্রাচ্য ভূখণ্ডে ধর্ম্মের প্রতি কেমন-এক উপেক্ষার ভাব প্রবাহিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে, কর্ম্মক্ষেত্রের শ্রমজীবিদের মধ্যে, ধনীদের মধ্যে, নির্ধনের মধ্যে, অলস মূর্খদের মধ্যে, বিদ্বান্‌দের মধ্যে,সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে, শোনা যাইতেছে যে ধর্ম্মের প্রতি কেমন এক উপেক্ষার ভাব বহিতেছে। কুসংস্কার সংশোধন করিতে করিতে এক মোহ আসিয়া পড়িয়াছে—এখন তাহারা আর ধর্ম্মকেও রাখিতে চাহে না। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, যখন এটা কুসংস্কার দেখিতেছি, ওটা কুসংস্কার দেখিতেছি, তখন ধর্ম্মই যে একটা কুসংস্কার নয় তাহার প্রমাণ কি? পরকাল যে আছে, কয়জন মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া তাহার তথ্য বলিতে পারিয়াছে? আত্মার যে অস্তিত্ব আছে তাহা কে ঠিক করিয়া বলিতে পারে? এ পর্য্যন্ত কত মানবদেহ অস্ত্রের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে, আত্মা থাকিলে কি অন্ততঃ একটীও দেখিতে পাওয়া যাইত না? ঈশ্বর যে আছেন, তাহা আস্তিকেরা মনকে প্রবোধ দিবার জন্য কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু যাঁহাকে দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তাঁহার অস্তিত্বে কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? এই প্রকার বৃথা তর্ক আজ কাল অনেকেরই বিশেষতঃ ছাত্রদিগের মনকে আক্রমণ করিতেছে; অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা যদি বা দৈবাৎ এই প্রকার সংশয়ে পড়িল, অমনি অধিকবয়স্ক দুর্নীতিপরায়ণ ছাত্রেরা, এবং এমন কি শিক্ষকেরাও, অনেক

স্থলে সেই সংশয়াগ্নিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলে এবং তাহা অল্পবয়স্ক ছাত্রদের চির-জীবনের বিষকীট হইয়া থাকে।

যে আর্য্যজাতির প্রত্যেক কর্ম্ম ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া করিতে হয় বলিয়া আজও আমরা গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের এতদূর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে যে আমরা নাস্তিকতার দিকে যাইতে উন্মুখ হইতেছি। ঈশ্বর, আত্মা পরকাল সকলই ভুলিয়া যাইতেছি। দিনে নিশীথে অন্তত একবারও কি সেই পরমদেবকে—যিনি জননীর হৃদয়ে স্নেহনীর দিয়াছেন, যিনি সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, জল সকলকেই আমাদের প্রাণধারণের নিমিত্ত সুধারসে সিক্ত রাখিয়াছেন—সেই পরমদেবকে কি অন্তত একবারও স্মরণ করিব না? আমরা ধর্ম্মকে কি প্রকারে ভুলিব? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধর্ম্মকে হৃদয়ের ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন, আর আমরা তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে ভুলিয়া যাইব? তাহা অসম্ভব। আমরাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যের নিকটে শুনিয়াছি এবং প্রত্যক্ষ করিতেছি যে ধর্ম্মই জগতকে ধারণ করিতেছেন। ধর্ম্মই এই বিবাদপরিপূর্ণ জগত সংসারে শান্তিবায়ু আনয়ন করিতেছেন। এখানে ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?

যে ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করে; আত্মা, ঈশ্বর, পরকালে অবিশ্বাস করে, সে কত দীন, কৃপাপাত্র; তাহার দুরবস্থা কত, তাহার অসুখই বা কি। সে জানে না যে, সে জগতে কেনই বা জন্মগ্রহণ করিল, কোথায় বা যাইবে; মৃত্যুর পরপারে দৃঢ় আশ্রয় আছে অথবা, কেবলি অন্ধকার—এ সকলই তাহার পক্ষে গভীর প্রহেলিকা। সে ইহার তত্ত্ব অন্বেষণ করিতেই চাহে না কারণ সে পূর্ব্ব হইতেই ধরিয়া রাখিয়াছে যে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি কিছুই নাই—দেহ কতকগুলি জড়পদার্থ বা জড়শক্তির সমষ্টি মাত্র। আর চৈতন্য সেই শক্তি সমষ্টিরই বিকাশ। এরূপ ব্যক্তির পাপাচার করিয়া স্বীয় জীবনকে চিরনষ্ট করিবার পক্ষে কোনই দৃঢ় বাধা দেখা যায় না। এই কারণে গীতা সংশয়াত্মাদিগকে মর্ম্মস্পর্শী কথার দ্বারা সাবধান করাইয়া দিতেছেন—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।

নাস্তিকের ইহলোক নাই, পরলোক নাই, কোন সুখই নাই; সংশয়াত্মা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

নাস্তিকের শান্তি কোথায়? তাহার প্রিয়জন যখন রোগে কাতর, তখন তাহার কি ভয়ানক অবস্থা! একদিকে প্রকৃতির দয়ামায়াবিরহিত শক্তি সমূহ, অপরদিকে দিশাহারা সেই ক্ষুদ্র মনুষ্য। আস্তিক সকল প্রকার বিপদের অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয় থাকে, কিন্তু নাস্তিকের নির্ভর করিবার স্থল নাই; প্রার্থনা করিয়া আপনার হৃদয়কে শান্তি দিতে সে অক্ষম। কোন পাশ্চাত্য নাস্তিবাদপ্রচারকের উক্তি হইতে আমরা উপরোক্ত গীতাবাক্যের সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করি। * তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন যে "আমি আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিরোধ রাশির বিষয় যতই তলাইয়া দেখি, ততই গাঢ়তর অন্ধকারে পড়িতে থাকি, আমি কে, আমি কোথায়, কাহাকেই বা ভক্তি করিব, কাহাকেই বা ভয় করিব, এই চিন্তা করিতে করিতে আমি চতুর্দ্দিকে কেবলি

* David Hume.

অন্ধকার দেখি, আমার অঙ্গ সকল অবশ হইয়া আসে।" নাস্তিকহৃদয়ের কি ভয়ানক অবস্থা।

কিন্তু একটী প্রকৃত আস্তিককে দেখ, তাহার হৃদয়ের অবস্থা নাস্তিক হইতে কি বিপরীত। তাহার প্রিয়জন যখন রোগে কাতর, তখন সে ঈশ্বরেরই চরণে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তমনে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকে। সে জানে যে তাহার প্রিয়জন ইহলোকেই জীবিত থাকুক অথবা পরলোকেই গমন করুক, মঙ্গলময়ের মঙ্গল রাজ্যের সীমা অতিক্রম কিছুতেই করিতে পারিবে না, তখন কিসের ভয় এই অভয়ধামে? সে প্রস্ফুটিত কুসুমদলের সৌন্দর্য্যে সেই চিরসুন্দর পুরুষের সৌন্দর্য্যের আভাস পায়; পদ্মবনের সৌগন্ধে "তাঁহারই গাত্রের সৌগন্ধ" পাইতে থাকে; শারদীয় জ্যোৎস্নার বিমলবিকাশে তাঁহারই প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পায়; প্রভাতের সমীরণের নিকট তাঁহারই মধুর কথা শুনিতে থাকে। সে যেমন শরতের প্রশান্ত প্রভাতের মধ্যে সেই শান্তস্বরূপের প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিতে পায়, সেইরূপ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যেও তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি জাগ্রত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। মহান্ জলধির মাঝে সে যেমন ঈশ্বরের মূর্ত্তি প্রতিভাত দেখে, অত্যুচ্চ পর্ব্বতের মহিমাতে ও সেইরূপ তাঁহাকেই দেখিতে পায়। তাই উপনিষদ্কার বলিয়াছেন—

"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥"

দ্যুলোক ইহাঁর মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য ইহাঁর চক্ষু, দিক্ সকল ইহাঁর কর্ণ, বিবৃত জ্ঞান ইহাঁর বাক্য, বায়ু ইহাঁর প্রাণ, বিশ্ব ইহাঁর হৃদয় ও পৃথিবী ইহাঁর চরণ এবং ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।

আস্তিক ব্যক্তি দেখে যে তাহার ন্যায় কত অসংখ্য মনুষ্য সংসারের মধ্যে বিচরণ করিয়া ঈশ্বরের করুণা ভোগ করিতেছে। আস্তিক ব্যক্তি কেবল বাহিরে বাহিরেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না। আত্মার মধ্যেও তাঁহাকেই দেখিয়া কৃতার্থ হয়। রোগ শোকে, পাপতাপে সহস্র কষ্ট পাইলেও সে তাহার মধ্যে ঈশ্বরের পিতৃভাব দেখিয়া কত না সান্ত্বনা পায়। সেই সময়ে সে তাহার হৃদয়ের প্রীতিভক্তি, স্নেহ প্রেম প্রভৃতির মধ্যে এক অপূর্ব্ব শান্তি পায়, নাস্তিক ব্যক্তির ন্যায় তাহার নিকটে এই সকল কিছুই প্রহেলিকা নহে; সকলেতেই ঈশ্বরের ছায়া বর্ত্তমান দেখে। আস্তিক ব্যক্তির হৃদয় ঈশ্বরকে দেখিয়া যে প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হয় তাহা এই সঙ্গীতেই প্রকাশ পাইতেছে "আনন্দধারা প্রবাহে কিবা আজি হৃদাকাশ মাঝে শত চন্দ্রমা বিরাজে। দেখ রে হৃদে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময় একদৃষ্টে আত্মার পানে মাতা হয়ে অবনত আছেন তাকায়ে; শূন্য পূর্ণ আজি।"

আরও ইহা দেখিতে পাই যে জগতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল সূত্রপাত ধর্ম্মের দ্বারাই হইয়াছে। অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক এই ভারতবর্ষেই ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। বৈদিক যুগের শাণ্ডিল্য ঋষি প্রথম আবিষ্কার করিলেন যে আত্মাই পরমাত্ম দর্শনের প্রকৃষ্ট স্থান। আর সেই বিষয় আলোচনা করিতে গিয়াই ভারতের কত উন্নতি হইল; কত উচ্চ আদর্শ ধরিয়া

কার্য্য করিতে গিয়া ভৌতিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রকারেরই কত উন্নতি হইল— উপনিষদ্ই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। দেখ, সেই উপনিষদের আদর্শ দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতের প্রতি কত সাধুবাদ প্রয়োগ করিতেছেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে—কেবল এই যে, প্রতীচ্য ভূখণ্ডও এই আদর্শে কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিতেছে; তাহা যদি হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ বিরোধের কারণ অচিরেই লুপ্ত হইয়া গিয়া পৃথিবী আর এক নূতন শ্রী ধারণ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন যে গীতোপনিষদ্ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা ভারতে ধর্ম্মভাব আজ পর্য্যন্ত কতটা জাগ্রত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া কত সময়ে আপনাকে উন্নত করিয়াছি। আজও সেই সকল উপদেশ কত সংসারবিদগ্ধ ব্যক্তিকে শান্তি দান করিতেছে। মানব উন্নত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও উন্নতি সাধিত হয় তাহা বলা বাহুল্য। আবার যখন চৈতন্য প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তখন ভারতের অবনতির স্রোত চলিতেছিল,— তাহা প্রতিরুদ্ধ হইল। সেই প্রেমের প্রবাহবলেই সঙ্কীর্ত্তন উত্থিত হইল এবং আজও হয় তো কত বিপথগামী ব্যক্তির হৃদয়ে শ্রদ্ধাভাব জাগ্রত করিয়া তাহাকে মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করে। আবার এই বিপ্লবের পর বিপ্লব চলিয়া গেল, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিলেন। বর্ত্তমানে যে প্রকার ভৌতিক বিজ্ঞানের শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ সনাতন ঋষিসেবিত আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম না উপস্থিত হইতেন, তবে এই ভারতের কি যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। বৈদিক ঋষিদের গভীর অধ্যাত্মযোগপ্রসূত ধর্ম্ম যদি আমরা না প্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে আজ আমরা কি হইতাম, কোথায় দাঁড়াইতাম? ধন্য ঋষিগণ! তোমরা আমাদের সম্মুখে এত অমূল্য বস্তু সঞ্চিত রাখিয়াছ, আর আজ একবার তোমরা আসিয়া দেখ যে আমরা কি শ্রীহীন হইয়া রহিয়াছি; আমরা মোহমদে মত্ত হইয়া অসৎকে সৎবোধে আলিঙ্গন করিতেছি। ধিক্ আমাদিগকে। তোমরা আর একবার উপস্থিত হইয়া আমাদের পথপ্রদর্শক হও— আমাদের সৎপথ দেখিবার ক্ষমতা আমরা আপনাদের দোষে হারাইয়াছি।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা আর বিলম্ব করিও না—ব্রহ্মকে অবলম্বন কর, তাঁহাকেই হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও। তর্ক করিয়া তাঁহা হইতে পশ্চাৎপদ হইও না। এমন বলিও না যে, যখন অমুক অমুক নাস্তিক শত শত আস্তিক অপেক্ষা ভাল অতএব নাস্তিকতাতেই প্রকৃত মঙ্গল—এরূপ ভ্রমে পড়িও না। যে সকল নাস্তিক সদাচরণ করেন, তাঁহারা আস্তিকেরই পথানুসরণ করেন এবং যে সকল আস্তিক ব্যক্তি অসদাচরণ করেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকেরই পথানুসরণ করেন। এই সকল বৃথা তর্কে কালক্ষেপণ করিয়া আত্মবঞ্চনা করিও না। আপনাকে তাঁহারই পথে লইয়া চল, তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

(পঞ্চম প্রস্তাব)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে নির্জ্জনে কথিত পুরাণোল্লিখিত ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন বৃত্তান্ত ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান মূল রামায়ণের অন্তর্গত নহে। আমাদের মতের পোষকতায় কতকগুলি বলবৎ কারণ দর্শাইতেও আমরা ত্রুটি করি নাই। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে সুমন্ত্র পুরাণের দোহাই দিয়া রাজা দশরথের চারিপুত্র হইবে এইরূপ আভাস দেন। কিন্তু তাঁহারা যে বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করিবেন এরূপ কোন কথার আদৌ উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু পুত্রেষ্টি যজ্ঞের বর্ণনায় রামচন্দ্রের দেব অংশে জন্মিবার কথা অকস্মাৎ বাহির হইয়া পড়িল।

আমরা রামায়ণের বালকাণ্ডের এই কয়েকটি সর্গ পাঠ করিয়া পাইলাম, যে নারদ রামচন্দ্রকে "বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে" বিক্রমে বিষ্ণুসদৃশ, এবং সীতাকে "যোগমায়েব" যেন যোগমায়া বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে বারংবার মনুষ্য বলিতেছেন। সুমন্ত্রের মুখে রামচন্দ্রের দেবত্ব সম্বন্ধে নূতন কোন কথাই নাই। কিন্তু পুত্রেষ্টি যজ্ঞ লইয়া রামচন্দ্রের দেবত্ব স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদর্শিত যুক্তিগুলি যদি সাধারণে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন, এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আদৌ অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া যদি সাধারণের ধারণা হইয়া থাকে তাহা হইলে রামচন্দ্রের অবতারত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পরে রামচন্দ্রের দেবত্ব বা তাঁহার অমানুষিকত্ব স্থাপন জন্য বাল্মীকি রামায়ণে কোন 'বিশেষ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। যাঁহারা অহল্যা উদ্ধার প্রভৃতি দুই একটি স্থল লইয়া রামচন্দ্রের দেবত্ব সংস্থাপনের প্রয়াসী আমরা পরে দেখাইব যে তাঁহাদের ধারণা নিতান্তই অমূলক।

অধ্যাত্মরামায়ণ যে বাল্মীকি রামায়ণের বহুকাল পরে বিরচিত হয়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ইহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত। 'অন্যান্য কথা ছাড়িয়া দিয়া ভাষাগত তারতম্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, যে এই দুইয়ের রচনাকাল মধ্যে নিতান্ত অল্প সময় অতিবাহিত হয় নাই। কিন্তু এই অধ্যাত্মরামায়ণে রামচন্দ্রের অবতারত্ব স্থাপন জন্য একটা বিশেষ উদ্যোগ চলিয়াছে। শাস্ত্রকার এই পুস্তকের প্রথমাবধি রামচন্দ্রের মনুষ্যত্ব ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। আদিকাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই আছে,

> যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবজৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
> সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।

যিনি চিন্ময় ও অব্যয় হইয়াও পৃথিবীভার হরণের জন্য দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মায়ামনুষ্য রূপে সূর্য্যবংশে পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ইত্যাদি। এইরূপে গ্রন্থারম্ভ হইল। পার্ব্বতী মহাদেবকে শ্রীরামতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন

> "শ্রীরামতত্ত্বে হ্যখিলতত্ত্বসারে ভক্তির্দৃঢ়া নৌর্ভবতি প্রসিদ্ধা।"

অখিল তত্ত্বসার শ্রীরামচন্দ্রে দৃঢ়া ভক্তি ভবসমুদ্রপারে দৃঢ়া নৌকা, রামচন্দ্র মায়াহীন ও নির্গুণ। * * * কিন্তু তথাপি এই পরমপুরুষ জানকী বিরহে কেন এত বিলাপ করিয়াছিলেন। উত্তরে মহাদেব বলিতে লাগিলেন

"রামঃ পরাত্মা প্রকৃতেরনাদিরানন্দ একপুরুষোত্তমোহি। স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা নভোবদন্তর্বহিশ্চাস্থিতো যঃ। সর্ব্বান্তরস্থো হি নিগূঢ় আত্মা স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং বিচষ্টে।"

রামচন্দ্র পরমাত্মা, প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, অনাদি, আনন্দস্বরূপ, একমাত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ। তিনি স্বীয় মায়াপ্রভাবে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া আকাশের ন্যায় অন্তর বাহিরে সকলের অন্তরস্থ নিগূঢ় আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন।

জানন্তি নৈবং হৃদয়স্থিতং বৈ, চামীকরং কণ্ঠগতং যথাজ্ঞাঃ।

যেমন অজ্ঞ লোকেরা নিজ কণ্ঠগত স্বর্ণহার জানিতে পারে না সেইরূপ মূঢ় ব্যক্তিরা হৃদয়স্থ পরমাত্মা রামকে জানিতে সক্ষম হয় না। এইরূপে শঙ্করমুখে শ্রীরামচন্দ্রকে একেবারে পরমাত্মা করিয়া তোলা হইল। সীতাদেবী প্রপন্ন হনুমানকে উপদেশ ছলে বলিলেন

"রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং * *
মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্
তস্য সন্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা।"

রামকে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বলিয়া জানিও, এবং আমাকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী মূল প্রকৃতি বলিয়া জানিও। এই পুরুষপ্রধান পরমাত্মার সহিত মিলিত হইলে আমি নিরলস ভাবে এই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করি। "তৎসান্নিধ্যান্ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতেঽবুধৈঃ"। নির্ব্বোধ লোকেরা তৎসান্নিধ্যে আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট এই জগৎ তাঁহাতে আরোপ করে। রঘুবংশে রামের জন্ম, বিশ্বামিত্রের সহিত বনগমন, অহল্যাশাপ মোচন, হরধনুর্ভঙ্গ, পিতৃসত্যপালনে বনগমন, মূঢ়েরা এই সমস্তই অখিলাত্মা নির্ব্বিকার রামচন্দ্রে আরোপ করিয়া থাকে। আদিকাণ্ড ১ম সর্গ ৪৪ শ্লোক।

রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্ত্তিরচলঃ পরিণামহীনো
মায়াগুণাননুগতো হি তথা বিভাতি।

ঐ সর্গ ৪৫ শ্লোক।

রাম চলেন না, একস্থানে স্থির থাকেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, ত্যাগ করেন না, তিনি কিছুই করেন না। তিনি আনন্দমূর্ত্তি অচল, পরিণামহীন, মায়াগুণে অনুগত হইয়া তিনি সেইরূপে প্রতীয়মান হয়েন।

দ্বিতীয় সর্গে দশাননপ্রমুখ রাক্ষসগণের অত্যাচারে ভীত হইয়া দেবতাগণ হরির নিকটে গমন করিলে তিনি ব্রহ্মার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এবং পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণে পৃথক চার অংশে দশরথের গৃহে এবং যোগমায়া রাজর্ষি জনকের গৃহে জন্মিলেন। দেবতারা বানরবংশে স্ব স্ব অংশ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় সর্গে অপুত্রক দশরথ কর্ত্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গের সাহায্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ভগবান বিভাবসু পায়সপাত্র লইয়া আবির্ভূত হইলেন। সেই পায়স ভক্ষণে মহিষীগণ গর্ভধারণ করিলেন। শুভলগ্নে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে কৌশল্যা সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া হর্ষবিস্ময়ে আকুল হওত আনন্দাশ্রু লোচনে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে শঙ্খচক্রগদাধর, দেবদেব! তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমাত্মা, অচ্যুত, অনন্ত, পূর্ণ ও পুরুষোত্তম। বেদবাদিরা তোমাকে বাক্য বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর সত্য জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন! তুমি মায়ার দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি পালন ও সংহার করিতেছ। তুমি সত্ত্বাদি গুণ সংযুক্ত, সূর্য্যের ন্যায় অমল অথচ কিছুতেই লিপ্ত নহ। তুমি শ্রবণ বা দর্শন কর না, অথচ

যেন সকলই করিতেছ! শ্রুতি তোমাকে "অপ্রাণো হ্যমনাঃ" প্রাণহীন মনোহীন পরিশুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করে। অজ্ঞানান্ধ লোকেরা তোমাকে দেখিতে পায় না; কিন্তু তত্ত্বদর্শীর নিকটে তুমি প্রকাশমান। তোমার উদরে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ পরমাণুর ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি লোক সকলকে ছলনা করিতেছ। হে রঘুশ্রেষ্ঠ, ইহাতে তোমার ভক্তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পাইতেছে। পতিপুত্র ধনে মগ্ন থাকিয়া সংসারসাগরে ভাসিতে ভাসিতে আজি আমি তোমার পাদমূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। হে দেব! তোমার এইরূপ, যেন আমার মানসে চিরমুদ্রিত থাকে। এবং বিশ্ববিমোহিনী মায়া যেন আর আমাকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে।

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নেতদ্রূপমলৌকিকম্
দর্শয়স্ব মহানন্দং বালভাবং সুকোমলং।
ললিতালিঙ্গনালাপৈস্তরিষ্যাম্যুৎকটং তমঃ।

৩য় সর্গ ৩২ শ্লোক।

হে বিশ্বাত্মন! তোমার এই অলৌকিক রূপ সম্বরণ কর, এবং মহানন্দদায়ক সুকোমল বালভাব প্রদর্শন কর, আজ মাতার ন্যায় তোমার সহিত সুললিত আলাপে উৎকট সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হই। রামচন্দ্র বলিলেন মাত! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক; পূর্ব্বতপস্যাফলে আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অন্য দুর্লভ আমার সাক্ষাৎকারলাভ লোকের মোক্ষের কারণ।

ইত্যুক্ত্বা মাতরং রামোবালোভূত্বা রুরোদ হ।

এই বলিয়া রাম বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল ইহা হইতে পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীরামচন্দ্রকে একেবারে পরমাত্মাতে পরিণত করা হইয়াছে। যাঁহারা বাল্মীকি রামায়ণের সরল সহজ বর্ণনা হইতে রামচন্দ্রের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিতে চাহেন ঐতিহাসিক চক্ষে রামজীবনের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহেন, তাঁহারা অধ্যাত্ম রামায়ণের এই কয়েকসর্গ পাঠে নিতান্তই মর্ম্মাহত হইবেন। ইতিহাস নিয়মে অনাস্থাবান দেখিয়া শাস্ত্রকারকে শতসহস্রবার ধিক্কার দিবেন। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্যের তলস্পর্শ করিতে চাহেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন।

অনেকেই অবগত আছেন যে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম সমুদয় ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়াছিল। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ হোমযাগ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের জয়ঢক্কা নিনাদিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ-বিপ্লবের সময় প্রচলিত ক্রিয়াকলাপ উৎসন্ন প্রায় দেখিয়া শাস্ত্রকারগণ জনসাধারণকে স্বধর্ম্মে ধরিয়া রাখিবার জন্য বিপুল আয়াস পাইতেছিলেন। তখন তাঁহাদের দিক্‌বিদিক জ্ঞান ছিল না। অজ্ঞান অন্ধকার নিবিড় হইয়া না আসিলে নূতন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় না, ইহা এক প্রকার সার্ব্বভৌমিক সত্য। বৌদ্ধধর্ম্ম সমাগমের অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে বৈদিক জ্ঞানের আলোক প্রকৃত অধিকারীর অভাবে নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন বেদপুরাণ ইতিহাসের কোন্ চরিত্র সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। মহাভারত পুরাণশ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও ইহার প্রাচীনত্ব হিমাচলের সমান। তাঁহারা বেদ উপনিষদ রামায়ণ

মহাভারত হইতে উজ্জ্বল চরিত্র সঙ্কলিত করিয়া তাহাতে দেবত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাদের মুখ দিয়া বেদ বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রের উচ্চ অঙ্গের কথাগুলি বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এই ভাবে শাস্ত্ররাজি রচিত ও সাধারণের নিকটে প্রকাশিত ও অনুশীলিত হইতে লাগিল। কেহ বা রামায়ণ মহাভারতাদির অঙ্গ সংস্কারে অগ্রসর হইলেন। এবং এই সকল শ্রদ্ধার সামগ্রীকে আরও আদরণীয় করিবার জন্য, নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনায় যাহা কিছু ভাল লাগিল, তাহা যোজনা করিয়া ঐ সকল শাস্ত্রের কলেবর আরও প্রবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতে মূর্ত্তি গড়িয়া অমূর্ত্তের পূজার পদ্ধতির পথও পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য পুরাণের জন্ম হইতে লাগিল। এই সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণকারের বর্ণনা প্রাচীন শাস্ত্রের বর্ণনা হইতে ক্রমিকই বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। কিন্তু ইহাও সাধারণে লক্ষ্য করিবেন, যে প্রাচীন শাস্ত্রের তুলনায় এই সকল আধুনিক শাস্ত্রে ধর্ম্মভাব আধ্যাত্মিকতার মাত্রা বাড়িতে লাগিল। যাঁহারা বাল্মীকি রামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, যে ধর্ম্মোপদেশে এই দুই পুস্তকের মধ্যে তুলনাই হইতে পারে না। আমরা যে সামান্য অংশ অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই প্রমাণিত হইবে যে বৈদান্তিক মত মায়াবাদ প্রভৃতি তাহার ভিতরে কেমন অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং কেমন উজ্জ্বলরূপে উঁহার ভিতরে উপনিষদের ছায়াপাত রহিয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণকারের লক্ষ্য তত কিছু রামজীবনের ঘটনারাজি সংকলনে নহে। রামজীবন অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের কথা শুনানই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই জন্য কবির কবিত্ব বাল্মীকি রামায়ণে, কিন্তু ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকত্ব শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব অধ্যাত্ম-রামায়ণে।

উপরে আমরা যে সকল কারণের উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতেই মহাভারত রামায়ণের অবয়ব অতিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বেদের কবিত্ব অর্থ হারাইয়া উপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা স্থিরচিত্তে সমস্ত মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন, মহাভারতের অন্য অন্য অংশের ধর্ম্মভাবের সহিত গীতা ও শান্তিপর্ব্বের ধর্ম্মভাবের ও গুরুত্বের তুলনা হয় না। অনেকে গীতাকে মহাভারতের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। তাঁহাদের মতে লেখক গীতা রচনা করিয়া মহাভারতের অঙ্গসংস্কার করিয়াছিলেন এবং মহাভারতের দোহাই দিয়া এই অমূল্য শাস্ত্র সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন।

আমরা অধ্যাত্ম-রামায়ণের রামজীবনের যেস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এইখানে একটি কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। আমাদের মনে হয় অধ্যাত্ম-রামায়ণকার নিজ পুস্তক রচনার সময় গীতার পদানুসরণ করিতেছিলেন। গীতাকার কৃষ্ণের মুখ দিয়া উজ্জ্বল সত্যগুলি নিঃসৃত করাইয়া ঐ সকল সত্য সাধারণের হৃদয়ে খোদিত করিয়া দিবার সুবিধা বুঝিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শাস্ত্রকারও শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম দাঁড় করাইয়া তাঁহার মুখ দিয়া সকল কথা বলাইয়া লইলেন। অধ্যাত্ম-তত্ত্বে অধ্যাত্মরামায়ণ গীতা অপেক্ষা বড় নিকৃষ্ট বস্তু নহে। তবে গীতায় উজ্জ্বল রত্নগুলি এত সামান্য পরিসরের মধ্যে এমন পরিচ্ছন্ন ভাবে রক্ষিত হইয়াছে, যে অন্য কোন হিন্দুশাস্ত্রে সেরূপ

পরিলক্ষিত হয় না। এই জন্য গীতার এত মাহাত্ম্য। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিরাট-মূর্ত্তি দেখিয়া এককালে ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিলেন

> "অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোস্মি দৃষ্ট্বা,
> ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
> তদেব মে দর্শয় দেব রূপং,
> প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।

তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া লোমাঞ্চিত ও ভয়ে উৎপীড়িত হইতেছি, হে দেব হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার সেই রূপ দেখাও। ১১ অধ্যায়।

এইখানেও কৌশল্যা বলিলেন, তুমি তোমার অলৌকিক মূর্ত্তি সংবরণ করিয়া সুকোমল বালভাব দর্শন করাও, যে আমি মুক্তি লাভ করি।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা কোন এক ঘটনা বা জীবনীর উল্লেখ বিভিন্ন শাস্ত্রে দর্শন করিবার জন্য লালায়িত হইলে আমাদিগকে হতাশ্বাস হইতে হইবে। পরবর্ত্তী শাস্ত্রে মনুষ্যকে দেবতা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, এই জন্যই পরবর্ত্তী শাস্ত্রগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা এই পরবর্ত্তী লেখকগণের অভিপ্রায় বুঝিতে চেষ্টা না করিবেন তাঁহাদিগকে প্রতারিত হইতে হইবে। কিন্তু এই অভিপ্রায় বুঝিয়াছে কয় জন। কৃত্তিবাস বুঝিতেন না বলিয়া আমাদের যেমন একদিকে মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন, তেমনই আর একদিকে সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন। আজ কালকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকারগণ অভিপ্রায় বুঝিতে আদৌ চেষ্টা পান না। কেহ বা বলেন রাম আত্মা, সীতা প্রজ্ঞা, দশকণ্ঠ রাবণ পঞ্চ অন্তরিন্দ্রিয় পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়, সীতাহরণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়নে প্রজ্ঞালোপ। কেহ বা যুধিষ্ঠিরাদি নামের বিচিত্র অর্থ ধরিয়া গীতাশাস্ত্রের বিচিত্র ব্যাখ্যা বাহির করেন। এইরূপে রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা উড়াইয়া দিয়া এমন এক গণ্ডগোল বাঁধাইয়া দেন, যাহা কোন মতেই অন্তরের সহিত সায় পায় না। সুতরাং যদি হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে যাও, তবে দেশ-কালের সহিত শাস্ত্র রচনার যোগ মিলাইয়া দেখ, সকলই সুগম হইয়া পড়িবে। কাহারও সহিত কোন গোলযোগ বাঁধিবে না এবং এক যোগসূত্রে সমুদয় শাস্ত্র আলম্বিত দেখিবে*।

উপরে যাহা কথিত হইল তাহা হইতে পাঠকবর্গও বুঝিতে পারিবেন যে ঈশ্বর অবতার রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না। আমরাই প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাকে অবতার করিয়া তুলি। যাহা দেবের অসাধ্য আমাদের পক্ষে তাহা সুখসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। এবং আমরাও শাস্ত্রকারদিগের নিগূঢ় অভিপ্রায় অনুসরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া রামাদি অবতার ছিলেন কি না, এই সকল অকিঞ্চিৎকর কথায় মিথ্যা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কালক্ষয় করি। আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে অধ্যাত্মরামায়ণকারের ন্যায় জ্ঞানাপন্ন লেখক বেশ জানিতেন, বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্র মনুষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

* এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত অধ্যাত্মরামায়ণে অনেক স্থানে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

আত্মশোধন।

ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা বিবিধ প্রকারে মৃত্যুর প্রভাব ও মৃত্যু সান্নিধ্য উদ্বোধন করিয়াছেন।

কৌরবগণের চিতানল নির্ব্বাণ করিয়া যুধিষ্ঠির মহাশোকে গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করিতেছেন; ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন; রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু সন্নিহিত বিবেচনা করিতেছেন;—ইত্যবসরে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদত্ত ও গৃহীত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম ব্যাখ্যানে তাহাই উদ্বোধিত;—

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা না দিউক; এই হেতু সেই বেদ্য পরম পুরুষকে জান এবং তাঁহার শরণাপন্ন হও।

সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি। এই হেতু প্রথমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অসত্য হইতে সত্যে, অনিত্য হইতে নিত্যে, অসার হইতে সারসত্ত্বে উপনীত হইতে হইলে এই মর্ত্ত্য লোকের মর্ত্ত্যত্ব চিন্তা করিতে হয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই মৃত্যুর প্রতিকৃতি দেখিয়া শান্তি লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহামতি ভীষ্ম তাঁহাকে সেই শান্তি লাভের উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রথমে সেই মৃত্যুকীর্ত্তন। একটী উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বলিলেন,—

মৃত্যুনাভ্যাহতো লোকো জরয়া পরিবারিতঃ।
অহোরাত্রাঃ পতন্ত্যেতে ননু কস্মান্ন বুধ্যসে॥
অমোঘা রাত্রয়শ্চাপি নিত্যমায়ান্তি যান্তি চ।
যদাহমেতজ্জানামি ন মৃত্যুস্তিষ্ঠতীতি হ॥
সোহহং কথং প্রতীক্ষিষ্যে জ্ঞানেনাপিহিতশ্চরন্।
রাত্র্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামায়ুরল্পতরং যদা॥
তদৈব বন্ধ্যং দিবসমিতি বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
গাধোদকে মৎস্য ইব সুখং বিন্দেত কস্তদা॥
অনবাপ্তেষু কামেষু মৃত্যুরভ্যেতি মানবং।
পুষ্পাণীব বিচিন্বন্তমন্যত্র গতমানসং॥
বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি।

এখন কর্ত্তব্য কি? অতঃপর তাহারই উপদেশ। প্রথম উপদেশ এই যে, কালক্ষেপ করিও না।—

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো মা ত্বাং কালোঽত্যগাদয়ং।
অকৃতেষ্বেব কার্য্যেষু মৃত্যুর্বৈ সংপ্রকর্ষতি॥
শ্বঃ কার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকং।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতং॥

প্রসিদ্ধি এইরূপ রাজা পরীক্ষিত ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত সাত দিবসের অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি জানিয়াছিলেন যে আর ছয় দিন জীবিত থাকিতেও পারি; সপ্তম দিনে মৃত্যু নিশ্চিত। পরন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কি বলিতে পারেন, আমি আর সাত দিবস জীবিত থাকিব?

কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।

অদ্যই কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে কে জানে?

অতএব আমাদের ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত আর একদিনেরও বিলম্ব করিবার অবকাশ নাই। অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ঃ, যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা অদ্যই সম্পাদন কর; বর্ত্তমান সময়কে ব্যর্থ যাইতে দিও না। উপদেশকগণ আমাদের সকলকে এই সতর্ককর ঘোষণা দিয়া রাখিয়াছেন।

ধর্ম্মসাধন এমনি যদি আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে দেখ দেখি, আমরা এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের কত ত্রুটি করিতেছি।

বাস্তবিক প্রথম ত্রুটি এই যে আমরা জীবনকাল বৃথা ক্ষেপণ করি। আলস্য, ঔদাস্য ও অবহেলা কর্ত্তব্য কর্ম্মের সাক্ষাৎ শত্রু। সময়ই আয়ু। আমরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া যত সময় অতিবাহন করি, ততটুকু আয়ুক্ষয় জনিত অপরাধগ্রস্ত হই।

আমাদের আর এক ত্রুটি এই ঘটে

যে আমরা আপনাদিগকে স্ববশে রাখিতে পারি না। এই দোষে, আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান, পাপপুণ্যের বোধ বা আপনাদের প্রতি অন্যদীয় শাসন যাহা থাকে, তাহার কিছুই কার্য্যকারী হয় না। আমরা দেখিতে দেখিতে কুপথে যাই; জানিতে জানিতে মন্দকর্ম্ম করি। চঞ্চল মনের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া আত্মহারা হই। এ অবস্থায় আমাদের পাপ ও অপরাধ অপ্রতিকার্য্য হইয়া উঠে।

সাধারণতঃ আমরা প্রবহমান কালের প্রতি লক্ষ্য রাখি না; অথচ মনে করি, আমরা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিব। এই বিশ্বাসে ভোগাভিলাষে অন্ধ হইয়া থাকি। সংসারকে সার জ্ঞান করি। তাহাতে আমাদের অহঙ্কার প্রবল হইয়া পড়ে।

অহঙ্কার আমাদের সকল কর্ত্তব্য নাশের ও অপরাধের নিদান। অহঙ্কার হইতে লোভ ও ভোগাসক্তি এবং তাহার ইতর বিশেষে অল্প বা অধিক কুটিলতা, কপটতা, মিথ্যা, দম্ভ, দ্বেষ, হিংসা ইত্যাদি সকল পাপ জন্মে। অহঙ্কার—প্রচ্ছন্ন ও নিগূঢ় অহঙ্কার—আমাদিগকে নানা প্রকারে বিভ্রান্ত করিয়া কত অপরাধ আনয়ন করে, কত অপরাধকে আবৃত করিয়া রাখে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা মোহান্ধ হইয়া তাহাদিগকে অপরাধ বলিয়া চিনিতেও পারি না।

এই অহঙ্কার বিনাশের নিমিত্ত আমাদের মৃত্যু, সংসারের অনিত্যতা এবং সারাসারের চিন্তা করিতে হয়। এই জন্যই উপদেষ্টাদিগের প্রধান ও প্রথম উপদেশ মৃত্যু।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫ মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩৮১॥ ৬
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৩৯৪ ৵৫
সমষ্টি	৩৭৭৫॥৵১১
ব্যয় ...	৩২২৸৵০
স্থিত	৩৪৫২৸১১

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ		২৫৩৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৮১৬ শকের মাঘ মাসের দান		১৪০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়		১০০৲
শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী		৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা)		২৲
„ „ গোকুলকৃষ্ণ সিংহ		২৲
„ „ গোপালচন্দ্র মজুমদার		২৲
„ „ কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস		১৲
„ „ হীরালাল প্রামাণিক		১৲
		২৫৩৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৩৯৸০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়		১২৲
৺ জয়গোপাল সেন		১৲
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায়	সুরনগর	৩।৵০
„ „ রামচন্দ্র মৌলিক	বেনারস	৩।৵০
„ „ বসন্তকুমার ভকত	চন্দননগর	২॥০
„ „ গোবর্দ্ধন শীল	ঐ	২।৵০
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	বেনারস	।৵০
শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ মজুমদার	কলিকাতা	৩৲
„ „ ভুবনমোহন বসু	ঐ	৩৲
„ „ কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	ঐ	৩৲
„ „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	১॥০
নগদ বিক্রয়		৪।০
		৩৯৸০
পুস্তকালয়		৩১।৶৬
যন্ত্রালয়		৫০৲
গচ্ছিত		৩/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৪।০
সমষ্টি		৩৮১॥৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৬৯।৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩১।/৯
পুস্তকালয় ...	৯৮।/৯
যন্ত্রালয় ..	১০৩॥৵০
সমষ্টি	৩২২৸৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।